বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

আটত্রিশতম খণ্ড	শীত সংখ্যা	পৌষ ১৪২৭/ডিসেম্বর ২০২০

সম্পাদক
সৈয়দ আজিজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
মো. আবদুর রহিম

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক
সম্পাদক	:	অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক
সহযোগী সম্পাদক	:	মো. আবদুর রহিম
সদস্য	:	অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ
		অধ্যাপক দুলাল ভৌমিক
		অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
Price	:	Tk. 200.00
		US$ 10.00

প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal of the Asiatic Society of Bangladesh) edited by Professor Syed Azizul Huq, published by Professor Sabbir Ahmed, General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5, Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-9513783, E-mail : asbpublication@gmail.com

সূচিপত্র

বাংলা ভাষা আন্দোলন: বায়ান্ন-পূর্ব পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা
এম. মুনজুরুল হক ১৬৯

উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অবস্থান
নাহিদ ফেরদৌসী ২০৩

পূর্ববাংলার অসাম্প্রদায়িক জনচরিত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ: ভৌগোলিক প্রভাব
মো. আবদুর রহিম ২১৯

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় রাজাদের অভ্যন্তরীণ নীতিতে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ, ১৭৮৯-১৮৬০
আনন্দ বিকাশ চাকমা ২৪১

ঋত্বিক ঘটক: উন্মূল জীবনের সেলুলয়েড-রূপকার
অনন্ত মাহফুজ ২৭৫

বাংলা ছোটগল্পে উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি: পরিপ্রেক্ষিত তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ
মাফরুহা সিফাত ২৯১

শওকত আলীর উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্ব
মোঃ আঙ্গুর হোসেন ৩১১

গবেষকদের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা-য় এশিয়ার সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গবেষকদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এক কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে সিডিসহ বা পেন ড্রাইভ-এ জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ :

- কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে (ভারসন বিজয় ৪.০ বা বিজয় ২০০৩)। টাইপ/ ফন্ট SutonnyMJ ব্যবহার করতে হবে।
- কাগজের সাইজ হবে A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধে গবেষকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে গবেষকের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে :

- জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি;
- এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
- প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
- এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার একটি কপি ও প্রবন্ধের ১০ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের প্রথম ভুক্তি (entry) অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। গবেষক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস ও উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের ওপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। প্রবন্ধের শেষে সংখ্যা অনুসারে টীকা ও তথ্যসূত্র উপস্থাপন করতে হবে।

৬. বক্তব্যের উৎস উল্লেখের ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-লেখকের নাম, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এশীয়, বিশেষত বাংলা নাম পূর্ণভাবে লেখা যাবে। কিন্তু অন্য নামের ক্ষেত্রে শেষ নাম প্রথমে পদবী ব্যবহার করাতে হবে।

৭. মূলপাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৮. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই : *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)। মূলপাঠে বিদেশি শব্দ থাকলে তা-ও একই নিয়মে লিখতে হবে। অন্যভাষার শব্দ বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম অনুযায়ী লিখিত হবে। কিন্তু ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথমবার উল্লেখের সময় তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।

৯. প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে তথ্যনির্দেশ সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপন রীতি হবে বর্ণানুক্রমিক।

১০. প্রবন্ধের সূচনায় একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে।

১১. যৌথ নামে লিখিত প্রবন্ধ সোসাইটির বাংলা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় না।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

কাউন্সিল : ২০২০ ও ২০২১

সভাপতি	:	অধ্যাপক মাহফুজা খানম
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক মেসবাহ-উস-সালেহীন অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক অধ্যাপক আহমেদ এ. জামাল
কোষাধ্যক্ষ	:	অধ্যাপক এস এম মাহফুজুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক সাব্বীর আহমেদ
সম্পাদক	:	অধ্যাপক মো. আবদুল করিম
সদস্য	:	অধ্যাপক নাজমা খান মজলিস অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ অধ্যাপক ইয়ারুল কবীর অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান অধ্যাপক ঈশানী চক্রবর্তী ড. নুসরাত ফাতেমা মিসেস সুরাইয়া আক্তার

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, আটত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৭/ডিসেম্বর ২০২০

বাংলা ভাষা আন্দোলনঃ বায়ান্ন-পূর্ব পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

এম. মুনজুরুল হক*

সারসংক্ষেপ

বাংলা ভাষা আন্দোলন স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই আন্দোলনের পথ ধরে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়। ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটলেও এর পটভূমিতে রয়েছে অনেক ইতিহাস। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে পাকিস্তান সরকার ও উর্দু সমর্থকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বাঙালি লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষকসহ বুদ্ধিজীবীরা সর্বপ্রথম এর প্রতিবাদ করে। রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা দিলে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা বাংলার ভাষার পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদে সমর্থন দেয় ছাত্র, যুবক ও রাজনীতিবিদরা। ১৯৫২ সালে ছাত্র ও যুব সমাজ রক্ত দিয়ে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়।

ভূমিকা

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পটভূমিতে রয়েছে এক দীর্ঘ ও সংগ্রামী ইতিহাস। যার সূচনা হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরই। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১এর প্রথমাংশ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করার পর অনিবার্যভাবে মুক্তিযুদ্ধের অবতারণা ঘটে। বিভিন্ন পর্যায়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণে অসন্তুষ্টি দানা বাঁধতে থাকে। বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, রাজনীতিকসহ সর্বস্তরের মানুষ পশ্চিমা শাসক শ্রেণির ওই অনাচারের বিরুদ্ধে নানাভাবে তাদের প্রতিবাদ ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতে থাকে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। সেটি শুরু করেন বুদ্ধিজীবীরাই। উর্দু পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত এ বক্তব্য হাজির করেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. মো. জিয়াউদ্দিন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীগণ জোরালো প্রতিবাদ করেন। পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখি ও সভা-সমাবেশের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিবাদ চলতে থাকে। বুদ্ধিজীবীগণের প্রতিবাদের পরপরই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন। পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩) পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে প্রস্তাব করেন। এর ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮), প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪) উর্দুর পক্ষে কথা বলতে থাকেন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, রাজনীতিকগণ এর তীব্র প্রতিবাদ

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

করেন। ১৯৪৮ সালেই 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। আন্দোলনের চাপে এক পর্যায়ে খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি মেনে নেন। কিন্তু অচিরেই তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পাদিত আট দফা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাঙালি তার রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ভাষা প্রতিষ্ঠার এই অভিন্ন দাবি এবং তা আদায়ের জন্য রক্তাক্ত সংগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ বাংলাভাষীকে একটি জাতীয়তাবাদী ঐক্যানুভূতি প্রদান করে। বাংলাভাষা আন্দোলনের দাবি আস্তে আস্তে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি-পূর্ব পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীগণের অবদান বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক (Primary) এবং মাধ্যমিক (Secondary) উভয় শ্রেণীর উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে প্রধানত Historical Method ব্যবহৃত হয়েছে।

বুদ্ধিজীবী কারা

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার পূর্বে বুদ্ধিজীবী কারা তা বিশদ করে নেয়া প্রয়োজন। বুদ্ধিজীবী বা বিদ্বৎ সমাজের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Intelligentsia'। এটি একটি রুশ শব্দ 'ইনতিলিগেন্ত' (Intelligenth) থেকে এসেছে। উনিশ শতকের ষাটের দশকে রুশ লেখক 'ববোরিকিন' (Boborekin) প্রথম এটি ব্যবহার করেন।[১] বিভিন্ন মনীষী বুদ্ধিজীবীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দু-একটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো।

সমাজবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড শীলস এর ভাষায়:

> Intellectuals are the aggregate of persons in any society who employ in their communication and expression, with relatively higher frequency than most other members of the society, symbols of general scope and abstract reference concerning men, society nature and the cosmos.[২]

রবার্ট মিচেল্‌স-এর মতে,

> Intellectuals are the persons possessing knowledge or in a narrower sense those whose judgment, based on reflection and knowledge, derives less directly and exclusively from sensory perception than in the case of non-intellectuals... those who have merely accumulated knowledge are not true intellectuals. The scholar must possess priestly qualities and fulfill priestly functions, including political activity."[৩]

বিনয় ঘোষের মতে, "যিনি নিজের মনন ও মানুষের মন নিয়ে কারবার করেন তিনিই বিদ্বজ্জন এবং দেশের বিদ্বৎ সমাজের একজন।"[৪]

সাধারণ অর্থে আমরা অধ্যাপক-শিক্ষক, আইনজীবী, কবি-লেখক-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, বিজ্ঞানী, ধর্মতত্ত্ববিদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে বুদ্ধিজীবী হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। তবে এখন ঐ শব্দের অর্থ আরো ব্যাপক হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের পেশাদার-অপেশাদার মানুষ যারা নিজ জ্ঞানানুশীলন ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করে থাকেন তাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়। বুদ্ধিজীবী হতে হলে শুধু বিদ্বান হওয়াটা যথেষ্ট নয়। জ্ঞানানুশীল ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা চাই। মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ভাবতে হবে, অন্যকে ভাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিদ্যার্জন করে কেউ কেউ যদি চাকরি অথবা অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত থেকে এ বিষয়টি উপেক্ষা করেন, তবে তিনি জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারী হবেন বটে, বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিবেচিত হবেন না। অন্যদিকে যথেষ্ট বিদ্বান না হলেও একজন ব্যক্তি যদি মননশীল হন, সমাজের জন্য চিন্তা করেন, আদর্শগত সংগ্রামে অংশ নেন তবে তিনিও বুদ্ধিজীবী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবেন। বিশ্বের নানাদেশে সংগঠিত বহু বিপ্লব ও সংস্কার আন্দোলনের জন্ম ও নেতৃত্ব দিয়েছেন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উপনিবেশ-বিরোধী এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্প্রতিক স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।[৫]

পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও ভাষা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী সমাজ

ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত আকস্মিকভাবে ঘটেনি। আধুনিককালের অন্যান্য সক্রিয় আন্দোলনের মতো এরও একটি পশ্চাদভূমি ও মানসিক প্রস্তুতির পটভূমিকা ছিল। যদিও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন সক্রিয়ভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে, তথাপি দেশবিভাগের পূর্বেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে সচেতন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক পত্র-পত্রিকা এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রচারপত্রসমূহ বাঙালি মুসলমান লেখক সমাজের এক সচেতন প্রয়াসের স্বাক্ষর বহন করে চলেছিল।[৬] ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী এই লেখকগণ বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পত্র-পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

(১) বায়ান্ন-পূর্ব ভাষা বিতর্ক

১. ঘটনার সূত্রপাত

১৯৪৭-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের একটা মূল বক্তব্য ছিল ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা, সেই সঙ্গে অন্য চেতনাও ছিল, কিন্তু ঐ স্বাতন্ত্র্যচেতনাই ছিল মুখ্য। *দৈনিক ইত্তেহাদ*-এর সাহিত্য-বিভাগে ১৯৪৭ সালের ২২ জুন এবং ২৯ জুন তারিখে দু'কিস্তিতে "বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব" নামে মোহাম্মদ আবদুল হক-এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল:

> বিদেশী এবং অবাঙালিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বাঙালি ভাষাগত এবং জাতিগত হীনমন্যতার পরিচয় দেন। তিনি কথা বলেন হয় ইংরেজিতে না হয় উর্দু-হিন্দীতে। প্রায় বাঙালি এটা মনে প্রাণে জানেন যে, হিন্দী-উর্দু ভাষীর সঙ্গে কথা বলতে হলে তাঁকে হিন্দী-উর্দুতে বলতে হবে, কেন না অপর পক্ষ বাংলা জানেন না। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হলেও এটা একটা বাধ্যবাধকতা; এরূপ বাংলা জানা এবং বলার বাধ্যবাধকতা ও গরজ এখন

> পর্যন্ত অবাঙালিদের নেই। কেন এমন হয়? এর প্রধান কারণ এই যে, বাঙালির জাতীয়তাবোধ এখনো পরিপূর্ণভাবে স্ফুরিত হয়নি। তাঁর জাতীয় মর্যাদাবোধ এখনো অত্যন্ত কাঁচা, তাঁর পূর্ণ জাতীয় ব্যক্তিত্ববোধ এখনো অপ্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই বাঙালিরা সাধারণতঃ বুঝতে পারেন না যে, নিজ বাসভূমে ও ইংরেজ তথা অবাঙালিদের সঙ্গে তাদেরই ভাষায় কথা বললে জাতীয়তাবোধের দিক থেকে নিজেকে ছোট মনে করা হয়, নিজের অমর্যাদা করা হয়, নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া হয়। ... আমার মনে একটা প্রশ্ন সব সময়েই উদ্যত হয়ে থাকে। আমরা কেন আমাদের দেশে ইংরেজি উর্দু-হিন্দী বলতে বাধ্য থাকব? আমাদের দেশে যারা বাস করে সেইসব ইংরেজ বা উর্দু-হিন্দী ভাষীরা কেন বাংলা লিখতে বাধ্য হবে না?[৭]

উপরোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার একদিন পরে, ৩০ জুন ১৯৪৭ সালে দৈনিক *আজাদ*-এর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল একই লেখকের 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ। সূচনায় বলা হয়:

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা এখন স্থির করার সময় এসেছে। যে ভাষাকেই আমরা রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করি, তার আগে আমাদের বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে, ... কোন ভাষায় পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক কথা বলে, পাকিস্তানের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভাষা কোনটি, কোন ভাষায় সব থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, এবং কোন ভাষা ভাব-প্রকাশের পক্ষে সব থেকে বেশী উপযোগী। ... যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাকনা কেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষার দাবিই সবচেয়ে বেশী।[৮]

'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' ও 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' প্রবন্ধ দু'টির লেখক মোহাম্মদ আবদুল হক বাংলা ভাষা জানার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অবাঙালিদেরও তিনি বাংলা ভাষা ব্যবহার এবং বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কথা বলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রবন্ধকার ও প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদক সাহসী ভূমিকা পালন করেন।

উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে এমন কথা কেউ কেউ বললেও সরকারিভাবে বলা হয়নি। কিন্তু বহু বছরের উর্দু-হিন্দি বিরোধ এবং মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সংগঠন ও স্বরূপের কথা স্মরণ করে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ অনুমান করতে পেরেছিল যে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু সেটা হবে অসঙ্গত। পাকিস্তানে উর্দুভাষীর সংখ্যা নগণ্য এবং ভাষাগত উৎকর্ষ ও সাহিত্য সৃষ্টির দিক থেকে উর্দুর চেয়ে বাংলা ভাষাই শ্রেষ্ঠতর। উর্দু রাষ্ট্রভাষা ঘোষিত হলে ইংরেজির স্থান নেবে উর্দু, এবং ইংরেজি না জানা যেমন সরকারি চাকুরির জন্য অযোগ্যতা, উর্দু না জানা তেমনি অযোগ্যতা বলে গণ্য হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের পাঁচ কোটি লোক সরকারি চাকুরির অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। অন্যদিকে উর্দু-শিক্ষিত মানেই চাকুরির যোগ্য বলে গণ্য হবে। বাঙালি সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের আইন পরিষদে এবং অন্যত্র বাঙালিদের প্রভাব হবে উর্দুভাষীদের থেকে অনেক কম।[৯]

১৯৪৭ সালের ২৭ জুন তারিখে *সাপ্তাহিক মিল্লাত*-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল: "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা ভাষাই হবে, ইহা বলাই বাহুল্য।" কিন্তু ঐ সময়ে এমন কথাও শোনা যাচ্ছিল যে উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। এই "কানা ঘুষার" কথা উক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছিল।

মাহবুব জামাল জাহেদী ২০ জুলাই ১৯৪৭ তারিখের দৈনিক *ইত্তেহাদ* এ প্রকাশিত "রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন:

> সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একমাত্র উর্দু এবং একমাত্র বাংলাভাষার প্রস্তাব উভয়ই অযৌক্তিক হবে। উর্দু বাঙালিদের কাছে প্রায় বিদেশী ভাষা, এবং এ ভাষা বিশেষভাবে মুসলমানী ভাষা তাও নয়। উর্দু, অধিকন্তু, তুলনামূলকভাবে জটিল অথচ অনুন্নত ভাষা। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বাংলা রাষ্ট্রভাষা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য উর্দু রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করা হলেই সুবিচার হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা কি হবে, সে সম্বন্ধে সরকার কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি।[১০]

আশ্বিন সংখ্যা (১৩৫৪) (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৪৭) *সওগাত*-এ কবি ফর্‌রুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪) "পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যে কথা উঠেছিল সে সম্পর্কে তিনি বলেন:

> গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যাঁরা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর সাথে আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরূদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।[১১]

লেখক মাহবুব জামান জাহেদী পাকিস্তানে দু'টি রাষ্ট্রভাষার পক্ষে মত দেন। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু। শুধু উর্দু বা শুধু বাংলা পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হলে সেটা হবে অযৌক্তিক। কবি ফররুখ আহমদও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পক্ষে জোরালো দাবি উত্থাপন করেন।

নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত *কৃষ্টি* নামক মাসিক পত্রিকার কার্তিক (১৩৫৪) সংখ্যায় "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা" শীর্ষক প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-৮২) উর্দুকে একটি অপরিচিত বিদেশি ভাষা বলে বর্ণনা করেন এবং এই ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। "উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইলে, বাংলাভাষার সমাধি রচনা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরও জাতি হিসাবে 'গোর' দেওয়ার আয়োজন করিতে হইবে।"[১২] রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে জাতীয় মর্যাদা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন জড়িত। উর্দু ইসলামি সাহিত্যে সমৃদ্ধ উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা দরকার, ড. এনামুল হক এসব যুক্তির অসারতা প্রদর্শন করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য উর্দু ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব করেন। 'এক রাষ্ট্রে একাধিক (রাষ্ট্র) ভাষা অচল এই শ্রেণির ধারণা সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক' এই উক্তির পর উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন:

> ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে। ... উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ, - রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দুওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজি রাষ্ট্রভাষার সূত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র।[১৩]

২. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতামত

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দীন আহমদ হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের অনুকরণে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। জিয়াউদ্দীন আহমদের এই সুপারিশের অসারতা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[১৪] এ প্রবন্ধে তিনি বলেন:

> কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে। ... ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, ইহা পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনও প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দুর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মার্তৃভাষা বিভিন্ন, যেমন- পুষতু, বেলুচী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, এবং বাংলা; কিন্তু উর্দু পাকিস্তানের কোনও অঞ্চলেই মাতৃভাষারূপে চালু নয়। যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলাভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।[১৫]

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উর্দুর দাবি বিবেচনার ক্ষেত্রে ডক্টর শহীদুল্লাহ ধর্মের প্রসঙ্গ একেবারে উল্লেখ করেননি। এক শ্রেণির লোক উর্দুর পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন শুধু এই যুক্তিতে যে উর্দুর সাথে ইসলামের যোগাযোগ বাংলাভাষার থেকে ঘনিষ্ঠ। তাঁর মতে আরবি ভাষাই বিশ্বের মুসলমানদের জাতীয় ভাষা। সেই হিসেবে তিনি মনে করেন যে আরবি ভাষাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।[১৬]

ডক্টর শহীদুল্লাহ তাঁর প্রবন্ধের শেষাংশে বলেন:

> বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে।[১৭]

এর পর ডক্টর শহীদুল্লাহ ১৭ পৌষ ১৩৫৪ (জানুয়ারি ১৯৪৮) পাক্ষিক *তকবীর* পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা' নামে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটিতে তিনি বাংলা, আরবি, উর্দু এবং ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের নীতি কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করেন।[১৮] বাংলাকে শহীদুল্লাহ 'প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে প্রস্তাব করেন:

> হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালির জন্য প্রাথমিক শিক্ষণীয় ভাষা অবশ্যই বাঙলা হইবে। ইহা জ্যামিতির স্বীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। উন্মাদ ব্যতীত কেহই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে পারে না। এই বাঙলাই হইবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা।

আরবি সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো যে এটি পাকিস্তানের 'একটি বৈকল্পিক ভাষা' হিসেবে থাকা উচিত:

> মাতৃভাষার পরেই স্থান ধর্মভাষার, অন্তত: মুসলমানের দৃষ্টিতে। ... এই জন্য আমি আমার প্রাণের সমস্ত জোর দিয়া বলিব, বাংলার ন্যায় আরবি চাই। ... সেদিন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম সার্থক হইবে, যেদিন আরবি সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইবে। ... কিন্তু বর্তমানে আরবি পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি বৈকল্পিক ভাষা ভিন্ন একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের যথেষ্ট অন্তরায় আছে।

উর্দু ভাষাকে তিনি উচ্চস্তরীয় নাগরিকদের শিক্ষণীয় ভাষারূপে প্রতিপন্ন করেন:

> বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের মধ্যে যোগ স্থাপনের জন্য, যাহারা উচ্চ রাজ কর্মচারী কিংবা রাজনৈতিক হইবেন, তাঁহাদের জন্য একটি আন্তঃপ্রাদেশিক (interprovincial) ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন। এই ভাষা উচ্চ শিক্ষিতদের জন্য ইংরেজিই আছে। ইহা অনস্বীকার্য বাস্তব ব্যাপার (fact)। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ইহা চলে না। তজ্জন্য উর্দুর আবশ্যকতা আছে। ... এই জন্য রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উচ্চ রাজকর্মচারী ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী প্রত্যেক নাগরিকেরই উর্দু শিক্ষা করা কর্তব্য।

ইংরেজিকে পাকিস্তানের 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা'রূপে চালু রাখার সপক্ষে শহীদুল্লাহ নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন:

> আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে দেখিতে চাই। তজ্জন্য ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়ান বা রুশ ভাষাগুলির মধ্যে যে কোন একটি ভাষা আমাদের উচ্চ শিক্ষার পঠিতব্য ভাষারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকলের মধ্যে অবশ্য আমরা ইংরেজিকে বাছিয়া লইব। ইহার কারণ দুইটি (১) ইংরেজি উচ্চ শিক্ষিতদের নিকট সুপরিচিত: (২) ইংরেজি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত আন্তর্জাতিক ভাষা। আমি এই ইংরেজিকেই বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বজায় রাখিতে প্রস্তাব করি।

ডক্টর শহীদুল্লাহর উপরোক্ত ভাষা বিষয়ক মন্তব্য এবং সুপারিশগুলোর মধ্যে অনেক জটিলতা এবং পরস্পরবিরোধিতা থাকলেও এগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর সাহসী ও প্রতিবাদী অভিমত শিক্ষিত সচেতন ছাত্র সমাজ তথা বিভিন্ন শ্রেণির পেশার মানুষকে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। একাধারে অধ্যাপক, পত্রিকা সম্পাদক, লেখক, সাহিত্যিক তথা বহু ভাষাবিদ পণ্ডিতের ক্ষুরধার লেখনী বুদ্ধিজীবী মহলসহ ছাত্র ও রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর করে তুলেছিল।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রতিবাদের আগে কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ করেনি। তাঁর আগে বাংলা ভাষা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হোক এই মর্মে কিছু লেখক, সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবীর মতামত জানা যায়। কিন্তু এই মর্মে শহীদুল্লাহর প্রতিবাদী অভিমতটি সুধীমহল ও রাজনৈতিক কর্মীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।

৩. তমদ্দুন মজলিশের তৎপরতা

বাংলাভাষার সপক্ষে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র এবং অধ্যাপকের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন সৃষ্টি হয়। এই সংগঠন রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা, সভা সমিতি প্রভৃতি নিয়ে সক্রিয় হয়। তারা ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' এই নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। তাতে লেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক কাজী

মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক *ইত্তেহাদের* সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯)। তাছাড়া এই পুস্তিকাটির প্রথম দিকে তমদ্দুন মজলিশের পক্ষে ভাষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব সংযোজিত হয়। সেটি লেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং তমদ্দুন মজলিশের প্রধান ব্যক্তিত্ব আবুল কাসেম (১৯২০-৯১)। নিম্নে প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল:

১. বাংলা ভাষাই হবে: (ক) পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন (খ) পুর্ব-পাকিস্তানের আদালতের ভাষা (গ) পূর্ব-পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দু'টি– উর্দু ও বাংলা।

৩. (ক) বাংলাই হবে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব- পাকিস্তানের একশজনই শিক্ষা করবেন। (খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকরী ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন তারাই শুধু ও ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা ৫ হইতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে। (গ) ইংরেজী হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকরী করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তাঁরাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তানের হাজার করা ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না। ঠিক একই নীতি হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে ওখানের স্থানীয় ভাষা বা উর্দু ১ম ভাষা, বাংলা ২য় ভাষা আর ইংরেজী ৩য় স্থান অধিকার করবে।

৪. শাসনকার্য ও বিজ্ঞান শাখার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বছরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব-পাকিস্তানের শাসন কার্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।[১৯]

অধ্যাপক আবুল কাসেম রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর এই লেখায় বলেন যে, ইংরেজরা এক সময় জোর করে আমাদের ঘাড়ে ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দিয়েছিল। সেইভাবে কেবল উর্দু অথবা বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্বের সেই সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অনুসরণ করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, কোন কোন মহলে সেই প্রচেষ্টা চলছে এবং তাকে প্রতিহত করার জন্যে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। সর্বশেষে তমদ্দুন মজলিশের পক্ষ থেকে তিনি দাবি করেন:

> লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব-স্ব প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।[২০]

পুস্তিকাটির অন্য দু'জন লেখকের মধ্যে কাজী মোতাহার হোসেন ''রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা" নামক প্রবন্ধটিতে ভাষা সমস্যাকে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বাংলা ভাষার উন্নতি ও চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন:

> মোগল যুগে বিশেষ করে আরাকান রাজসভার অমাত্যগণ, বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন। মুসলমান সভাকবি দৌলত কাজী এবং সৈয়দ আলাওল বাংলা কবিতা লিখে অমর কীর্তি লাভ করেছেন। এঁদের ভাষা সংস্কৃত, আরবি, ফার্সী, উর্দু, প্রাকৃত প্রভৃতি নানা ভাষা শব্দ-ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু

> এঁরা জোর করে কোনও নির্দিষ্ট ভাষা থেকে বিকট বিকট শব্দ আমদানী করতে চেষ্টা করেননি, তৎকালীন জনসমাজের নিত্য ব্যবহৃত বা সহজবোধ্য ভাষাতেই তারা কাব্য রচনা করে গেছেন।[২১]

বিকৃত ধর্মীয় সংস্কার কিভাবে মানুষকে বিপথগামী করে সে বিষয়ে তিনি বলেন:

> আমি উর্দু ভাষা নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের উর্দুর মোহকে সত্য সত্যই মারত্মক মনে করি। যখন দেখি, উর্দু ভাষায় একটা অশ্লীল প্রেমের গান শুনেও বাঙ্গালী সাধারণ ভদ্রলোক আল্লাহর মহিমা বর্ণিত হচ্ছে মনে করে ভাবে মাতোয়ারা, অথবা বাংলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও হারাম বলে নিন্দিত, তখন বুঝি এই সব অবোধ উক্তি বা অবোধ নিন্দার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই।[২২]

কায়েমী স্বার্থবাদীদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন:

> বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়, সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশি দিন চাপা থাকতে পারে না। তাহলে পূর্ব পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে। জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে ন্যায়সঙ্গত এবং সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতির সহায়ক নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করাই দূরদর্শী রাজনীতিকদের কর্তব্য।[২৩]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু? পুস্তিকাটিতে আবুল মনসুর আহমদ ''বাংলা ভাষাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক তাঁর দুই পৃষ্ঠার ছোট লেখাটিতে বলেন:

> উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী চাকুরীর অযোগ্য' বনিয়া যাইবেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী কাজের 'অযোগ্য' করিয়াছিল।[২৪]

উল্লিখিত উক্তিগুলো থেকে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বাধীনতা লাভের মাত্র একমাসের মধ্যেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে তিক্ততা শুধু যে সৃষ্টি হয়েছে তা নয়, যথেষ্ট বৃদ্ধি লাভ করেছিল। ভাষার প্রশ্নটি এক অংশের দ্বারা যে অপর অংশের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নের সাথে জড়িত সে চেতনাও এই স্তরে ভাষা বিষয়ক চিন্তা এবং আলোচনার মধ্যে উপস্থিত। বুদ্ধিজীবী লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং শিক্ষক-অধ্যাপকবৃন্দের সক্রিয় ভূমিকা বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলেছিল, যা পরবর্তীকালে সচেতন ছাত্রসমাজ এবং রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল।

ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাভাষার দাবিতে প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' মজলিশের উদ্যোগেই গঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক আলোচনার ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তীর্ণ করার ব্যাপারেও ওই সংগঠনের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তমদ্দুন মজলিশের এই ভূমিকার জন্যে বাংলাভাষা বিরোধী সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রগুলিতে সে সময় মজলিশের বিরূপ সমালোচনা হয়। এ কাগজগুলির মধ্যে *মর্নিং নিউজ*, *পাসবান* এবং সিলেটের সাপ্তাহিক *আসাম হেরাল্ড* ও *যুগ ভেরীর* নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে সাপ্তাহিক *ইনসাফ*, *জিন্দেগী* ও *দেশের দাবি* এবং সিলেটের *নওবেলাল* পুরোপুরিভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন করে।[২৫]

৪. উর্দু সমর্থকদের বক্তব্য

কোনো কোনো বাংলাভাষী মুসলমান লেখক উর্দুর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে *সওগাতে*র ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। যদিও এই পত্রিকায় কতিপয় লেখক বাংলাভাষার পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তথাপি *সওগাতে*র সম্পাদকীয় নীতি ছিল উর্দুর পক্ষে। *সওগাত* প্রথম থেকে শেষাবধি এই নীতিই অনুসরণ করে। অবশ্য সওগাত গোষ্ঠী বাংলাকে একেবারে অস্বীকার করেননি, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের পক্ষে তাঁরা মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারি ভাষা ও আন্তঃপ্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর প্রস্তাব করেছেন। *সওগাতের* পৌষ সংখ্যায় (ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৯৪৭,১৯৪৮) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)-র ''শিক্ষার কথা" প্রবন্ধে এই বক্তব্যের সোচ্চার অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সে সময় সওগাতের সম্পাদকীয় লিখতেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীই। শুধু সে সময়ই নয়, পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলন যখন কতকটা সক্রিয় আকার ধারণ করতে চলেছিল, তখনও এই পত্রিকা উর্দুর পক্ষে প্রচার চালিয়েছিল। ১৩৫৪ সনের চৈত্র সংখ্যায় *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন:

> উর্দুকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও আন্তঃপ্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হইতেছে এবং সমগ্র পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক করা সঙ্গত হইবে। ইংরেজির স্থলে উর্দু অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা (Lingua franca) হইবে এবং হওয়াও উচিত।...উর্দুর বিশেষ সম্মান যেন আমরা ক্ষুণ্ন করিতে অগ্রসর না হই।[২৬]

বলাবাহুল্য, সওগাতের এই উর্দুপ্রীতির পেছনে যে কারণ বর্তমান ছিল, তা হল ইসলামি সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের অস্বাভাবিক দুর্বলতা। তাঁদের ধারণা ছিল যে, উর্দু ইসলামি চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ এবং এটি একটি অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাষা। এই ভাষার সম্মান তাঁদের কাছে কতকটা আরবির মতোই। তাই ইসলামি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা এমন প্রচারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ঢাকার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজ উর্দুকে চাপিয়ে দেবার মাধ্যমে একটি অকল্যাণের পূর্বাভাস সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করতে থাকেন।[২৭]

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে রেসকোর্স ময়দানের বক্তৃতায় এবং কার্জন হলে সমাবর্তন অভিভাষণে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দু এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা বাংলা নিয়ে যে উক্তি করেছিলেন, *সওগাত*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে তা সমর্থন করা হয়েছিল। এ সম্বন্ধে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী নিজে যে অভিমত পোষণ করতেন, তার সূত্র ধরেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টার পেছনে পশ্চিম পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানে আগত উত্তর ভারতের মুসলমানদের সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক মনোভাব তো ছিলই, সেই সময়ে বাংলাভাষী মুসলমান সমাজের একাংশের উর্দুপ্রীতি মানসিকতাও ছিল তাদের পক্ষে। "উর্দুর বিশেষ সম্মান যেন আমরা ক্ষুণ্ন করিতে অগ্রসর না হই", *সওগাতে* মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর এই উক্তি ছিল ঐ মানসিকতারই পরিচায়ক। *সওগাত* তথা বাঙালি সমাজের ঐ অংশের কথা

ছিল, স্বাধীন ভারতে উর্দুর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় উর্দুর প্রতি পাকিস্তানের (পূর্ব পাকিস্তানসহ) উপর একটি নৈতিক দায়িত্ব বর্তিয়েছে এবং উর্দু ইসলামি সাহিত্যে সমৃদ্ধ। ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য পাকিস্তানিদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উর্দু। (ড. এনামূল হক তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে এইসব যুক্তির অসারতা প্রদর্শন করেছিলেন) তাছাড়া অনেক বাঙালি মুসলমানের কাছে বাংলার চেয়ে ইংরেজি ও আরবির মতোই উর্দুরও সম্মান ছিল বেশি। গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭-১৯৬৪) মতো বিশিষ্ট বাঙালি কবিও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী ছিলেন, পাকিস্তানি তথা ইসলামি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায়। এই বাস্তবতার কথা স্মরণ না রাখলে ঠিক বোঝা যাবে না বাংলার অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবিকে কিরূপ প্রতিকূলতার বিরূদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।[২৮]

১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর করাচিতে এক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে নেতৃত্ব পর্যায়ের বেশ কিছু বাঙালি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু প্রচলনের সিদ্ধান্ত বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হয়। কিন্তু এ সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে প্রতিবাদ এত তীব্র হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (১৯০৫-৬৬) দায়িত্ব এড়াবার জন্য বিবৃতি দিয়ে উর্দু প্রচলনের কথা অস্বীকার করেন এবং তাঁরা সম্মেলনে বাংলাভাষার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন বলে দাবি করেন। ফজলুর রহমানের বিবৃতির সবটুকুই ছিল মিথ্যা। কয়েক দিন পর কেন্দ্রীয় সরকার যখন প্রেসনোট দিয়ে সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ জানিয়ে দেন তখন সব কিছু পরিস্কার হয়ে যায়।[২৯]

করাচির শিক্ষা সম্মেলনের পর ৬ ডিসেম্বর *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এবং সিলেটের কিছুসংখ্যক শিক্ষাবিদ, ডাক্তার ও সংস্কৃতিসেবী কর্তৃক একটি স্মারকলিপিতে যে বক্তব্য পেশ করা হয় তার মাধ্যমে মোটামুটিভাবে উর্দু সমর্থকদের তাত্ত্বিক বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে বাংলাভাষাকে একটি অত্যন্ত নিম্নমানের ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাভাষাকে মুসলমানদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের পরিপন্থি একটি ভাষা বলেও উল্লেখ করা হয়। শুধু তাই নয় বাংলাভাষার সমর্থকদের ওপর প্রাদেশিকতার ছাপ মেরে যুক্তি দেখান হয়- 'এরা চিন্তাগত দাসত্বে আবদ্ধ'। অধিকন্তু স্মারকলিপিতে ভুল পরিসংখ্যান পরিবেশন করে উর্দুভাষার পক্ষে বক্তব্য রাখা হয় এবং বাংলাভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত লজ্জাজনক ও স্থুল ভাষায় উপহাস করা হয়।[৩০]

বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি এ সময় সিলেটের আলেম সমাজেও বাংলাভাষার প্রশ্নে নানা প্রকার বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সিলেট শহরে এ সময় তারিখবিহীন একটি প্রচারপত্রে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, ''আপনাদের দীনী ফরজ কাজ সর্বত্র সভা সমিতি করিয়া উর্দুর সমর্থনে জনমত গঠন করা ও উর্দু বিরোধীদের ফেরেববাজী হইতে মুসলিম জনসাধারণকে রক্ষা করা।"[৩১] সাপ্তাহিক *নওবেলালে* এই প্রচারপত্রটির একটি প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়। এর এক মাস পর সিলেটের মুন্সীবাজার ইউনিয়নে 'জমিয়তে উলামায় ইসলাম'-এর একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় ভাষা প্রশ্নের উপর গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয়:

> পাকিস্তান অর্জনে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত পাকিস্তানের জনসংখ্যার ২/৩ অংশ বাংলা ভাষাভাষী। সুতরাং গণনীতির দিক দিয়া সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীর পক্ষে অল্পসময়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা সহজ নহে বিধায় বিশেষ বিবেচনা স্থলে তথাকার রাষ্ট্রভাষা উর্দু ও পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং পশ্চিমের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা, তৃতীয় ভাষা ইংরেজী এবং পূর্বের দ্বিতীয় ভাষা উর্দু, তৃতীয় ভাষা ইংরেজী হওয়া উচিৎ।

প্রস্তাবটিতে এ বিষয়ে পাকিস্তান সরকার ও গণপরিষদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।[৩২]

উপরোক্ত প্রস্তাবটি পূর্বোল্লিখিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রস্তাবের অনুরূপ। ডক্টর শহীদুল্লাহ যেমন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও অন্যদের প্রয়োজন বুঝতে পেরে বাংলা, উর্দু, ইংরেজি ও আরবি ভাষা স্থানভেদে যেখানে যেটি প্রযোজ্য বলেছিলেন, তেমনি সিলেটে উলামায়ে ইসলামও অনুরূপ মত ব্যক্ত করে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাকে সবার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন

১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর *মর্নিং নিউজ* কাগজে একটি বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ সংবাদে বলা হয় যে, করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিন বেলা দুটোয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১), আব্দুর রহমান চৌধুরী (সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি), কল্যাণ দাসগুপ্ত, এ.কে.এম. আহসান প্রমুখ। সভার প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার দাবি উত্থাপন করা হয়। সভাশেষে একটি বিরাট মিছিল তদানীন্তন প্রাদেশিক কৃষিমন্ত্রী সৈয়দ আফজাল, নুরুল আমিন (১৮৯৩-১৯৭৪) এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসায় যায়। ছাত্র ও শিক্ষক প্রতিনিধিবর্গ বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে তাঁদের মতামত চান এবং তাঁদের ওপর চাপ দেন এবং এ দাবি সমর্থন করবেন কিনা সে সম্পর্কে জানতে চান। সেদিন ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের চাপের মুখে তাঁরা গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে সমর্থন করবেন বলে স্বীকার করতে বাধ্য হন।[৩৩]

বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করবার দাবিতে যে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত হয় তার আহ্বায়ক নিযুক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তমদ্দুন মজলিশের সক্রিয় নেতা অধ্যাপক নূরুল হক ভূঞা। অক্টোবর মাসে (১৯৪৭) ফজলুল হক হলের সাহিত্য সভার পর তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ এবং বিজ্ঞান অনুষদের একটি যুক্ত অধিবেশন হয়। সে অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বাংলাকে নিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও বাংলাকে চালু করা হবে।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাংলাভাষার পক্ষে যে সভা হয়, সে সভায় সভাপতিত্ব করেন ফরিদ আহমদ। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সংবলিত প্রস্তাবটি পাঠ করেন তিনি। ফরিদ আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন এবং

একই সঙ্গে ঢাকা কলেজেও শিক্ষকতা করতেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারি জনাব আজিজ আহমদ ডেকে পাঠান এবং তিরস্কার করে বলেন যে, সরকারি চাকরি করে আন্দোলনে অংশ নেয়া তাঁর পক্ষে একান্ত অনুচিত। প্রতিবাদে ফরিদ আহমদ কলেজের চাকরি থেকে ইস্তফা দেন।[৩৪] ১৯৪৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বক্তৃতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য মাহমুদ হাসান ভাষা প্রসঙ্গে বলেন, 'একমাত্র মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া আর কোন ভাষাই পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন হতে পারে না।' মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার মাধ্যম হোক এই আন্দোলনে উপাচার্য থেকে আরম্ভ করে সকল শ্রেণির শিক্ষক এবং ছাত্রদের বৃহত্তর অংশ সক্রিয় ছিলেন।[৩৫]

৬. ঢাকার বাইরে আন্দোলন

ঢাকার বাইরে পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহরেও এ আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল। সচেতন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও কর্মীসহ জনসাধারণের সাথে বুদ্ধিজীবীরাও এ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সিলেট, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী শহরে ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ করা গিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসেই পাবনার স্থানীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধি সমিতির এক সভায় বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভষারূপে গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়। এ দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যও তাঁরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৩৬]

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সিলেটের কয়েক জন বিশিষ্ট মহিলা পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে প্রেরিত একটি স্মারকলিপিতে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে ছিলেন মহিলা মুসলিম লীগের জেলা কমিটির সভানেত্রী বেগম জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সহ-সভানেত্রী সৈয়দা সাহের বানু, সম্পাদিকা সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন, সৈয়দা নজিমুন্নেসা খাতুন এবং সিলেট রাজকীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী রাবেয়া খাতুন প্রমুখ।[৩৭] এই স্মারকলিপি প্রেরণের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সিলেটের *ইষ্টার্ণ হেরাল্ড* পত্রিকায় ২৮ ফেব্রুয়ারি একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্মারকলিপি ও তাতে স্বাক্ষরকারী জোবেদা খাতুন সম্পর্কে কতকগুলি অশোভন উক্তি করা হয়। প্রতিবাদে সাপ্তাহিক *নওবেলালে* ১১ মার্চ অন্যতম স্বাক্ষরদাতা সৈয়দা নজিমুন্নেসা খাতুনের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেন:

> যাহারা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী হইয়া মাতৃভাষার বিরুদ্ধাচারণ করেন তাহারা মাতৃভাষার বিশ্বাসঘাতক কু-পুত্র তুল্য। অনেকে আবার না বুঝিয়া, ধর্মের দোহাই শুনিয়া উর্দুর সমর্থন করেন। তাহাদের তত দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু যাহারা ধর্মের দোহাই দেন তাহাদের জিজ্ঞাসা করি যে উর্দু ভাষাভিজ্ঞ অপেক্ষা সিলেটের উর্দু অনভিজ্ঞ মুসলমানেরা ইসলাম ধর্মের অনুশাসন পালনে কোন অংশে হীন? ... আমাদের বক্তব্য ছিল যে উর্দু ভাষাভাষি অধিক সংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া পর্দানসীন মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অসম্ভব বলে অল্প দিনের মধ্যে অল্প শিক্ষিত নারী জাতি অশিক্ষিতা হইয়া যাইবেন এবং স্ত্রী স্বামী পুত্রের

> সহযোগিতা করিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রভাষা যদি বাংলার পরিবর্তে উর্দু হয়, তবে আমাদের মত অল্প শিক্ষিতা নারীদের জন্য উর্দু শিক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে তাহা আমাদের ধারণাতীত।[৩৮]

রাজশাহীতে গোলাম রহমান, একরামুল হক, আবুল কাশেম চৌধুরী, মোহাম্মদ সুলতান (১৯২৮-৮৩) এবং গোলাম তাওয়াব (প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান) প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলাভাষার পক্ষে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। পাবনাতে প্রসাদ রায়, আমিনুল ইসলাম, আলাউদ্দীন প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলা ভাষার আন্দোলন এগিয়ে চলছিল। বগুড়াতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক কবি আতাউর রহমান, শ্যামাপদ সেন, অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, জালালউদ্দীন আকবর, আব্দুল মতিন প্রমুখের নেতৃত্বে আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বগুড়ায় এই আন্দোলনের সঙ্গে আরো যুক্ত ছিলেন প্রফেসর আবুল খায়ের, প্রফেসর গোলাম রসুল, প্রফেসর প্রীতীশ দত্ত। বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহরও সার্বিক সমর্থন ছিল।[৩৯]

৭. মন্ত্রীদ্বয়ের সঙ্গে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য করাচিতে যাত্রার পূর্বে পূর্ব বাংলার মন্ত্রীদ্বয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী (১৯০৬-১৯৬৬) হবীবুল্লাহ বাহার ও সাপ্লাইমন্ত্রী নুরুল আমীনের (১৮৯৩-১৯৭৪) সঙ্গে ২০ ফেব্রুয়ারি তমদ্দুন মজলিশের রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল এবং কয়েকজন সাংবাদিক সাক্ষাৎ করেন। পাকিস্তানের মুদ্রা, টিকিট, মনি অর্ডার ফরমে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগে নিয়োগের পরীক্ষা ইত্যাদিতে বাংলাকে বাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তাঁরা তার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিনিধিদল বিষয়টি নিয়ে গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪) ও ডক্টর মাহমুদ হাসানের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। তমদ্দুন মজলিশের অধ্যাপক আবুল কাসেম জানান যে, গণ পরিষদে পুর্ববঙ্গের সদস্যরাও প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁরা এ বিষয়ে যথাসাধ্য বাংলাভাষার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরবেন।[৪০]

৮. গণপরিষদে ভাষার প্রশ্ন উত্থাপন ও প্রতিক্রিয়া

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় করাচিতে। এই অধিবেশনে পূর্ব বাংলার কংগ্রেস দলীয় সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১) ভাষা বিষয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৪১] প্রস্তাবটি ছিল উর্দু এবং ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হোক। কিন্তু মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের তীব্র বিরোধিতার মুখে এই সংশোধনী প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ২৫ ফেব্রুয়ারি সংশোধনী প্রস্তাবটির উপর আলোচনা শুরু হলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান (১৮৯৭-১৯৫১) বলেন:

> পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা হইতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।[৪২]

গণপরিষদে এই প্রস্তাব তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং অবস্থাটা এমন দাড়ায় যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল মুসলমান সদস্য প্রস্তাবের বিরোধিতা ও নিন্দা করেন। অন্যদিকে যে কয়েকজন হিন্দু সদস্য পরিষদের সভ্য ছিলেন তাঁরা তাঁকে সমর্থন করেন। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতায় পৌঁছেই শেষ হয়নি, পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সদম্ভে ঘোষণা করে বলেন যে, "পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে, একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।"[৪৩]

গণপরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় বাংলাভাষী সদস্যরা বাংলাকে পরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার খবর ঢাকা এসে পৌঁছালে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত ঘটনার পর সিলেটের *নওবেলাল* এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *অমৃতবাজার পত্রিকা*, *যুগান্তর* ও *স্বাধীনতা*সহ বিভিন্ন পত্রিকা এ ব্যাপারে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এ সম্পাদকীয়গুলোর মাধ্যমে গণ পরিষদের লিয়াকত আলী খান, তমিজউদ্দীন খান, খাজা নাজিমুউদ্দিনসহ উর্দু সমর্থক বিভিন্ন নেতার বক্তব্যের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়। *নওবেলাল* একটি জেলা শহর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও খুব স্পষ্টভাবে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বক্তব্যকে খণ্ডন করে। এভাবেই পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠতে থাকে জনমত।

গণপরিষদে প্রদত্ত খাজা নাজিমুদ্দিনের উক্ত বক্তৃতার ফলে পুর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রদেশের নেতৃস্থানীয় পত্রিকা *দৈনিক আজাদ* ২৭ ফেব্রুয়ারি *বাংলা ভাষা ও পাকিস্তান* শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেন:

> খাওয়াজা সাহেব কবে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের গণভোট গ্রহণ করিলেন, তাহা আমরা জানি না। আমাদের মতে, তাঁর উপরোক্ত উক্তি মোটেই সত্য নয়। আমরা বিশ্বাস করি, গণভোট গ্রহণ করিলে বাংলা ভাষার পক্ষে শতকরা ৯৯ ভোটের বড় কম হইবে না। এই অবস্থায় এমন গুরুতর ব্যাপারে তিনি (খাওয়াজা নাজিমুদ্দিন) এইরূপ একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করিয়া শুধু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থেরই ক্ষতি করেন নাই, এদেশবাসীর পক্ষে আপন প্রতিনিধিত্বের অধিকারের মর্যাদাও ক্ষুণ্ন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থকে এভাবে বিকাইয়া দেওয়া কি এতই সহজ?[৪৪]

একই দিনে দৈনিক *ইত্তেহাদ* 'অবিশ্বাস্য' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন:

> এমন একটি নির্দোষ প্রস্তাব এবং যে প্রস্তাবের সহিত পাকিস্তানের তিন-চতুর্থাংশ নাগরিকের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন জড়িত তাহাকে বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রস্তাব অভিহিত করাতে এ প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করার পথ খোলাসা হইয়াছে বটে, কিন্তু ন্যায় ও যুক্তির দরওয়াজা বন্ধ করা হইয়াছে।[৪৫]

২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ তারিখের *আজাদে* গণপরিষদে মুসলিম লীগের ভূমিকার বিরুদ্ধে 'বাংলা ভাষার অপমান' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> পাকিস্তান রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের পুর্ব্ব হইতেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে, তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ শুরু হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই বাদানুবাদের তীব্রতা বৃদ্ধি হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত মহলে, বিশেষ করিয়া ছাত্র ও যুবক মহলে এই আশংকা জাগে যে, পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা উপেক্ষিত হইবে। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বুদ্ধিমান মানুষ এই আশংকাকে অমূলক মনে করিয়াছিলেন, কারণ পাক গণপরিষদের

> সদস্যগণের সংখ্যাগুরু অংশ এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬১ ভাগেরও অধিক পূর্ব পাকিস্তানের, ও তাহাদের শতকরা ৯৯ জনেরও অধিক বাংলাভাষী। এমতাবস্থায় বাংলা তো উপেক্ষিত হইতেই পারেনা, অধিকন্তু ইহা সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু পাক গণপরিষদের সিদ্ধান্তে পূর্ব পাকিস্তানের আশাবাদী বিদগ্ধ সমাজের সকল স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে। পাক গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসাবে বাংলাভাষাকে গ্রহণ করার দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় এই আশংকাই বদ্ধমূল হইতেছে যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাষা আজাদ পাকিস্তানে কোন স্থান পাইবেনা এবং ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাঙ্গীন অগ্রগতি আশংকাজনকভাবে ব্যাহত হইবে।[৪৬]

পাকিস্তান গণপরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের এই আচরণের বিরুদ্ধে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এই বিষয়কে উপলক্ষ করে প্রত্যক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক হলে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১২-৮২), রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-৯৭), অজিত গুহ (১৯১৪-৬৯), আবুল কাসেম (১৯২০-১৯৯১), নঈমুদ্দিন আহমদ, তফাজ্জল আলী, মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-৮৭), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-৭১), সরদার ফজলুল করিম ও তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-৭৫) প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ। এই সভায় ভাষা আন্দোলনকে সুষ্ঠু ও সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। কমিটির নামকরণ করা হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বা নুতন সংগ্রাম পরিষদ। এই নবগঠিত পরিষদে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতার সমন্বয় ঘটে। সকল শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ছিল বলে এটি পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলনের কর্মসূচি সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঐ দিন এক প্রস্তাবে সারা পূর্ব বাংলায় ১১ মার্চ ১৯৪৮ সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৪৭]

সিলেটের সাপ্তাহিক *নওবেলাল*-এ ৪ মার্চ তারিখে 'রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়।

১১ মার্চের ধর্মঘটের সমর্থক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে ঢাকার বাইরে যেমন: যশোর, রাজশাহী, সিলেটে সরকার সমর্থক এবং উর্দু সমর্থক গুণ্ডা বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় এবং জনসমাবেশে হামলা চালায়। পুলিশ সব জায়গায়ই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সিলেটে *নওবেলাল* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ আজরফের উপর উর্দু সমর্থক গুণ্ডা বাহিনী হামলা চালায়।[৪৮]

বাংলাভাষার আন্দোলনে সিলেটের জনসাধারণের মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিরোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম থেকেই ছাত্র, সাংবাদিক, নারীসহ সর্বসাধারণ দৃঢ়ভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলা ভাষা সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের পুরোভাগে তাঁরা অবস্থান নেন। তাঁদের এই প্রতিরোধের আর একটি উদাহরণ ১১ মার্চ (১৯৪৮) তারিখে ভাষা প্রশ্নের উপর সিলেটের আঠারো জন বিশিষ্ট নাগরিকের এক দীর্ঘ বিবৃতি।

৯. ১১ মার্চ ১৯৪৮-এর আন্দোলন ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া

ভাষা আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের লেখনীর মাধ্যমে। পরবর্তী পর্যায়ে যখন বাঙালি জনসাধারণ ভাষার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয় তখনও বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ছাত্র, রাজনীতিক কর্মীর সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁরা কাজ করতে থাকেন। অন্য সকলের সাথে আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ ছিল। মিছিল, শোভা-যাত্রা, মিটিং সবকিছুতেই তাঁরা সক্রিয় ছিলেন। ফলে তাঁদের শাসকগোষ্ঠীর কোপানলে পড়তে হয়েছে, নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে, সর্বোচ্চ ত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়েছে। বগুড়াতে কবি আতাউর রহমানকে আহ্বায়ক করে 'বাংলাভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। বগুড়ার কমিটিতে অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধি ছিলেন। একজন ছাত্রী প্রতিনিধি ছিলেন রহিমা খাতুন। তাঁর অভিভাবক ও বড় ভাই ডাক্তার মোজাফফর রহমান ছিলেন বগুড়া মুসলিম লীগের সদস্য। তারপরও তাঁর বোন সংগ্রাম কমিটির সদস্য হয়েছেন শুনে ডাক্তার মোজাফফর রহমান বলেন, "বাংলাভাষা আন্দোলনের জন্য আমার বোন সংগ্রাম কমিটির সদস্যা হয়েছে এতে আমি গর্ববোধ করছি।"[৪৯]

১১ মার্চকে সফল করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি চলে। আগের দিন সর্বদলীয় 'রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' সুপরিকল্পিতভাবে দিনটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছাত্র সমাজ ব্যাপকভাবে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু শক্ত পিকেটিং সত্ত্বেও কিছু কর্মচারী অফিসে যায়। শুধু তাই নয়, এ. কে. ফজলুল হকের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ প্রায় সকল আইনজীবী সেদিন কোর্টে যাবার জন্য ছাত্রদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। তা সত্ত্বেও ঢাকা শহরসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহরে ধর্মঘট পালিত হয়।[৫০] ১১ মার্চের দেশব্যাপী ধর্মঘটে সরকার বহু ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সাংস্কৃতিক কর্মীকে গ্রেফতার করে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে আহত হয় ছাত্র, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী অনেকে। এতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। পরবর্তী তিনদিন পর্যন্ত ধর্মঘট চলাকালীন পুলিশি নির্যাতন এবং বন্দিমুক্তির দাবিতে অব্যাহত বিক্ষোভ চলতে থাকে।

গাজীউল হক লিখেছেন:

> ১১ মার্চের আন্দোলন শুধু ঢাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই ধর্মঘট পূর্ব বাংলার সব কটি জেলার সব কটি শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ... বগুড়াতে ১১ মার্চে যে মিছিল বের হয় সে মিছিলে নেতৃত্ব দেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ... মিছিল শেষে বগুড়া জেলা স্কুল ময়দানে সেদিনের সভাপতি ছিলেন তিনি। সভাপতি হিসেবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির পক্ষে দীর্ঘ সময়ব্যাপী যে যুক্তি ও তথ্য নির্ভর ভাষণ তিনি রেখেছিলেন তা সেদিনের জনসমাবেশকে বিমোহিত করেছিলো।[৫১]

যশোর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম-আহ্বায়ক ছিলেন আলমগীর সিদ্দিকী এবং হামিদা সেলিম (রহমান)। সভাপতি ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি ড. জীবনরতন ধর। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন হাবিবুর রহমান, অনন্ত মিত্র, মসিউর রহমান প্রমুখ। রংপুর বড় ভিটায় বড় ভিটা এম.ই. স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকরা ধর্মঘট করে স্কুল প্রাঙ্গণে সভা করে বাংলাভাষার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ

করেন।[৫২] ১১ মার্চ এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) সামান্য আহত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর বিবৃতি ১৩ মার্চ *দৈনিক আজাদে* প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেন:

> ১১টার সময় যখন তিনি অন্যান্য আইনজীবীর সাথে হাইকোর্টে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন, একদল ছাত্র বাধা দেয়। ... তিনি যখন তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন দেখেন বৃহৎ একদল ছাত্র তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ফটকের দিকেই দৌড়ে আসছে। পিছু পিছু একদল পুলিশ লাঠি ও সঙ্গীন নিয়ে দৌড়াচ্ছে। ... এই গোলযোগের মধ্যে হক সাহেবের হাঁটুর নিচে পুলিশের লাঠির আঘাত লাগে। আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তিনি ধৃত তরুণদের দেখার জন্য জেল ফটকে এবং আহতদের দেখার জন্য হাসপাতালে যান।[৫৩]

ঐ তারিখের *আজাদের* প্রতিবেদন অনুযায়ী 'ইনসাফ' সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী গ্রেপ্তার হন এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম আহত হন। চাঁদপুরে ১১ মার্চ ধর্মঘট ঘোষণা না করা হলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ থাকে। বেলা দুটায় ছাত্র ও জনসাধারণের এক মিছিল প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে পুরানবাজার ওসমানিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। টাউনলীগের সভাপতি আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে সভা হয়। *ওলামায়ে ইসলাম, তোলাবায়ে আরাবিয়া* প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করা হয়।[৫৪] ১৩ মার্চ পাকিস্তান রেডিও-র ঢাকা কেন্দ্র থেকে জানানো হয় যে পূর্ববঙ্গ সরকার পূর্ববঙ্গের সর্বত্র কলকাতার দৈনিক *আনন্দ বাজার*, *অমৃতবাজার* ও *স্বাধীনতার* প্রচার বন্ধ করে দিয়েছেন। ওইদিন সকালে কলকাতা থেকে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এইসব পত্রিকা এসে পৌঁছালে পুলিশ তা আটক করে।[৫৫]

১১ মার্চের ঘটনা সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ সরকারের ইশতেহারটি ১৩ মার্চ *আজাদে* প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়:

> বাংলা ভাষাকে কেন্দ্রে সরকারি ভাষা করা হবে না বলে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রতিবাদে ১১ মার্চ যে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিল কতিপয় বিভেদকারী ও একদল ছাত্র তা কার্যকর করার চেষ্টা করে। শহরের সমগ্র মুসলিম এলাকা এবং অমুসলিম এলাকার অধিকাংশ লোক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে। শুধুমাত্র কয়েকটি হিন্দু দোকান বন্ধ করা হয়। কিন্তু আইন-আদালতে স্বাভাবিকভাবে কাজ কর্ম চলতে থাকে। তবে রমনা অঞ্চলে ধর্মঘটীরা কিছু অফিস-কর্মচারীকে নিরস্ত্র করতে সমর্থ হয়। শোভাযাত্রায় পুলিশের হস্তক্ষেপের ফলে ১৪ জন আহত হয়ে হাসপাতালে আছে, তার মধ্যে কারো আঘাত গুরুতর নয়। কয়েকটি স্থানে খানাতল্লাশির ফলে প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং পাকিস্তানের শাসনযন্ত্রে গোলযোগ সৃষ্টি করার এক গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্য সরকারের হস্তগত হয়েছে।[৫৬]

'ঢাকার বিক্ষোভ' শীর্ষক ১৪ মার্চের সম্পাদকীয়তে *আজাদ* উক্ত ইশতেহারের অযথার্থ বক্তব্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করে:

> ... সরকারী এশতেহারে বলা হয়েছে যে, কেবল অমুসলমানদের একাংশ বিক্ষোভসূচক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। আমাদের ধারণা এই যে, এই বিবরণ সম্পূর্ণ নহে, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নজড়িত আন্দোলন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ে আবদ্ধ নহে। এ প্রসঙ্গে সম্প্রদায়িক প্রশ্ন তোলার কোনো কারণ বা সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে করি না।[৫৭]

বিক্ষোভ ১৭ তারিখেও অব্যাহত থাকে। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ পরিস্কার জানতেন যে কিছুদিন পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা আসছেন এবং তিনি বাংলা ভাষার ব্যাপারে ভিন্ন মত

পোষণ করতে পারেন। এ জন্যেই সংগ্রাম পরিষদ তাদের চাপ অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৭ মার্চ সন্ধ্যায় ফজলুল হক হলের হাউস টিউটর মযহারুল হক (১৯১১-৭৪)-এর কামরায় বসে ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মযহারুল হকের এই কামরাটি সংগ্রাম পরিষদের কর্মীদের বৈঠকের জন্য মাঝে মাঝেই ব্যবহৃত হতো। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহল বাংলা ভাষা প্রশ্নে সব সময় সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করেছিলেন।[৫৮]

১৫ মার্চ ১৯৪৮ পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বসলে ২৯ ফেব্রুয়ারি ও ১১ মার্চের ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হয়। অধিবেশনে ভাষার প্রশ্নে আলোচনায় অংশ নেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১), মওলানা ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪), ড. প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় (১৮৮৭-১৯৮২), প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (১৮৯৩-১৯৭৪), মনোরঞ্জন ধর (১৯০৪-২০০০), ডা. এ এম মালিক, আবু তায়েব মাজহারুল হক, মফিজউদ্দীন আহমদ, শামসুদ্দিন আহমদ, মাহমুদ আলী, মহিউদ্দীন আহমদ (১৯০৬-১৯৭৫), আনোয়ারা খাতুন, এ.কে. ফজলুল হক, মোহম্মদ রুকনউদ্দীন প্রমুখ। ১৭ মার্চ ভাসানী ভাষার প্রশ্ন উত্থাপন করে সংসদের কর্মসূচি ইংরেজিতে আলোচনা না করে বাংলায় করার দাবি জানান। তিনি বলেন:

> এখানে যাঁরা সদস্য আছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে, এটা বাংলা ভাষা-ভাষীদের দেশ এই Assembly-র যিনি সদর (স্পীকার) তিনিও নিশ্চয়ই বাংলাতেই বলবেন। আপনি কি বলেন, আমরা তা কিছুই বুঝতে পারি না। আপনি যা বলেন তার সহিত সদস্যদের ডিসকাশনের কোনো সংশ্রব থাকতে পারে না। আপনি যদি বাংলায় রুলিং না দেন তা হলে আমরা আপনার আলোচনায় শরিক হবো কি করে? আমি আশা করি, আপনি রুলিং দিবেন যেন সবাই বাংলাতেই বলেন এবং আপনিও বাংলাতে রুলিং দিবেন।[৫৯]

ভাসানীর এই বক্তব্যের উত্তরে স্পীকার যখন বললেন, "যিনি যে ভাষা জানেন তিনি সেই ভাষায় বলবেন"। তখন তাঁর প্রতিবাদে তিনি "বাংলা ভাষাতেই যাতে সকলে বলেন তার ব্যবস্থা" করতে স্পীকারকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন।

১৯ মার্চ বাজেটের ওপর বিতর্কে অংশ নিয়ে ভাসানী প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। এক পর্যায়ে তিনি রেগে গিয়ে বলেন:

> ... আমরা কি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের গোলাম? বৃটিশ গভর্ণমেন্টের গোলামী করি নাই। ন্যায়সংগত অধিকারের জন্য চিরকাল লড়াই করেছি, আজও করবো। আমরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পাট উৎপাদন করবো, অথচ জুট ট্যাক্স এমনকি রেলওয়ে ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স নিয়ে যাবে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট। এইসব ট্যাক্সের শতকরা ৭৫ ভাগ প্রদেশের জন্য রেখে বাকি অংশ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে দেওয়া হোক।[৬০]

মাওলানা ভাসানী ভাষার প্রশ্নসহ পুর্ব বাংলার স্বার্থের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার তথা মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। বিশেষত মওলানা ভাসানী তখনও ছিলেন সরকার দলীয় লোক। তাঁর সদস্য পদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন।

পূর্ব বাংলা সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহারের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কবিতা, শিশু সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, পুঁথিসাহিত্য ও লোক সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন মূল সভাপতি। বুদ্ধিজীবীসহ বিপুল জনসমাগমে সম্মেলন শুরু হয়। কবি গোলাম মোস্তফা নবজাত রাষ্ট্রের চেতনা ও সাহিত্যিকদের নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেন।

মূল সভাপতি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনের একটি বিশেষ দিক হলো সম্মেলনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনের অন্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ আলী আশরাফ, সৈয়দ আলী আহসান (১৯১৮-২০০২), অজিত কুমার গুহ। কবি জসিমউদ্‌দীন, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) প্রমুখ। সভাপতির ভাষণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আরবি হরফে অথবা রোমান হরফে বাংলা লেখার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করে জোরালো বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি বলেন:

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাঁড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।[৬১]

ডক্টর শহীদুল্লাহর এই দুঃসাহসিক উক্তির প্রতিবাদ করে পূর্ব বাংলার শিক্ষা সচিব ফজলে আহম্মদ করিম ঐ সভায় বলেছিলেন: ''আজ এখানে যে সমস্ত প্রবন্ধগুলি পড়া হলো সেগুলি শোনার পর আমি ভাবছি আমি কি ঢাকাতে আছি না কোলকাতায়।"[৬২] শিক্ষা সচিব সভাপতির ভাষণের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে বাংলা ভাষা নিয়ে আপত্তিকর কিছু উক্তি করেছিলেন এবং তা নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্যে বাদানুবাদ হয়। শ্রোতাদের আপত্তির মুখে ফজলে করিম মঞ্চ থেকে নেমে আসতে বাধ্য হন। সম্মেলনে উপস্থিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, মুসলিম লীগ সরকার সমর্থক, উর্দু সমর্থক, মুসলিম লীগ বিরোধী বাংলা ভাষার সমর্থক, মুসলিম লীগ সমর্থক কিন্তু বাংলা ভাষার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণির শ্রোতৃমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। ফলে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্যের সমালোচনা সভায় ও সভার বাইরে চলতে থাকে এবং পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। দৈনিক *আজাদ* ও *সৈনিক* পত্রিকায় বক্তব্যের বিরূপ সমালোচনা হয়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহার মুসলিম লীগ সরকারের মন্ত্রী হলেও প্রগতিশীল মন-মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। তখনও মুসলিম লীগের অনেকেই বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো অবস্থান নেন। মাওলানা ভাসানী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আবার শিক্ষাসচিব ফজলে আহম্মদ করিম প্রমুখ সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন।

১ জানুয়ারি ১৯৪৯ সালে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্যের সমালোচনা করে দৈনিক *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) উপ-সম্পাদকীয়তে ইসলামি ভাবধারা আমদানির পক্ষে বললে ডক্টর শহীদুল্লাহ সে বক্তব্যের বিরোধিতা করেন।[৬৩]

উক্ত সাহিত্য সম্মেলন ছিল বুদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশ। এখানে ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় তা কার্যকর করার দাবি জানানো হয়। এই সম্মেলনে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের ভাবধারা তাঁদের কর্মকাণ্ড ও মতামত প্রকাশ দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। ৯ জানুয়ারি ১৯৪৯এর সাপ্তাহিক 'সৈনিক'-এ 'প্রত্যক্ষদর্শীর একটি বিস্তারিত বিবরণ' শীর্ষক এক লেখায় আকালী চৌধুরী ডক্টর শহীদুল্লাহর 'মুসলমানের চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী' এই মতের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।[৬৪]

লেখকের বক্তব্যে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, বুদ্ধিজীবীরা নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে রাষ্ট্রে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছিলেন। যারা বাংলা ও বাঙালি পরিচয় বড় করে দেখতে চায়নি তারাই তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর বাংলা ভাষা-বিরোধী পদক্ষেপকে সহযোগিতা করেছিল। ফলে আমরা দেখি, পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৫ মার্চ, ১৯৪৮এ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে আট দফা চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং কিছুদিন পরই ঐ চুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আবারো উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে দম্ভভরে ঘোষণা করেন। উর্দুপ্রিয় অনেক বাঙালি মুসলমান যেমন রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিরোধিতা করেছিলেন তেমনি মুসলিম লীগ সমর্থক, বাঙালি মুসলমানদেরও অনেকে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক এটা চেয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীসহ তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবীরাও ক্ষমতার জন্য মুসলিম লীগের উর্দু-ঘেঁষা নীতির বিরোধিতা করেননি। আবার কোনো কোনো অবাঙালিও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন।

১০. বর্ণমালা পরিবর্তন ও ভাষা সংস্কারের চেষ্টা

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭ সাল থেকে বাংলা ভাষায় আরবি বর্ণমালা প্রচলনের চেষ্টা চালান। এই উদ্যোগের প্রধান সমর্থক ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের অবাঙালি শিক্ষা সচিব ফজ্‌লে আহমদ করিম এবং চট্টগ্রাম 'হরফুল কোরআন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা জুলফিকার আলী।[৬৫] মাওলানার মতে, মুসলমানদের শিক্ষা কোরআন মজিদে ব্যবহৃত আরবি বর্ণমালার মাধ্যমে হওয়া উচিত। তিনি আরবি বর্ণমালায় লেখা বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করতেন যাতে এভাবে বাংলা পড়ালেখা সহজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে যেসব যুক্তি দেয়া হতো, তা হচ্ছে বাংলা ভাষায় বহু যুক্তাক্ষর থাকায় মুদ্রাক্ষর ও সাঁটলিপিতে নানা অসুবিধা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে আরবি বর্ণমালা ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা আছে। তাই আরবি বর্ণমালা ব্যবহার করা বাংলার চাইতে সুবিধাজনক। ওই বর্ণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে সংহত করা সহজতর হবে।[৬৬]

পরবর্তীকালে আরবি অক্ষরে বাংলা লেখা শুরু হয়। এজন্য প্রায় বিশটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য আরবি অক্ষরে বাংলা বই লেখা হয়।

সরকারের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীসহ জনগণের মধ্য তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' সরকারের এই প্রচেষ্টার নিন্দা জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্ররা এর প্রতিবাদে কর্তৃপক্ষের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে। তাতে বলা হয়, আঞ্চলিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে পাকিস্তানের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এতে 'পাক-বাংলার' জনমনে অধীনতার আশঙ্কা স্থায়ীভাবে ছাপ ফেলছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, ইকবাল হল সংসদ এবং ইডেন গার্লস কলেজ ছাত্রী সংসদও সরকারি উদ্যোগের প্রতিবাদ জানায়।[৬৭]

১১. ভাষা কমিটি

ব্যাপক প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ পূর্ব বাংলায় প্রচলিত বাংলাভাষার মানোন্নয়ন, সহজীকরণ ও সংস্কারের বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য একটি 'ভাষা কমিটি' গঠন করে।[৬৮] কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন:

১. মাওলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) - সভাপতি
২. হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী - সদস্য
৩. ডা. এ.এম. মালিক, প্রাদেশিক মন্ত্রী - সদস্য
৪. ড. মোয়াজ্জেম হোসেন, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য
৫. মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী (১৮৮৬-১৯৫৩), এম.এল.এ., দিনাজপুর - সদস্য
৬. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য
৭. আবুল কালাম শামসুদ্দিন, এম.এল.এ, সম্পাদক, দৈনিক *আজাদ*, ঢাকা - সদস্য
৮. সৈয়দ আবুল হাসানাত মোহাম্মদ ইসমাঈল, পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক, পূর্ব বাংলা সরকার -সদস্য
৯. মীজানুর রহমান, উপসচিব, শিক্ষা বিভাগ, পূর্ব বাংলা সরকার - সদস্য
১০. মাজউদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, এম সি কলেজ, সিলেট - সদস্য
১১. শইখ শরাফউদ্দিন, অধ্যক্ষ, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা - সদস্য
১২. এ.কিউ.এম আদমুদ্দিন, অধ্যাপক, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, নওগাঁ, রাজশাহী – সদস্য
১৩. মৌলভী জুলফিকার আলী, মালিক, আলাইয়া প্রেস, চট্টগ্রাম - সদস্য
১৪. মৌহিনী মোহন দাস, ঢাকা - সদস্য
১৫. গণেশ চন্দ্র বসু, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য
১৬. গোলাম মোস্তফা, প্রধান শিক্ষক (সদস্য সচিব)

এ ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন ভাষাবিদকেও কো-অপ্ট করা হয়। তারা হচ্ছেন:

১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক (১৯০২-৮২), অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
২. আব্দুল মজিদ, পূর্ব বাংলা সরকারের অনুবাদক (তথ্য অফিসার)
৩. অজিত কুমার গুহ, অধ্যাপক, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

কমিটির বিবেচ্য বিষয় ছিল তিনটি:

১. পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য বাংলাভাষাকে সহজীকরণ, সংস্কার ও মানোন্নয়নের বিষয় বিবেচনা করা (বাংলা ব্যাকরণ ও বানানসহ এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন)।

২. প্রযুক্তিগত পরিভাষা এবং অন্য যে সব বিদেশি শব্দের সমার্থক শব্দ বাংলাভাষায় নেই সেই সব ক্ষেত্রে অনুবাদের সুবিধার্থে নতুন বাংলা শব্দ উদ্ভাবনের পদ্ধতি নির্দেশ করা; এবং

৩. বাংলাভাষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ এবং সাধারণভাবে পাকিস্তানের জনগণের সহজাত ক্ষমতা ও সংস্কৃতির সাথে বাংলা ভাষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন।

দীর্ঘ পৌনে দুই-বছর আলোচনা পর্যালোচনার পর কমিটি ১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে।[৬৯] কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক গণেশ চন্দ্র বসু কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলে কমিটি থেকে তাঁকে বাদ দেয়া হয়। রিপোর্টে প্রস্তাবিত ভাষাকে 'সহজ বাংলা' নাম দেয়া হয়। এটা ছিল কমিটির এক অদ্ভুত আবিষ্কার। কমিটি সকল 'কার' চিহ্ন ব্যঞ্জনবর্ণের ডানে লেখার প্রস্তাব করেন। তাদের যুক্তি ছিল, বাংলা স্বরবর্ণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দুই ধরনের। একটি স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অপরটি তাদের প্রতিনিধি তথা 'কার' রূপে ব্যবহৃত হয় যা আরবি ও ফার্সি ভাষার হরকতের মত। বাংলা ভাষার এই ধরনের স্বরবর্ণকে পৃথক করা দরকার। কমিটির সদস্যগণ দুটি নীতিমালার ভিত্তিতে কাজ করেছেন। তারা আরবি ও ফার্সি বর্ণমালার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। এটা তাদের 'সংস্কৃত', 'সংস্কৃত নীতিমালা', 'সংস্কৃত ব্যাকরণ' ইত্যাদি শব্দ পুনর্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত, তারা বাংলা ভাষায় আরবি বর্ণমালা আবার চালু করার উপায়-উপকরণ বের করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেন। যদিও বাংলা ভাষা কয়েক শত বছরের মুসলিম শাসনামলে (১২০৪-১৭৫৭) বর্তমান আকারেই বিকশিত হয়, তথাপি বাংলা অক্ষর দেবনাগরী থেকে উদ্ভূত। দেবনাগরী হচ্ছে সংস্কৃত তথা হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের আদি ভাষা। বাংলা ভাষার মূল সংস্কৃত হওয়ার কারণেই জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করা হলে শুধু জাতীয় ঐক্যই বিপন্ন হবে না বরং এটা হবে ইসলাম-বিরোধী। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি বৈরী মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। অবশ্য কমিটি রোমান বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার সিদ্ধান্ত কমপক্ষে বিশ বছর স্থগিত রাখারও সুপারিশ করে। সম্ভবত এ কারণে সেই সময় রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়নি বরং ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আমলে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়।

ভাষা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য তালিকা দেখলে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ সদস্যই সরকার সমর্থক। সরকারি আমলা, রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছিল। ভাষা কমিটি প্রস্তাবিত ভাষাকে 'সহজ বাংলা' নামকরণ করেন। বিশ বছর পরে এ রিপোর্ট প্রকাশ ও বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয় যদিও তার আগে ১৯৬০ সালে এটি প্রকাশ পায়। এ রিপোর্ট পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ মেনে নেয়নি।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে পাকিস্তানবাদীরা নানাবিধ কুটিল চক্রান্ত ও অন্তর্ঘাতী পন্থার আশ্রয় নিয়েছিল। তার একটি হল রাষ্ট্রভাষার জন্য আরবি ও রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা। এ সম্পর্কে ডক্টর আনিসুজ্জামান লিখেছেন:

> ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ইসলামী আদর্শ ও জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে বাংলা ভাষার জন্য আরবী হরফ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু করেন। প্রস্তাবটা প্রথমে প্রকাশ পায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর একটি বক্তৃতায়। সেই সঙ্গেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্ররা প্রতিবাদ করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ বাংলা হরফে উর্দু লেখার একটা বিকল্প প্রস্তাবও উত্থাপন করেন। এ সত্ত্বেও আরবী হরফে বাংলা শিক্ষাদানের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা সরকারী উদ্যোগে হতে থাকে। এই সৎকার্যে সরকার বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সাল ছিল এক্ষেত্রে তাদের সবচাইতে তৎপরতার সময়, তবে আরবী হরফের পক্ষে দু'চারজনের বেশী সমর্থক তাঁরা পাননি, বিরোধিতা হয়েছিল প্রবল। এমন কি পূর্ব বাংলা সরকার যে ভাষা সংস্কার কমিটি গঠন করেছিলেন, তাঁরাও এর বিরোধিতা করেছিলেন। আইউবের শখ হল বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষার জন্যই রোমান হরফ প্রবর্তন করা– শুধু বাংলা হরফের বিলোপসাধন আর এতদিনে সম্ভবপর ছিল না। বৈজ্ঞানিকতা ও জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে এবারেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্ররা প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিলেন। উর্দু ভাষার অধ্যাপক ও লেখকেরাও এতে যোগ দেন।[৭০]

১২. ১৯৫০-এর দাঙ্গা-পরবর্তী পরিস্থিতি

এ সময় বাংলা ভাষা-বিতর্ক প্রশ্নে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ[৭১] প্রকাশিত হয়েছিল। তার একটি 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা: উর্দু না বাংলা' লেখেন কবি গোলাম মোস্তফা। এতে তিনি বাংলাকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে বলে অভিমত দেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। বাংলার সে অধিকার, এমনকি যোগ্যতা নেই।' বহু যুক্তির মধ্যে তাঁর প্রধান যুক্তি, পাকিস্তান-রাষ্ট্রের সংহতি ও ঐক্য এবং ইসলামের স্বার্থে উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ প্রবন্ধের একটি মাহাত্ম্য হচ্ছে, তখন পর্যন্ত লেখক-বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত কেন্দ্রীয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলার দাবি সম্পর্কে খুব বেশি উচ্চবাচ্য করেননি। গোলাম মোস্তফা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটিকে নিয়েই আলোচনা করেন। উর্দুর পক্ষে মত দিয়ে এবং বাংলার বিপক্ষে যাবতীয় যুক্তি নির্মাণ করে তিনি অবশ্য খুবই হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটির লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)। কবি গোলাম মোস্তফার প্রবন্ধ পড়েই মুজতবা আলী তাঁর প্রবন্ধটি লেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন বলে মনে হয়। এ প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহিতার সঙ্গে গোলাম মোস্তফার যুক্তিগুলোতে নাকচ করে উর্দুর ওপর বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব ও উপযোগিতা প্রমাণ করেন। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত কিনা এ সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি, কেবল পূর্ব বাংলার 'রাষ্ট্রভাষা' ও শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার ব্যাপারে বাংলার কী যোগ্যতা আছে সেই যুক্তি উপস্থাপন করেন, যদিও তত দিনে পূর্ব বাংলার, বিশেষভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং সংগ্রোম-পরিষদ পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপেই বাংলার দাবি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেন।[৭২]

১৯৫১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বহু সংখ্যক পূর্ব বাংলা পরিষদ সদস্য, গণপরিষদ সদস্য, অধ্যাপক, সাংবাদিক, আইনজীবী, সরকারি কর্মচারী, লেখক, শিল্পী, ছাত্র, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন (১৮৯৩-১৯৭৪)-এর কাছে বাংলাভাষাকে পরবর্তী ১ এপ্রিল থেকে সরকারি ভাষা রূপে চালু করার জন্যে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।[৭৩] এই স্মারকলিপিটি পেশ করার সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডক্টর শহীদুল্লাহ, ইব্রাহীম খাঁ ও কাজী মোতাহার হোসেন অন্যতম। স্মারকলিপিটির মূল বক্তব্য হল:

> পূর্ব বাংলার জনসাধারণ শতকরা একশত ভাগই বাঙলা ভাষাভাষী এবং এই ভাষা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। প্রায় ৫ কোটি জনসাধারণ যাহারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই হিন্দু এবং মুসলমান সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাঙলাভাষার উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং পূর্ব বঙ্গ সরকার যদি বাঙলাকে সরকারি ভাষারূপে এতোদিনে গ্রহণ করিয়া লইতেন তবে আরও বহু উন্নতি সাধন করিত। ১৯৪৮ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন পূর্ববঙ্গ পরিষদে বিনা বাধায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে বাংলাভাষাকে সরকারি ভাষারূপে প্রবর্তন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিন বছর অতিবাহিত হইয়া গেল কিন্তু তাহা কার্যকর হয় নাই।[৭৪]

এই স্মারকলিপি প্রদানকারীরা বলেন যে, বাংলার জনসাধারণের নিজস্ব ভাষা বাংলাতে সরকারি কাজকর্ম শুরু হলে দেশবাসীর মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে এই জন্যেই তাঁরা দেশবাসীর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে স্মারকলিপিটি পেশ করেন।

স্মারকলিপিটি পেশ করার সময় নূরুল আমীন উপস্থিত বুদ্ধিজীবীদের বলেন যে, বহু সরকারি কর্মচারী আছেন যাঁদের পক্ষে বাংলায় নোট দিতে অসুবিধা হতে পারে। এর জবাবে স্মারকলিপিকারদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সরকারি নোট দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করা হোক। তবে এই সময়ের মধ্যে বাংলা না জানা সরকারি কর্মচারীদের বাংলা শিখে নিয়ে এক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতা দূর করতে হবে।

১৩. সংস্কৃতি সম্মেলন ১৯৫১ ও অন্যান্য সম্মেলন

১৯৫১ সালের ১৬ থেকে ১৯ মার্চ চার দিনব্যাপী চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে পূর্ব-পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপকসহ অসংখ্য বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩)। মূল সভাপতি ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩)। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন শওকত ওসমান (১৯১৭-৯৮) ও সায়ীদুল হাসান (১৯২৯-৭১)। সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি হিসেবে কবি বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-২০০০)। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন:

> আজ বিশ্বসাহিত্য তথা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ঢেউ আমাদের চিত্তেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এই সবই ভাল কথা। বিশ্বের সঙ্গে, সকল জাতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত নিবিড় হবে, ততই আমাদের মনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী দূর হবে; ফলে আমাদের সাহিত্যও হবে সুদূরপ্রসারী ও বহু বিস্তৃত। কিন্তু মানুষ তো ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলে নেই – একটা দেশের মাটিতে তার জন্ম হয়েছে, একটা পরিবেষ্টনের মধ্যে সে লালিত পালিত হয়েছে – তার দেহ ও মন খোরাক সংগ্রহ করেছে এক বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান থেকে। কাজেই সেখানকার ভাষা, সেখানকার সাহিত্য, সেখানকার ঐতিহ্য, তার মনের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে, অন্তরের সঙ্গে

> একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে; তাই সেই সবকে বাদ দিয়ে তার মনের কখনো বিকাশ হতে পারে না, মনের ভাবে কোন ফুলই ফুটতে পারে না।[৭৫]

আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর অভিভাষণে ইসলামি সংস্কৃতির নামে যাঁরা দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও দমন করতে নিযুক্ত তাঁদের সমালোচনা করেন।

বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন:

> তিন বছর আগে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বর্তমান গভর্ণর জেনারেল মাননীয় খাজা নাজিমুদ্দিন জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হবে। এই তিন বছরের মধ্যে উক্ত প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার কোন চেষ্টাই অবলম্বন করা হচ্ছে না দেখে আমরা উৎকণ্ঠায় আছি। অধিকন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে অক্ষর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বাংলাভাষার মূলে আঘাত করার যে নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্টে বাংলা ভাষার দাবিকে কোন প্রকার প্রাধান্য দেওয়া হয়নি দেখে আমরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দাবি করছি অবিলম্বে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেওয়া হোক।[৭৬]

১৯৫১ সালের ১৬ মার্চ কুমিল্লায় পূর্ব বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার পরিবর্তে উর্দু প্রবর্তনের চেষ্টা সে সময় পূর্ব বাংলার ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই প্রতিধ্বনি করে ডক্টর শহীদুল্লাহ শিক্ষকদের এই সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেন:

> শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের উপর বাংলা ভাষা ব্যতীত যদি অন্য কোন ভাষা আরোপ করা হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো আমাদের উচিত। এমন কি প্রয়োজন হইলে ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ করা উচিত। বাংলা ভাষা অবহেলিত হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করিব। নুতন ভাষা আরোপ করা পূর্ব বঙ্গে গণহত্যারই শামিল হইবে।[৭৭]

১৪. মওলানা আকরাম খাঁর মত ও তাঁর প্রতিবাদ

১৯৫১ সালের ১৫ এপ্রিল পাকিস্তানের করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় 'নিখিল পাকিস্তান উর্দু সম্মেলন'। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আকরাম খাঁ। সভাপতির ভাষণে মওলানা আকরাম খাঁ বলেন:

> যে একদল লোক পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু ভাষার বিরোধিতা করে তারা সেই মহল থেকে প্রেরণা ও সমর্থন লাভ করে যারা যা কিছু ইসলামি তারই বিরোধী ও তার প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন এবং যেহেতু তারা মনে করে যে উর্দু পাক ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে সেজন্য তারা উর্দুর প্রতিও পোষণ করে বিরূপ মনোভাব।[৭৮]

মওলানা আকরাম খাঁর উক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ করে ১৮ এপ্রিল ১৯৫১ তারিখে ঢাকার ইংরেজি দৈনিক *পাকিস্তান অবজারভার* 'National Language' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> রিপোর্ট অনুযায়ী মওলানা আকরাম খাঁ উর্দু সম্মেলনে বলেছেন যে, পূর্ব বাংলায় যারা উর্দুর বিরোধিতা করে তারা ইসলামের শত্রু। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তিনি এই 'শত্রুদের' মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো ব্যক্তিত্ব যাঁরা উর্দুর পরিবর্তে আরবিকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী তাঁদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেন।

> পূর্ব বাঙলার অপর একজন সংবিধান সভার সদস্য বেগম ইকরামুল্লাহ অবিলম্বে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারকে অফিসে উর্দু প্রবর্তন করার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে একথা বলেননি। কারণ যদিও তিনি সেই অল্প সংখ্যক বাঙালি পরিবারের সদস্য যারা উর্দুভাষী তথাপি তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, তাঁর প্রস্তাব যদি বাস্তবত গ্রহণ করা যায় তাহলে পূর্ব বাঙলার ৯০% সরকারি কর্মচারী যাঁরা উর্দু জানেন না তাঁরা তৎক্ষণাৎ চাকুরিচ্যুত হবেন।[৭৯]

করাচীর উর্দু সম্মেলনে মওলানা আকরাম খাঁ ও শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ কর্তৃক নানা বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য পেশ করার পর ঢাকা এবং পূর্ব বাংলার অন্যত্র ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা তার প্রতিবাদ করেন। করাচীর উর্দু সম্মেলনের পর 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের সভায় কয়েকটি প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবের একটিতে বলা হয়:

> আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলাম। সেই দাবীর উপর ভিত্তি করেই প্রতিশ্রুতিই আমরা জনসাধারণকে দিয়েছিলাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ সে কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের উপর লোক বাংলাভাষী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের মাতৃভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে চাই। উর্দুর সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষার প্রচলন নাও থাকতো তবুও আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলন করতাম। কারণ পাকিস্তানের উন্নতি, পূর্ণ বিকাশ ও একতার জন্য বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা কেবল বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়।[৮০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদে অন্যান্য শ্রেণির সহিত বুদ্ধিজীবীরাও ছিলেন। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত কর্মতৎপরতা ভাষা আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের জনসভায় বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সমাবেশ ঘটে। একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়।[৮১]

১৫. উর্দুর সমর্থনে খাজা নাজিমুদ্দিন ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরুক্তি করেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। এর প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র-ধর্মঘট, মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন বিকেলে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরিতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় এবং তার আহ্বায়ক নির্বাচিত হন কাজী গোলাম মাহবুব। 'সংগ্রাম পরিষদ' রাজনৈতিক প্রতিনিধি, ছাত্র, সংস্কৃতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী সমন্বয়ে গঠিত হয়।[৮২]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিক্ষোভ, সভা ও ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। সংগ্রাম পরিষদের সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, জগন্নাথ হলের মিলনায়তনে যেখানে অধিবেশন বসার কথা সেখানে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে প্রতিবাদ জানাতে যাওয়া হবে। ১৯৫২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারিতে *Pakistan Observer* পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ এর সম্পাদকীয়তে খলিফা ওসমানের কোনো ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সেটা ছিল অজুহাত, আসল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রতি পত্রিকাটির সমর্থন এবং এ জন্য পত্রিকার

সমর্থনমূলক প্রচার বন্ধ করা।[৮৩] পত্রিকাটির সম্পাদক আব্দুস সালামকেও (১৯১০-৭৭) গ্রেফতার করা হয়।

উর্দু সমর্থক ঢাকার ইংরেজি দৈনিক *মর্নিং নিউজ* ১৯৫২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে *Pakistan Observer*-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য নূরুল আমীনের প্রাদেশিক সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, এই পদক্ষেপ খুবই সঠিক হয়েছে যদিও তা নিতে অনেক দেরি হয়েছে। কারণ পত্রিকাটি বহুদিন ধরেই রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে।[৮৪]

ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালে যে আন্দোলন সূচিত হয়েছিল তাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিকের সক্রিয় এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠায় পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধিজীবী মহলের সক্রিয় ভূমিকায় ছাত্রসহ ও জনগণের সচেতন অংশ জাগ্রত হয়। ফলে ১৯৪৭-৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্য অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪৮ সালের মার্চে ছাত্র, শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তথা পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার দাবি মেনে নিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এমনকি তিনি যে আট দফা চুক্তিতে সই করেছিলেন তার শেষ দফাটি খাজা নাজিমুদ্দিন স্বহস্তে লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষার দাবির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নুতন করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পাঁয়তারা করলে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে।

উপসংহার

বায়ান্ন-পূর্ব ভাষার দাবি পর্যায়ে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দুর পক্ষে অবস্থান নেওয়ার প্রতিবাদে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বলিষ্ঠ প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছাত্র ও রাজনৈতিক মহল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। এ সময়ের মধ্যে লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক তথা বুদ্ধিজীবী সমাজ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ছাত্রসমাজ, রাজনীতিক তথা সর্বমহলকে সচেতন করে তোলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাংস্কৃতিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে। এসকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীরা সাহসী ভূমিকা পালন করেন। তমদ্দুন মজলিশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে একমাত্র উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে বাঙালিরা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবিতে সোচ্চার হয়। পাকিস্তান সরকারের উর্দু সমর্থক বুদ্ধিজীবী, আমলা প্রমুখ বিভিন্নভাবে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলে বাংলা সমর্থক বাঙালি বুদ্ধিজীবী তথা অধিকাংশ বাঙালি জনসাধারণ তা প্রতিহত করে বিজয় নিশ্চিত করে। উর্দু-সমর্থক ও বাংলা-সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা পত্র-পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করে। পরে সচেতন ছাত্র, রাজনীতিবিদ এটাকে সভা-সমাবেশ, মিছিল আন্দোলন এবং সর্বোপরি সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা

করতে সক্ষম হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়েও বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে নিয়ে যায়। উর্দু সমর্থক পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমানের উদ্যোগে বর্ণমালা পরিবর্তন ও ভাষা সংস্কারের চেষ্টা, ভাষা কমিটি গঠন, ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৫১ সালে পাকিস্তান বিজ্ঞান সম্মেলন ও সংস্কৃতি সম্মেলন প্রতিটি পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের সংশ্লিষ্টতা আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত করে। বাঙালি উর্দু সমর্থক বুদ্ধিজীবী আবার অবাঙালি বাংলা সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতাও এতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাংলার-সমর্থক বুদ্ধিজীবী ও উর্দু-সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের কিছু রচনা ও লেখার তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হলো।

পরিশিষ্ট

রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাংলার সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের রচনার তালিকা

১. আবদুল হক, ''বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব'', *দৈনিক ইত্তেহাদ*, কলকাতা, ২২ ও ২৯ জুন, ১৯৪৭

২. আবদুল হক, ''পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'', *দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ৩০ জুন, ১৯৪৭; আবদুল হক, *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

৩. মো. মোদাব্বের, ''পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা ভাষাই হবে ইহা বলা বাহুল্য'', সম্পাদক, *সাপ্তাহিক মিল্লাত*, কলকাতা, ২৭ জুন, ১৯৪৭

৪. মাহবুব জামাল জাহেদী, ''রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব'', *দৈনিক ইত্তেহাদ*, কলকাতা, ২০ জুলাই, ১৯৪৭

৫. কবি ফররুখ আহমদ, ''পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য'', *সওগাত*, কলকাতা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৪৭

৬. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ''পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা'', *কৃষ্টি*, নারায়ণগঞ্জ, (১৩৫৪) ১৯৪৭

৭. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ''পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা'', *দৈনিক আজাদ*, ২৯ জুলাই, ১৯৪৭

৮. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ''পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা'', পাক্ষিক *তকবীর*, ১৭ পৌষ, ১৩৫৪

৯. কাজী মোতাহার হোসেন, ''রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা'', *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু*, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭, ঢাকা: তমদ্দুন অফিস, রমনা।

১০. আবুল মনসুর আহমদ, ''বাংলা ভাষাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা'', *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?*, ঢাকা, ১৯৪৭

১১. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, ''অবিশ্বাস্য'', সম্পাদকীয়, *দৈনিক ইত্তেহাদ*, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

১২. অরূপ সরকার, ''পাকিস্তানে গণতন্ত্র'', সম্পাদক, *আনন্দ বাজার পত্রিকা*, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

১৩. অরূপ সরকার, সম্পাদকীয়, ''রাষ্ট্রভাষা'', সাপ্তাহিক *নওবেলাল*, সিলেট, ৪ মার্চ ১৯৪৮

১৪. মাওলানা আকরাম খাঁ, ''বাংলাভাষার অপমান'', *দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

১৫. মাওলানা আকরাম খাঁ, সম্পাদকীয়, ''ঢাকার বিক্ষোভ'', *দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ১৪ মার্চ, ১৯৪৮

১৬. সৈয়দ মুজতবা আলী, ''পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'', সংকলিত: এম.আর আকতার মুকুল (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, শিখা প্রকাশনী।

১৭. Abdus Salam (Editor), "National Language", *The Daily Pakistan Observer*, Dhaka, 18 April, 1951

উর্দু-সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের রচনার উৎস তালিকা

১. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ''শিক্ষার কথা'', *সওগাত*, পৌষ সংখ্যা, কলকাতা, ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ১৯৪৭-১৯৪৮

২. মাওলানা আকরাম খাঁ (সম্পাদক, *দৈনিক আজাদ*), ''বাংলাভাষা ও পাকিস্তান'', *দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

৩. আকালী চৌধুরী, ''প্রত্যক্ষদর্শীর একটি বিস্তারিত বিবরণ'', সাপ্তাহিক *সৈনিক*, ঢাকা, ৯ জানুয়ারি, ১৯৪৯

৪. কবি গোলাম মোস্তফা, ''পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু না বাংলা'', সংকলিত: এম.আর. আখতার মুকুল (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, (ঢাকা: শিখা প্রকাশনী)।

৫. বদরুদ্দীন, "Pakistan Obsever", ইংরেজি *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান সরকার সমর্থক হলেও ভাষা আন্দোলনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সমর্থন দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে সরকারি চাপে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ হতে ইস্তফা দিতে হয়। মাসিক *মোহাম্মদী*, মাসিক *মাহে নও*, মাসিক *দিলরুবা*, মাসিক *নওবাহার*-এর ভূমিকা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, যারা উর্দু ভাষার সমর্থক।

তথ্যনির্দেশ

১ *গ্রেট সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া*, ১০ম খণ্ড, নিইইয়র্ক, ১৯৭৬, পৃ. ৩১৮

২ এডওয়ার্ড শীলস, "ইন্টেলেক্টুয়ালস", *ইনটারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য সোশাল সায়েন্সস*, ডেভিড শীলস (সম্পা.), ৭ম খণ্ড, ইউ.এস.এ., ১৯৯৬, পৃ. ৩৯৯

৩ রবার্তো মিচেলস, 'ইন্টেলেকচুয়ালস', *এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য সোশাল সায়েন্সস*, এডউইন আর.এ. সেলিগম্যান (সম্পা.), ৭ম খণ্ড ইউ.এস.এ., ১৯৫৯, পৃ. ১১৮

৪ বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎ সমাজ*, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৯

৫ মিচেলস, "ইন্টেলেকচুয়ালস", পৃ. ১১৯

৬ মযহারুল ইসলাম, *বাংলা ভাষা বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১২

৭ ''বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব", দৈনিক *ইত্তেহাদ*, কলকাতা, ২২ ও ২৯ জুন, ১৯৪৭। প্রবন্ধকার আবদুল হক, *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

৮ "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা", দৈনিক *আজাদ*, কোলকাতা, ৩০ জুন ১৯৪৭

৯ *তদেব।*

১০ দৈনিক *ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২০ জুলাই, ১৯৪৭

১১ কবি ফর্‌রুখ আহমদ, "পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য", *সওগাত*, আশ্বিন, ১৩৫৪

১২ *কৃষ্টি*, কার্তিক, ১৩৫৪ (নভেম্বর, ১৯৪৭)। যতদূর জানা যায় এই পত্রিকার একটিমাত্র সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল। ড. মুহম্মদ এনামুল হক বাঙালি শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক।

১৩ *তদেব*। সেকালে অনেক লেখকই পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করেও পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য উর্দু রাষ্ট্রভাষা ও পুর্ব-পাকিস্তানের জন্য বাংলা রাষ্ট্রভাষার কথা বলেছেন এবং এই দুই অঞ্চলকে 'রাষ্ট্র' বলেও বর্ণনা করেছেন।

১৪ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা", দৈনিক *আজাদ*, ২৯ জুলাই, ১৯৪৭

১৫ *তদেব*।

১৬ *তদেব*।

১৭ *তদেব*।

১৮ সাপ্তাহিক *তকবীর*, ১৭ পৌষ, ১৩৫৪ (জানুয়ারি ১৯৪৮)।

১৯ এম.এ. কাসেম, *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা –না উর্দু?* ঢাকা, তমদ্দুন অফিস, রমনা, ১৯৪৭, পৃ. ১-২। 'তমদ্দুল মজলিশ' একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন হলেও এর সাথে যুক্ত ছিলেন প্রতিবাদী কিছু ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-অধ্যাপক, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক যারা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তাই সংগঠনটির গুরুত্ব অপরিসীম।

২০ *তদেব*।

২১ কাজী মোতাহার হোসেন, "রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা"; সংকলিত: এম.এ. কাসেম, *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা –না উর্দু*, ঢাকা, তমদ্দুন অফিস, রমনা, ১৯৪৭, পৃ. ৬

২২ *তদেব*, পৃ. ১১

২৩ *তদেব*, পৃ. ১৬

২৪ আবুল মনসুর আহমদ, ''বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা", সংকলিত: এম.এ. কাসেম, *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা –না উর্দু*, পৃ. ১৭

২৫ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃ. ৫৫

২৬ *সওগাত*, চৈত্র, ১৩৫৪ (সম্পাদকীয়), পৃ. ২৩৯

২৭ মযহারুল ইসলাম, *বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি*, পৃ. ১৮

২৮ আব্দুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব*, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৬, পৃ. ৪২-৪৩

২৯ আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, ঢাকা: ইউ.পি.এল, ১৯৯০, পৃ. ৭৮

৩০ *তদেব।*

৩১ সাপ্তাহিক, *নওবেলাল*, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

৩২ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃ. ৫৩

৩৩ গাজীউল হক, *আমার দেখা আমার লেখা*, ঢাকা: মেরী প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১৩

৩৪ *তদেব*।

৩৫ *নওবেলাল*, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

৩৬ *নওবেলাল*, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৪৮

৩৭ *নওবেলাল*, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

৩৮ *নওবেলাল*, ১১ মার্চ, ১৯৪৮

৩৯ গাজিউল হক, *আমার দেখা আমার লেখা*, পৃ. ১৬

৪০ বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ. ২০৮

৪১ নওবেলাল, ৪ মার্চ, ১৯৪৮

৪২ *তদেব*।

৪৩ *তদেব*।
৪৪ দৈনিক *আজাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮
৪৫ *ইত্তেহাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮
৪৬ *আজাদ*, ২৯, ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮
৪৭ মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৮২, পৃ. ৫৩-৫৪
৪৮ সিমিন হোসেন রিমি (প্রকাশক), *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী ১৯৪৭-৪৮*, ঢাকা, প্রতিভাস, ১৯৯৯, পৃ. ১৭৪
৪৯ গাজীউল হক, *আমার দেখা আমার লেখা*, পৃ. ২০
৫০ আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন*, পৃ. ৮১
৫১ গাজীউল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহার স্মৃতিচারণ, বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *একুশের সংকলন '৮০*, পৃ. ১০৯-১১
৫২ *দৈনিক আজাদ*, ১৬ মার্চ ১৯৪৮
৫৩ *দৈনিক আজাদ*, ১৩ মার্চ ১৯৪৮
৫৪ *তদেব*।
৫৫ *নওবেলাল*, ১৯ মার্চ ১৯৪৮
৫৬ *আজাদ*, ১৩ মার্চ ১৯৪৮
৫৭ *আজাদ*, ১৪ মার্চ ১৯৪৮
৫৮ গাজীউল হক, *আমার দেখা আমার লেখা*, পৃ ২৩-২৪
৫৯ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী*, ঢাকা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০৩, পৃ. ৭৯-৮০
৬০ *তদেব*, পৃ. ৮০
৬১ মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙলাদেশ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ২৫৬
৬২ *ইত্তেফাক*, সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১৮২
৬৩ *দৈনিক আজাদ*, ১ জানুয়ারি, ১৯৪৯
৬৪ সাপ্তাহিক *সৈনিক*, ৯ জানুয়ারি, ১৯৪৯। সাপ্তাহিক সৈনিক তমদ্দুন মজলিশের একটি দলীয় পত্রিকা। এতে ভিন্নমত পোষণকারীর বক্তব্যও স্থান পায়।
৬৫ আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, ২নং. (চট্টগ্রাম, ১৯৬৮) পৃ. ৩০৭; ফজলুর রহমান উদ্ধৃত, *তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব (১৯৪৭-৭১)*, ঢাকা, পরমা, ১৯৯৮), পৃ. ৭৫
৬৬ *দৈনিক আজাদ*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৮ ও ১২ মার্চ ১৯৪৯
৬৭ *সৈনিক*, ২২ এপ্রিল ১৯৪৯
৬৮ Government of East Bengal, Resolution No. 590, Edn. 9 March, 1949
৬৯ Report of East Bengal Language Committee, 1947 (Govt. of East Pakistan). p. 112
৭০ আনিসুজ্জামান, "রাষ্ট্রভাষা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক"; অন্তর্গত রঞ্জন, *রক্তাক্ত বাংলা*, কোলকাতা, মুক্তধারা, ১৯৭১, পৃ. ৮৪
৭১ এম. আর. আখতার মুকুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, শিখা প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ৭৩
৭২ *তদেব*।
৭৩ সরলানন্দ সেন, *ঢাকার চিঠি*, ১ম খণ্ড (মোট দুই খণ্ড), কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৩২-৩৩
৭৪ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫, পৃ. ৬১
৭৫ *নওবেলাল*, ২২ মার্চ ১৯৫১
৭৬ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খণ্ড, জাতীয় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫
৭৭ *তদেব*, পৃ. ৭৮
৭৮ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদনায়), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, ১৬ খণ্ড, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ. ২২০ (অতঃপর *দলিলপত্র* রূপে লিখিত)।

৭৯ Daily *Pakistan Observer,* Dhaka, 18 April 1951. বদরউদ্দীন উমর কর্তৃক অনূদিত: তাঁর গ্রন্থ *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খণ্ডে সংকলিত।

৮০ *Pakistan Observer,* 9 September 1951

৮১ *তদেব ।*

৮২ আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ১৭০

৮৩ *তদেব*, পৃ. ১৭১

৮৪ *Morning News*, 14 February, 1952 (বদরুদ্দীন উমর ৩য় খণ্ড হতে অনূদিত)।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, আটত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৭/ডিসেম্বর ২০২০

উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অবস্থান

নাহিদ ফেরদৌসী*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সর্বোচ্চ আদালত। আইনের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের ব্যাখ্যা দেয়ার গুরুদায়িত্ব এই আদালতের। এতে দেশের আইনসমূহ সক্রিয় ভূমিকা রাখে এবং সাধারণ জনগণ আইনের সেবা ভোগ করে। আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আদালতে বিচার পরিচালনায় ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। তবে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল আদালতের ব্যবহারিক ভাষা এখন পর্যন্ত ইংরেজি। জনগণ নিজ ভাষায় আইনি প্রতিকার, রায় বা আদেশ পাওয়ার জন্যই মূলত আর্থিক ব্যয় ও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে। বিদেশি ভাষায় রায় হওয়ার কারণে বিচারপ্রার্থীকে তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে রায়ের সারমর্ম বোঝা বা পরিকল্পিত পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। বাংলায় বিচারকাজ না হওয়ায় জনগণ মাতৃভাষায় বিচার প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ১৯৫৮ সালের হাইকোর্ট রুলস (সংশোধিত ১৯৭৩ সালে) অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে ইংরেজি ব্যবহারের নির্দেশনাটি থাকলেও ২০১২ সালে এই রুলস সংশোধন করে বাংলা ব্যবহারের আইনগত সকল অন্তরায় অপসারিত হয়েছে। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর সহজবোধ্যতার সাথে মাতৃভাষায় ন্যায়বিচার প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলায় রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত আদর্শ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রবন্ধে উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার প্রয়োগের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

একটি জাতির জন্য মাতৃভাষা হলো তার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। মাতৃভাষায় কথা বলা এবং একে সর্বান্তকরণে ব্যবহার করা মানুষের মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। তাই মাতৃভাষায় আইন চর্চার অধিকার এক ধরনের মানবাধিকার। তাছাড়া আদালতে প্রচলিত ভাষার সাথে ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে কারণেই মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ সনদ হিসেবে জাতিসংঘের International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966-এর (বাংলাদেশ ৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে স্বাক্ষর করেছে) ১৪ ধারার ৩ উপধারায় বলা হয়েছে, বিচার প্রার্থীর বোধগম্য ভাষায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে। যদি আদালতের ভাষা বিচারপ্রার্থীর বোধগম্য ভাষা না হয়, তবে তার জন্য দোভাষীর ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা উভয়ই বাংলা। বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

* অধ্যাপক (আইন), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

এদেশের মানুষকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যে সক্রিয় ছিল বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা। তবে স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য এখনও বিতর্ক চলছে।[১]

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'বাংলা ভাষা' একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত।[২] সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন, তাই কোনো উপায়েই এটি অমান্য করার কোনো অবকাশ নেই। সাংবিধানিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭' প্রণীত হয়। অধস্তন আদালতসমূহে বাংলা ভাষায় বিচার কার্যক্রম চললেও উচ্চ আদালতে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজির ব্যবহার অব্যাহত আছে।[৩] ১৯৫৮ সালের হাইকোর্ট রুলস-এ হাইকোর্ট বিভাগের ভাষা 'ইংরেজি' ছিল যা ১৯৭৩ সালে সংশোধিত হাইকোর্ট রুলস[৪]-এ 'ইংরেজি এবং বাংলা' হয়েছে। পুনরায় ২০১২ সালে হাইকোর্ট রুলসটি সংশোধনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।[৫] সুতরাং সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ সত্ত্বেও উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনে যেটুকু অন্তরায় ছিল তা ২০১২ সালের পর হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত আপিল, আবেদনপত্র ইত্যাদি দাখিল বা মাননীয় বিচারপতিগণ কর্তৃক বাংলা ভাষায় রায় লিখতে আইনি প্রতিবন্ধকতা নেই। তবুও উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষায় প্রদত্ত রায়ের সংখ্যা মোটেও আশানুরূপ নয়।

হাইকোর্ট রুলস ছাড়াও উচ্চ আদালতে ইংরেজি ব্যবহারের নেপথ্যে একটি ইতিহাস আছে। তা হচ্ছে, বাংলাদেশের আইন ও আদালত ব্যবস্থা ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনামলের আদালত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজি ভাষায় আইন বিধিবদ্ধকরণ এবং বিচার কার্যক্রম পরিচালনার কাজ শুরু হয়।[৬] পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও বিচার ব্যবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আমাদের দেশ যতকাল যাবৎ বিদেশি শাসকদের শাসনাধীন ছিল ততকাল বিদেশি ভাষা এদেশের আইন ও আদালতের ভাষা ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হলেও বিচার ব্যবস্থার ভাষায় আশানুরূপ ও সময়োপযোগী পরিবর্তন হয়নি।[৭]

এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা শেখা, জানা ও উপযুক্ত স্থানে চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইংরেজি প্রথাগতভাবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাষা, এটি কখনও প্রথম ভাষার স্থান বা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে না। জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিখতে ও ব্যবহার করতে হবে কিন্তু তা কখনোই মাতৃভাষার বিনিময়ে নয়।[৮] জাতীয় উন্নতিকল্পে বিদেশি ভাষায় জ্ঞানার্জন ও সেই ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা, আইন, বিধি-বিধান ও এর অধ্যয়ন, গবেষণা, অনুশীলন ও প্রয়োগের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সর্বদাই প্রশংসিত হলেও বৃহৎসংখ্যক জনগোষ্ঠীর সহজবোধ্যতার কথা বিবেচনাসাপেক্ষে আদালতসমূহের ভাষা বাংলা বা বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি করা যেতে পারে। কোনভাবেই ইংরেজিকে প্রাধান্য দিয়ে মাতৃভাষায় বিচার প্রাপ্তির অধিকার থেকে সাধারণ জনগণকে বঞ্চিত করা

যাবে না। তাছাড়া সম্মানিত বিচারক বা আইনজীবী যে ভাষায় সাবলীল, সেই ভাষায় তাঁদের বিচার কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার কোথাও স্বীকৃত নয়।

দেশের আদালতে বাংলাদেশি নাগরিক অবশ্যই মামলার ফল জানার ও বোঝার অধিকারী। সংবিধান মোতাবেক আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান এবং সবাই আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।[৯] তাছাড়া বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র ও শিক্ষার হার কম থাকায় বিশেষায়িত বিষয়সমূহ যেমন: চিকিৎসাবিদ্যা, আইন প্রভৃতির সাধারণ ভাষাও বুঝতে অপারগ। একজন নাগরিকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আইনজীবীগণ উচ্চ আদালতে আবেদন করলে মাননীয় বিচারপতিগণ যখন ইংরেজিতে রায় দেন তখন রায়ের বিষয়বস্তু, রায়ের কারণ উপলব্ধি করা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় আদালতের রায় অনুধাবন করতে আইনজীবীগণকে টাকা দিয়ে অনুবাদ করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকারীর সততা ও সদিচ্ছার অভাবে বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি ও প্রতারণারও শিকার হতে হয়।[১০] অনেক সময় মামলার পক্ষগণ পরবর্তী করণীয় পদক্ষেপ বুঝতে অক্ষম বিধায় আইনজীবীগণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হন। কাজেই এটি লক্ষ রাখতে হবে, ন্যায়বিচারের পাশাপাশি মামলার পক্ষগণ যেন উপলব্ধি করতে পারেন যে ন্যায়বিচার সুস্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধটিতে উচ্চ আদালতে বর্তমানে বিচারিক কাজ ও রায়ে বাংলা ভাষা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার প্রয়োগ: পরিপ্রেক্ষিত

উচ্চ আদালতসহ দেশের সকল আদালতই প্রজাতন্ত্রের আদালত। বিচার আবেদন থেকে শুরু করে বিচার পরিচালনা, রায় দেয়া, এমনকি রায় কার্যকর করা পর্যন্ত সকল কার্যক্রম লেখ্য ভাষার মাধ্যমে পরিচালনা করতে হয়। আদালতের একটি রায় শুধু কিছু প্রাণহীন অক্ষরের সমষ্টি নয়। ক্ষেত্রবিশেষে একটি রায় একটি জাতি ও রাষ্ট্রের সংঘবদ্ধ চিন্তার মহিমান্বিত রূপ। ফলে রায়টি যাদের জন্য প্রদান করা হয় তাদের ভাষায় প্রণীত না হলে তা সম্পূর্ণরূপে গুরুত্ব হারিয়ে যায়।[১১] এছাড়া বিচার কার্যক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানিত বিচারকগণ এবং আইনজীবীগণ সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই বাঙালি। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিচারপ্রার্থীগণও সবাই বাঙালি। তাই বিজ্ঞ বিচারক ও আইনজীবীগণ বিচারপ্রার্থীর স্বার্থে উচ্চ আদালতের কার্যক্রম, আদেশ, নির্দেশ, রায় ও ডিক্রিতে বাংলা ব্যবহার করতে পারেন।

দেশের অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসমূহে বিচারিক কার্যক্রম, রায়, দণ্ডসমূহ বাংলা ভাষাতেই প্রদান করা হয়। শুধু উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার অবস্থান ভিন্ন প্রকৃতির। উল্লেখ্য, ১৯৭২ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত কোনো আইন সাময়িকীতে উচ্চ আদালত প্রদত্ত বাংলা রায়ের নজির দেখা যায় না। আইন সাময়িকীতেও নজির সৃষ্টিকারী রায়গুলো ইংরেজিতে প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাংলা ভাষায় আইন চর্চা করাও সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে উচ্চ আদালতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সাবেক বিচারপতি এ আর এম আমীরুল ইসলাম চৌধুরী আদালত কার্যক্রম বাংলা ভাষায় লেখা শুরু করেছিলেন।[১২] আইনজীবীদের মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে অ্যাডভোকেট সামছুদ্দিন ও ভাষা সৈনিক গাজীউল হক আদালতে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন।

অ্যাডভোকেট গাজীউল হক সুপ্রিম কোর্টে বাংলা প্রচলনের জন্য আরজি, আপিল, পিটিশন ইত্যাদির নমুনাসমৃদ্ধ প্রথম গ্রন্থের প্রণেতা। বিচারপতি কাজী এবাদুল হক ও বিচারপতি হামিদুল হক 'নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র' নামক ফৌজদারি রিভিশন মামলার রায় বাংলায় প্রদান করে দেখিয়েছেন যে, উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা সম্ভব।[১৩] এটি ছিল একটি নজির সৃষ্টিকারী রায় এবং যা আইন সাময়িকী *ঢাকা ল' রিপোর্টস*-এ প্রকাশিত হয়েছে।[১৪] এভাবে সাবেক বিচারপতি কাজী এবাদুল হকসহ বিচারপতি আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, বিচারপতি ফজলুল করিম, বিচারপতি এ কে বদরুল হক, বিচারপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, বিচারপতি আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ হাইকোর্ট বিভাগে বাংলায় রায় লিখে প্রমাণ করেছেন, উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহার সম্ভব। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগে এবং ২০০৯ সাল পর্যন্ত আপিল বিভাগে দায়েরকৃত কোনো মামলায় এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রায় প্রদান করা হয়নি।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষায় রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখ থেকে হাইকোর্ট বিভাগে অসংখ্য দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রিট মামলায় এবং ১৬ জুলাই ২০০৯ থেকে ১৭ মে ২০১১ তারিখ পর্যন্ত আপিল বিভাগে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রায় প্রদান করেছেন। তিনি 'মতিউর রহমান মিয়া' বনাম 'আছিয়া খাতুন ও অন্যান্য', 'সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল', 'স্থানীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ব্যানারে অংশ নেয়া' এবং 'প্রতি বছরের ডিসেম্বর মাসে নিম্ন আদালতে অবকাশকালীন প্রতি আদালতে একজন করে বিচারকের বিচার কাজ পরিচালনা' সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলার রায় বাংলায় প্রদান করেছেন। যদিও উচ্চ আদালতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আইনগত প্রশ্ন মীমাংসার জন্য মামলা দায়ের ও শুনানি হয় যা সম্মানিত বিচারকবৃন্দ এবং আইনজীবীগণ ইংরেজি ব্যবহারের যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। ২০১১ সালে বহুল আলোচিত 'ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলা'য় সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক উচ্চ আদালতের আপিল বিভাগে প্রথমবারের মতো ১৯০ পৃষ্ঠার রায় বাংলায় প্রদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, বাংলায় আইনের ব্যাখ্যা ও রায় প্রদান সম্ভব।[১৫] এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সদিচ্ছা বাংলা ভাষার যথার্থ প্রয়োগকে সহজ ও গতিশীল করবে।

এছাড়া ২০১২ সালে বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহীমের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বাংলা ভাষায় একটি করে রায় দিয়েছেন। এছাড়াও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ কে এম ফজলুর রহমান, বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন এবং বিচারপতি আশরাফুল কামাল, বিচারপতি কাজী রেজাউল হক, বিচারপতি আবু জাফর সিদ্দিকী, বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনসহ বেশকিছু বিচারপতি মামলায় রায় বাংলা ভাষায় প্রদান করেছেন। বর্তমানে যেহেতু উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনে সাংবিধানিক কোনো নিষেধাজ্ঞা বা আইনগত কোনো অন্তরায় নেই বরং বেশ দৃঢ় সমর্থন রয়েছে, এবং আইনগুলো বাংলায় প্রণীত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মাননীয় বিচারকগণ কর্তৃক বাংলায় রায় প্রদানের মাধ্যমে একটি নতুন ধারা ও সংস্কৃতি তৈরি করতে পারেন।[১৬] বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উচ্চ আদালতে তাদের নাগরিকদের মামলার রায় বোধগম্য করার জন্য তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমন– ফ্রান্স, জার্মানি,

স্পেন ও নেদারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের উচ্চ আদালতে বিচার হয় তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায়।[১৭]

২০০৭ সালে বাংলাদেশে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ফলে ব্রিটিশ আমল থেকে চলে- আসা দীর্ঘ সময়ের বিচার ব্যবস্থার অবসান হয়েছে। তবে আদালতের কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে সাংবিধানিক বিধান কার্যকর করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বস্তুত: বাংলা ভাষার প্রতি ইতিবাচক মানসিকতার অভাব, অধিকাংশ আইন ইংরেজি ভাষায় লিখিত হওয়ায়, দাখিলকৃত আবেদনপত্রের নমুনা ইংরেজি ভাষায় থাকায় এবং সুপ্রিম কোর্টের অধিকাংশ বেঞ্চ অফিসার, স্টেনোগ্রাফারের নির্ভুলভাবে বাংলায় ডিকটেশন নেয়ার ব্যাপারে অদক্ষতার কারণে বেশিরভাগ সময় সম্মানিত বিচারকবৃন্দ এবং আইনজীবীগণ মাতৃভাষার প্রতি দায়িত্ব পালনে অসুবিধার সম্মুখীন হন। তবে মনে রাখতে হবে, বিচারপ্রার্থীর বোধগম্য ভাষায় বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্বও আদালতের। এক সময় উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারে আইনি প্রতিবন্ধকতা ছিল যা অপসারিত হয়েছে। কাজেই অন্তরায়ের বিষয়টিতে গুরুত্ব না দিয়ে নিজ ভাষায় আদালত কার্যক্রম পরিচালনা ও সাধারণ জনগণের বোধগম্য ভাষায় রায় প্রদানের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

বিচারিক ভাষা সংক্রান্ত আইনি বিধান

***গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* ১৯৭২**

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।"

এই গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদটি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রচলনের নির্দেশনাস্বরূপ এবং সে মোতাবেক আদালতসহ প্রজাতন্ত্রের সকল কার্যক্রম বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হওয়ার কথা। কারণ এতে 'দাপ্তরিক ভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা' ব্যবহার না করে 'রাষ্ট্রভাষা' ব্যবহার করা হয়েছে।

এছাড়া সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদকে কার্যকর করতে ৭ অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে–

(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

উক্ত অনুচ্ছেদ সংবিধানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি বিধান। এই বিধানটি সন্নিবেশের ফলে সংবিধানই সংবিধানের প্রাধান্যের নিশ্চয়তার সনদ বহন করেছে। যেহেতু সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন, সেহেতু সংবিধানে যে ভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।[১৮]

বাংলা ভাষার এই নিশ্চয়তা সুদৃঢ়ভাবে কার্যকর করা হয়েছে সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদে। তাই বাংলাদেশের সংবিধান বাংলা ভাষায় প্রণীত হলেও ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য

অনুমোদিত পাঠেরও বিধান আছে। অবশ্য বাংলা ভাষায় রচিত পাঠটি থেকে ইংরেজি পাঠটি প্রাধান্য পায়নি। এ বিষয়ে সংবিধানের ১৫৩ (২) ও (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

(২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোনো পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

এ অনুচ্ছেদটি দৃঢ়ভাবে স্বমহিমায় ভাস্বর যে, বাংলা ভাষার প্রতি সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদেও বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে।[১৯]

সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের বিধানটি যথাযথ মর্যাদায় কার্যকর হয়েছে উচ্চ আদালতে। উচ্চ আদালতের একাধিক রায়ে সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী 'বাংলা পাঠ' প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন– 'ওসমান গনি মন্ডল বনাম মাঈনুউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য মামলায়'[২০] তৎকালীন বাংলাদেশ হাইকোর্ট ও পূর্ব পাকিস্তানের হাইকোর্ট রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের সময়সীমা প্রসঙ্গে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের সপ্তম অনুচ্ছেদ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে উচ্চ আদালতের আপিল বিভাগ মন্তব্য করেন–

> Indeed, whatever ambiguity the English version may be said to contain there appears none in the Bengali version.

সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফা উল্লেখ করে আপিল বিভাগ রায় দেন সংবিধানের বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

অন্য একটি মামলা 'ফজলুল হক চৌধুরী বনাম গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ'[২১] যেখানে সংবিধানের ১৩৫ অনুচ্ছেদের ২ দফায় বাংলা ও ইংরেজি পাঠে বিরোধের প্রশ্ন ওঠে। প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসামরিক পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত ও পদাবনমিত করার ক্ষেত্রে ১৩৫ অনুচ্ছেদের ২ দফায় উল্লেখ হয়েছে– "অনুরূপ পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে তাঁর সম্পর্কে 'প্রস্তাবিত ব্যবস্থা' গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দান না করা পর্যন্ত তাঁকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাবে না।" এই বিধানের ইংরেজি পাঠ হলো–

> No such person shall be dismissed or removed or reduced in rank until he has been given a reasonable opportunity of showing cause why *that action* should not be taken.

বাংলা পাঠে 'প্রস্তাবিত ব্যবস্থা' ইংরেজি পাঠে কেবল 'that action' কথা থাকায় বিরোধের প্রশ্ন ওঠে। হাইকোর্ট বিভাগ মন্তব্য করেন, দুই পাঠে কোনো বিরোধ নেই। তবে যদি বিরোধ থাকে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে। উচ্চ আদালতে বিভিন্ন রায়ে 'বাংলা পাঠে'র প্রাধান্য দিলেও বিচার প্রার্থীর আইনগত সহায়তায় বিচারের সিদ্ধান্ত বা রায় বাংলা ভাষার প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭

সাংবিধানিক বিধানাবলি পূর্ণরূপে কার্যকর এবং বাংলাদেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে ১৯৮৭ সালের ৮ মার্চ 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন' প্রণয়ন করা হয়।[২২] কিন্তু এটি এখনো বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এই আইনের ৩ ধারায় আইনটির প্রবর্তন ও কার্যকরি ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে -

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালতে, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগত কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লিখিত হইবে।

(২) ৩(১) উপ-ধারায় উল্লেখিত কোন কর্মস্থলে যদি কোনো ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় আবেদন বা আপিল করেন তাহা হইলে উহা বেআইনী ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যদি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন অমান্য করেন তাহা হইলে উক্ত কার্যের জন্য তিনি সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধির অধীনে অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারি শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

এছাড়া ৪ ধারায় বলা হয়েছে– "সরকার সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।"

আইনটি সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের আওতায় প্রণীত হয়েছে এবং সকল সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। ১৯৮৭ সাল থেকে বাংলাদেশে নতুন সকল আইন অধ্যাদেশ, বিধি, ও প্রজ্ঞাপন প্রভৃতি বাংলা ভাষায় প্রণীত হচ্ছে। তবে এই আইনটিতে 'অন্য আইনে যা কিছু থাকুক না কেন এই আইনের বিধান কার্যকর হবে' এই ধরনের প্রাধান্যসূচক বিধান না থাকায় আদালতের কার্যক্রমে বাংলা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়নি বলে আইনজ্ঞগণ মনে করেন। কিন্তু আইনটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য বিবেচনা করলে দেখা যায়, আইনটি প্রণয়নের মুল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদকে পূর্ণরূপে কার্যকর করা অর্থাৎ সংবিধানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। আর একারণেই আইনটিতে আইনের প্রাধান্যসূচক বিধান যুক্ত করার আদৌ প্রয়োজন ছিল কি না বিষয়টি ভাবার প্রয়োজন আছে।

১৯৯১ সালে বাংলা ভাষা প্রচলন আইনের কার্যকারিতা সর্বপ্রথম প্রশ্নের সম্মুখীন হয় 'হাসমত উল্লাহ (মো.) বনাম আজমিরি বিবি ও অন্যান্য মামালার'[২৩] মাধ্যমে। অধস্তন আদালত ইংরেজিতে লিখিত আপত্তি প্রত্যাখ্যান করায় মামলাটির সূত্রপাত হয়। হাইকোর্ট বিভাগ অধস্তন আদালতের আদেশ নাচক করে দেন। অধস্তন আদালত আরজি খারিজের আবেদন শুনানির পর তা বাতিল করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ উচ্চ আদালতের হাইকোর্ট বিভাগে ওই আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন মামলা করেন। ওই রিভিশন মামলা শুনানির পর মাননীয় বিচারপতি এ আর এম আমিরুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি এ এম মাহমুদুর রহমান সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ ১৯৯১ সালের ২৮ নভেম্বর প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষাবিরোধী একটি রায় দেন। রায়ে বলেন, বাংলা ভাষা প্রচলন আইনকে সংবিধান পরিপন্থি বা বেআইনি ঘোষণা না করলেও অধস্তন আদালতে ইংরেজি

ভাষা ব্যবহার আইনসম্মত বলে ঘোষণা করা হয়। আদালতের মতে, প্রচলিত আইনে ইংরেজি ব্যবহারের যেসব বিধান রয়েছে, যেমন– ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি এবং ১৯৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি উভয় বিধানে অধস্তন আদালতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার আইনসম্মত বলা হয়েছে।

১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ (২) ধারায় বলা হয়েছে–

> আদালতের ভাষা কী হইবে এবং কোন বর্ণমালার সাহায্যে সেই আদালত সমীপে আবেদনপত্রাদি ও কোন ভাষায় আদালতের বিবরণী লিখিত হইবে, তাহা সরকার ঘোষণা করিতে পারিবেন।

এছাড়া ১৯৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৮ ধারা মতে, আদালতের ভাষা নির্ণয়ের ক্ষমতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

> এই বিধির উদ্দেশ্য বাংলাদেশে অবস্থিত প্রত্যেকটি আদালতের ভাষা কী হইবে, সরকার তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।"

অর্থাৎ হাইকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালতের ভাষা কী হবে তা সরকার নির্ধারণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রচলন আইনটিতে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ধারা এবং ১৯৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৮ ধারাকে বাতিল বা অকার্যকর করেনি। আবার দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭(২) ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৮ ধারা অনুসারে আদালতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার স্থগিত ও নিষিদ্ধ করে সরকার কর্তৃক কোন প্রজ্ঞাপন জারি করা করা হয়নি। ফলে আদালতে সার্বিকভাবে বাংলা ভাষা প্রচলনের পথও প্রশস্ত হয়নি। সুতরাং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭ প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও অধস্তন আদালতের কার্যক্রম ইংরেজি ভাষায় চলতে পারে মর্মে উচ্চ আদালত আদেশ প্রদান করেন। এসব কারণে আইনটি দ্বারা বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুযোগ বাড়লেও আইনটির নিজস্ব কিছু দুর্বলতার কারণে এটি আদালতে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।[২৪]

উল্লেখ্য, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ আইন কমিশন কর্তৃক বাংলা ভাষাকে আদালতের সকল কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের নিমিত্তে দুটি ঘোষণার সুপারিশ করা হয়। এমতাবস্থায় সরকার আদালতের ভাষা বাংলা– এই মর্মে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭(২) ধারার অধীনে একটি এবং ১৯৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৮ ধারার অধীনে একটি অর্থাৎ মোট দুটি ঘোষণাপত্র জারি করতে পারে। প্রস্তাবিত ঘোষণাপত্র দুটি জারি করা হলে আদালতে তা অবিলম্বে কার্যকর করা সম্ভব। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রচলন নিশ্চিত করার জন্য 'আদালতের ভাষা' সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে যাতে সংশয়ের অবকাশ না থাকে। একই সঙ্গে ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনগুলো বাংলায় অনুবাদের সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়গুলোর সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুবাদের কাজ বেগবান করা এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষকে আরো শক্তিশালী, গতিশীল ও উদ্যোগী করে গড়ে তুলতে বলা হয়। কিন্তু সেই সুপারিশটি এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ইংরেজিতে লেখা গাড়ির নম্বরপ্লেট, সব ধরনের সাইনবোর্ড ও নামফলক এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিজ্ঞাপন বাংলায় লেখার যে আদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে

বিচারপতি কাজী রেজাউল হক ও বিচারপতি এবিএম আলতাফ হোসেন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ থেকে দেয়া হয়েছিল, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর ক্ষেত্রে তা সর্বশেষ তাগিদ হিসেবে বিবেচিত হবে।[২৫]

বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত সরকারি আদেশপত্র

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ১২ মার্চ ১৯৭৫ তারিখে এক সরকারি নির্দেশে বলা হয়, 'স্বাধীনতার তিন বছর পরেও অধিকাংশ অফিস-আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না। এ আদেশ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধা-সরকারি অফিসসমূহে কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমে নথিপত্র ও চিঠিপত্র লেখা হবে। এ বিষয়ে কোন অন্যথা হলে উক্ত বিধি লংঘনকারীকে আইনানুগ শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হবে।' এই নির্দেশের পাশাপাশি বাংলা-ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত প্রথম সরকারি আদেশপত্র, ১৯৭৫[২৬] জারি করা হয়। এতে বলা হয়েছে– 'পূর্বেই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সরকারি নথি এবং চিঠিপত্র বাংলায় লেখা হইবে। পুনরায় এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে সকল সরকারি , স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং আধা-সরকারি দফতর[-এ] বাংলায় নথি ও চিঠিপত্র লেখা হইবে। বিদেশের কোন সরকার বা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনে বাংলার সহিত অনুমোদিত ইংরেজী বা সংশ্লিষ্ট ভাষায় প্রতিলিপি ব্যবহার করা চলিবে। তবে কোন বিদেশী সরকার বা সংস্থার সহিত পত্র যোগাযোগ ইংরেজীতে করা যাইবে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।' চার যুগের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও সরকারি কাজে সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। এরপর ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদের সভায় সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রয়োগের একটি সিদ্ধান্ত দেয়া হলেও মজার বিষয় যে সেটি লেখা হয় ইংরেজিতে।[২৭] যাহোক, পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা প্রচলনের নিমিত্তে সরকারি কোনো আদেশ জারি হয়নি।

বিচারিক কাজে বাংলা ভাষা প্রয়োগের অন্তরায়

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট যে, উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা প্রয়োগের প্রসঙ্গ উঠলে অন্তরায়ের কিছু প্রসঙ্গও চলে আসে। এ সমস্ত অন্তরায়ের কারণে উচ্চ আদালতের বিচার কাজে বাংলা ভাষার প্রাধান্য ও চর্চার বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে না বলে মনে করা হয়। বিষয়গুলো হল–

ব্রিটিশ রীতির প্রভাব

বাংলাদেশের আইন ও আদালত ব্যবস্থার আধুনিক ভিত্তি পুরোটাই ব্রিটিশ ভারতের শাসনামলের আদালত ব্যবস্থা থেকে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিম আমলে আদালতে সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষার প্রচলন থাকলেও ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজি ভাষার প্রচলন শুরু হয়।[২৮] প্রায় দুই শত বছর ধরে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি মাধ্যমে আইন ও বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় আদালতে ইংরেজির প্রাধান্য রয়ে যায়। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও বিচার ব্যবস্থার ভাষায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।[২৯] স্বাধীন দেশে জনগণের ভাষা,

সংস্কৃতি, বিচার ব্যবস্থা পৃথকীকরণ ও আইনের পরিবর্তন হলেও বিচার ব্যবস্থায় উচ্চ আদালতের রায়ে এখনো ব্রিটিশ শাসনামলের ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলা ভাষায় আইনের গ্রন্থ ও অনুবাদের স্বল্পতা

আদালতে বাংলা ব্যবহারের পথে অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে বাংলা ভাষায় রচিত আইন গ্রন্থের স্বল্পতা এবং ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত ইংরেজি আইনগুলোর ভাষান্তর না হওয়া। আইনের ব্যাখ্যা, নীতি ও সিদ্ধান্ত বিষয়ক সকল গ্রন্থ ইংরেজিতে থাকায় সম্মানিত বিচারক ও আইনজীবীগণকে মামলা পরিচালনায় দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে ইংরেজি নজির গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এসকল গ্রন্থ এবং সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাংলায় অনুবাদ না থাকার ফলে বাংলা ভাষায় বিচারিক কাজ দ্রুততার সাথে করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলা ভাষা প্রচলন আইনটি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করার ১১ বছর পর ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) অধীনে "বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো)" গঠন করা হয়। কোষের অন্যতম একটি কর্মপরিধি হচ্ছে ব্রিটিশ আমল থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও আদালতে প্রযোজ্য ইংরেজিতে প্রণীত আইন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা। ২০০৭ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ কোডে ১৮৩৬ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ২৬ খণ্ড এবং ১৯৮৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ১২ খণ্ডসহ মোট ৯৫৫টি আইনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২৬ খণ্ডের ৭৫০টি আইন ইংরেজি ভাষায় লেখা। এসব আইনের মধ্য থেকে মাত্র ৯৭টি আইন গত ১২ বছরে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছে। ইংরেজিতে প্রণীত অতীতের এই আইনসমূহ বাংলায় ভাষান্তরের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।[৩০]

অপ্রতুল আইনী পারিভাষিক শব্দাবলি

বর্তমানে বাংলাদেশের আইন ও আদালতে ব্যবহারযোগ্য বাংলায় মানসম্মত পরিভাষা গ্রন্থের অভাব রয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত অধিকাংশ আইন ইংরেজি ভাষায়। আইনের বিভিন্ন ধারার, বিধির, বাক্যের বা শব্দের ব্যাখ্যার জন্য বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবীগণ যে সকল নজির গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন সে সকল গ্রন্থের ভাষাও ইংরেজি। আইনের পরিভাষার অভাব পূরণে সক্ষম আইন কোষ প্রণয়নের জন্য ব্যাপক পরিসরে সরকারি উদ্যোগ দেখা যায় না। সর্বপ্রথম ১৯৯৪ সালে মোঃ আবদুল হামিদ প্রণীত 'আইন কোষ' বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল।[৩১] এরপর ২০০৬ সালে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কর্তৃক যৌথভাবে সংকলিত ও সম্পাদিত 'আইন শব্দকোষ' আইনি পারিভাষিক শব্দাবলির বই প্রকাশিত হয়। তবে এর একটি মাত্র সংকলন প্রকাশিত হয়েছে যা আদালতে বাংলা প্রয়োগে আইনি পরিভাষার অভাব পূরণে পর্যাপ্ত নয়।[৩২]

নজির হিসেবে ইংরেজির প্রাধান্য

আমাদের দেশের উচ্চ আদালতের রায়সমূহ অন্য দেশে বিভিন্ন মামলায় নজির হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বিশেষ করে ভারত ও নেপালে। যদিও সকল মামলার রায় নজির হিসেবে বিবেচিত হয় না, শুধু আইনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম রায়সমূহ নজির হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কিন্তু উচ্চ আদালত ইংরেজি নজির গ্রন্থ, বিদেশি আইন, আইনের নীতি, বিচারিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদির ভিত্তিতে ইংরেজি রায় প্রদান করা হয়। তবে মাননীয় বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবীগণের ইংরেজি ভাষায় আইনের জ্ঞানার্জন ও প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের স্বার্থে বাংলায় বা বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতে রায় দিতে পারেন। কারণ মাননীয় বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবীগণ ইংরেজি ভাষায় আইন চর্চা করলে বিচারিক রায়ের মান যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি আইনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবেন। আইনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম বাংলার সাথে ইংরেজি অনুবাদ থাকলে তা বিচারপ্রার্থীর মানসম্পন্ন বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হবে এবং নজির হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় ভাষানীতির অভাব

বাংলা আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা, দেশের প্রায় শত ভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলে, সংবিধানেও ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার অঙ্গীকার করা হয়েছে। তথাপি বাংলা ভাষার প্রসার ও সুরক্ষায় সুস্পষ্ট ভাষা-নীতি ও আইনি বাধ্যবাধকতা নেই।[৩৩] বাংলা ভাষার প্রসার ও সুরক্ষার জন্য তাই প্রয়োজন সুস্পষ্ট ভাষানীতি ও আইনি বাধ্যবাধকতার।

উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের পদক্ষেপ

আদালত শুধু বিচারক এবং আইনজীবীদের স্থান নয়। এটি মামলার পক্ষগণেরও স্থান, যারা আদালতের মাধ্যমে সুবিচার পেতে আসেন। বর্তমানে উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারে আইনগত কোনো অন্তরায় না থাকলেও প্রচলনের জন্য যে সকল পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা হল–

বাংলা ভাষা প্রয়োগের আইনগত পথ সুপ্রশস্ত করা

বাংলাদেশে ১৯৫৮ সাল থেকে প্রচলিত হাইকোর্ট রুলস ৫৬ বছর পরে ২০১২ সালে সংশোধিত হয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে উচ্চ আদালতে ইংরেজির পূর্বে বাংলা সংযোজন করে আবেদনকারীকে বাংলায় আবেদন করার অধিকার দেয়া হয়েছে। এখন আইন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন এবং প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে তা চিহ্নিত করে তার সংশোধন এবং প্রয়োজন মতো নতুন আইন, বিধি ও বিজ্ঞপ্তি জারি করা প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ভাষা সংক্রান্ত বিধানসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। কারণ বাংলা ভাষা প্রচলন আইনের সাথে দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানগুলি অক্ষত ও বলবৎ থাকায় বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষা প্রয়োগের বৈধতা পেয়েছে। শুধু আইন প্রণয়ন করাই যথেষ্ট নয় বরং সেই আইনকে উপযুক্ত সাংবিধানিক রক্ষা কবচ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা উল্লেখ করে মূল কাজটি করা হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন একটি কমিশন গঠন করে তা বাস্তবায়নের সময় বেঁধে দেয়া এবং দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়নের তদারকি করা।[৩৪]

বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত আইন গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদ

বাংলা ভাষায় আইনের গ্রন্থ রচনা ও আদালতে বাংলা ভাষা প্রয়োগের বিষয়টি সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। ব্রিটিশ শাসনামলে এবং স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে দেশে ইংরেজিতে সংকলিত আইনসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। পাশাপাশি সংসদে যে সকল আইনের সংশোধনী উপস্থাপিত হবে সেগুলো শুধু বাংলা ভাষায় লিখিত হতে হবে। আইনের বিভিন্ন ধারা, বিধি বা শব্দের ব্যাখ্যার জন্য সম্মানিত বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবীগণ যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করে থাকেন, সে গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করা প্রয়োজন।[৩৫] তবে এ পদক্ষেপ নেওয়ার আগে আইনের পারিভাষিক শব্দগুলোর পূর্ণাঙ্গ একটি অভিধান তৈরি করা প্রয়োজন। যেহেতু আইন একটি বিশেষায়িত বিষয়, সেহেতু এর অনেক পরিভাষা আছে যেগুলো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। আমাদের দেশে অনুসরণযোগ্য কোনো নীতিমালা না থাকায় বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে শব্দ বা বাক্য তৈরি করছেন যেগুলো আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহু অর্থজ্ঞাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এক্ষেত্রে ভাষাবিদ, বিচারক ও আইনজীবীগণের সমন্বয়ে আইন পরিভাষা কমিটি গঠন করা যেতে পারে।[৩৬] উল্লেখ্য, ২০২০ সালের মার্চ মাসে আইন কমিশন বর্ধিত কলেবরে 'আইন শব্দকোষ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে। প্রথম সংস্করণের ৬০০০ শব্দের বিপরীতে বর্তমান সংস্করণে প্রায় ১০,৫০০ শব্দ সন্নিবেশিত হয়েছে যা দেশের আদালতসমূহে বাংলা ভাষা চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

ভাষানীতি প্রণয়ন

একটি দেশের ভাষা-পরিকল্পনা ও ভাষা বিষয়ক কার্যক্রম যে নীতির আলোকে তৈরি করা হয় তা ভাষানীতি। উন্নত বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ভাষানীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যা শুধু তাদের ভাষার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই নয় বরং তা শিক্ষাসহ জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত।[৩৭] এমনকি উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলঙ্কা ও ইকুয়েডরে ভাষানীতি রয়েছে। ইকুয়েডর তাদের ভাষানীতির বিষয়ে ২০০২ সালে যে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে, সেখানে এই নীতি তৈরির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছে, সে দেশের ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষাসহ শিক্ষার উন্নয়ন এবং স্থানীয় ভাষার উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গঠনে এই নীতি সহায়ক হবে।[৩৮] বাংলাদেশের ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষাসহ শিক্ষার উন্নয়ন এবং স্থানীয় ভাষার উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গঠনে একটি ভাষা নীতি করা প্রয়োজন।

বাংলা ও ইংরেজি নজির সম্বলিত আইন সাময়িকী প্রকাশ

নজির আইনের অন্যতম উৎস। বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত বা নজির সকল অধস্তন আদালতের উপর কর্তৃত্বপূর্ণ ও বাধ্যকর এবং আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত বা নজির হাইকোর্ট বিভাগের উপর কর্তৃত্বপূর্ণ ও বাধ্যকর।[৩৯] কিন্তু আইন সাময়িকীতে উচ্চ আদালতের নজির সৃষ্টিকারী রায়সহ প্রায় সকল রায় ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। অধস্তন আদালতে আইন পেশায় নিয়োজিত অনেকেই বাংলা ভাষায় আইন চর্চা করায় এসব নজির বাংলায় অনুবাদ করা প্রয়োজন।[৪০] যদিও এসব রায় শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ করে

ভারত, নেপালসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের রায়সমূহ নজির হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে গুরুত্বপূর্ণ বাংলা রায়ের ইংরেজি অনুবাদ থাকতে পারে। বাংলা ভাষায় শক্তিশালী আইনগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণপূর্ণ একটি রায় ইংরেজি অনুবাদ করা হলে মৌলিক অবদান রাখা ও নজির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৪১] তবে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আমাদের দেশে যত রায় লেখা হয়েছে, তার কত শতাংশ অন্য দেশে উদ্ধৃত বা দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার হয়েছে সে বিষয়েও একটি পরিসংখ্যান থাকা প্রয়োজন।[৪২]

জনগণের বোধগম্য বিদেশি শব্দসহ বাংলা ব্যবহার

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার আধুনিক ভিত্তি হচ্ছে হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ ভারতের বিচার ব্যবস্থা। এদেশে মুসলমান শাসনামলে ফার্সি ভাষা দীর্ঘদিন রাজভাষা ছিল বলে আইন ও আদালতে বহু ফার্সি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। যেমন: 'আইন' ফার্সি শব্দ। এসব ফার্সি ভাষা ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত ছিল, এখনো আছে। আবার ব্রিটিশ শাসনামলের অনেক ইংরেজি শব্দ প্রায় বাংলা শব্দরূপে আইন-আদালতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশের সংবিধানেও বেশ কিছু ইংরেজি শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন: অ্যাটর্নি জেনারেল, আপিল, এজেন্ট, অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, ট্রাইবুনাল, ল' কমিশন, ডেপুটি স্পীকার ইত্যাদি। এসব শব্দ নিয়েই বাংলাদেশের অধস্তন আদালতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় প্রকার মামলার আরজি, জবাব, শুনানি, রায় ইত্যাদি বাংলা ভাষায় সম্পন্ন হচ্ছে। এ শব্দগুলি বাংলা শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ জনগণের জন্য অবশ্যই বোধগম্য। সে কারণে এই শব্দগুলি পরিবর্তন না করেই উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহার করা যেতে পারে; যার ফলে বাংলা ভাষার ব্যবহার আরো সাবলীল ও গতিশীল হবে।[৪৩] এছাড়া বাংলা ব্যবহারের পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় আইনের ব্যাখ্যা, নীতি ও সিদ্ধান্ত চর্চার মাধ্যমে বাংলায় আইন বিষয়ক উন্নয়ন ও বিচারিক মানদণ্ড সমৃদ্ধ হবে।

আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব

বিচার ব্যবস্থায় বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবীগণ পরস্পরের পরিপূরক। আইনজীবীগণের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব আদালতের প্রতি যাতে আদালতের বিচারক আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সম্মানিত বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবীগণ আইনগত প্রশ্ন মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে বিচারিক সিদ্ধান্ত ও বিচারিক মানদণ্ড উভয়ই রক্ষা করবেন। দেশের সংবিধান ও আইনের বিধান অনুসারে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব।[৪৪] যেহেতু বর্তমানে বাংলা ভাষা ব্যবহারে কোন আইনগত বাধা নেই সেহেতু সম্মানিত বিচারপতিগণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মাতৃভাষা ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে মহামান্য বিচারকগণের আগ্রহ, ঐকান্তিকতা ও সুবিবেচনার প্রয়োগ অনেকখানি সাফল্য এনে দিতে পারে। প্রাথমিকভাবে দীর্ঘ সময়ের রীতি পরিবর্তন করে সকল মামলার রায় বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করা না গেলেও (যেমন– অ্যাডমিরালটি, কোম্পানি এবং মেরিন আদালতে এক পক্ষ যখন বিদেশি থাকে) সাধারণ জনগণের বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচার কার্যক্রম ও রায় বাংলায় প্রদানের অভ্যাস তৈরি হলে বাংলা ভাষার ব্যবহার ধীরে ধীরে উন্নত, পরিশীলিত, শুদ্ধ, ভাবগম্ভীর ও যথোপযুক্ত হবে।[৪৫]

উপসংহার

আদালতের ভাষা হচ্ছে বিচার কার্যক্রমে ব্যবহৃত ভাষা। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় উচ্চ ও অধস্তন সকল আদালত দেশের জনগণের জন্য। অধস্তন বিচারালয়ের বিচারক এবং আইনজীবীগণ সবাই বাংলা ভাষাতেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। রাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সচিবালয়সহ শাসন বিভাগের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রচলিত আছে, আইন বিভাগে জাতীয় সংসদের অধিবেশনসহ সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষাতেই চলছে। অথচ উচ্চ বিচারালয়ে বাংলার প্রয়োগের বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছে এবং সময়ক্ষেপণ হচ্ছে। আইন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রণীত ও অনূদিত গ্রন্থের অপ্রতুলতা থাকতে পারে, কিন্তু তা বাংলাকে আদালতের ভাষা হিসেবে পরিহার করার জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য যুক্তি হতে পারে না। বিচারালয়ের ভাষা বাংলা হলে বিদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ (আইন শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে) ক্ষীণ বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এ সন্দেহও অমূলক। বিচারপ্রার্থী মানুষের মুখের ভাষায় তথা বাংলায় রায় প্রদান করলে শুধু আইনের সাহায্য নয়, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আইনের কাছে যাওয়ার সুযোগও সহজ হবে। রায় বোঝার ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীর পরনির্ভরতা, আর্থিক ক্ষতি, সময় ও অযথা হয়রানি কম হবে। আইনসংশ্লিষ্ট পেশায় জড়িত পেশাজীবী সকলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে বুঝতে হবে যে, সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় এমন ভাষা কখনো দেশে সুবিচার আনতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মাতৃভাষার চর্চা, ব্যবহার ও প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা হবে। তবে উচ্চ আদালতের ইংরেজি ব্যবহারের এই রীতির চর্চা দীর্ঘদিনের, এটি যেমন একদিনে তৈরি হয়নি তেমনি বাংলা ভাষায় আইনি কার্যক্রমের রেওয়াজও ধীরে ধীরে করতে হবে, যাতে সব কিছু স্বাভাবিকভাবে হয়। বাংলা ভাষার প্রয়োগ জনগণের একটি সাংবিধানিক অধিকার এবং এ অধিকার ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং এর বাস্তবায়নের পথে চিহ্নিত বাধাসমূহ অপসারণের জন্য সংঘবদ্ধ কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন যাতে সকল শ্রেণির নাগরিকের আইনগত অধিকার মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ এ বি এম খায়রুল হক, "আমাদের সংবিধান ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত-আখরে লিখিত", *ঢাকা 'ল' রিপোর্টার্স জার্নাল*, খণ্ড ৬১, ঢাকা ২০০৯, পৃ. ৩৩

২ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ৩

৩ কাজী এবাদুল হক, *উচ্চ আদালতে বাংলা চর্চা ও বাংলায় রায়*, এশিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২১

৪ Rules of the High Court of Judicature for East Pakistan 1958, (Amended in 1960 and 1973). Finally The Supreme Court of Bangladesh (High Court Division) Rules 1973 has been amended on 21 November 2012, (বাংলাদেশ গেজেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা, প্রজ্ঞাপন, তারিখ: ৭ কার্তিক ১৪১৯/২২ অক্টোবর ২০১২)। As the rules, chapter I; section 3 stated Bangla reference to rule etc. and chapter IV section 1 stated that application to the High Court Division shall be in Bangla/English.

৫ আরিফ খান, "সুপ্রীম কোর্টে বাংলা ভাষা: আশা ও তামাশা", *বাংলাদেশ আইন সমিতি জার্নাল*, সংখ্যা ১, ২০১৩, পৃ. ১৬৬

৬ গাজী শামছুর রহমান, *বাংলাদেশের আইনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১০

৭ কাজী এবাদুল হক, *উচ্চ আদালতে বাংলা চর্চা ও বাংলায় রায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৮ আনিসুজ্জামান, "বাংলাদেশের ভাষা-পরিস্থিতি", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খণ্ড ২৬, সংখ্যা ১, জুন ২০০৮, পৃ. ১

৯ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ২৭

১০ সা কা ম আনিছুর রহমান খান, "বাংলা ভাষা প্রচলন আইন অনুশীলন, সমস্যা ও সম্ভাবনা", *ঢাকা 'ল' রিপোর্টস জার্নাল*, খণ্ড ৫৫, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ২৮

১১ মোঃ হাসিবুল হক, "উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা: অনিচ্ছাই প্রধান বাধা", *বাংলাদেশ আইন সমিতি জার্নাল* ২০১৩, সংখ্যা ১, পৃ. ২০৬

১২ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, "বাংলায় সংবিধান", *মানববিদ্যা বক্তৃতা*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৩৭

১৩ কাজী এবাদুল হক, "উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহারে বাধা কোথায়?", দৈনিক *প্রথম আলো*, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

১৪ *ঢাকা 'ল' রিপোর্টস*, খণ্ড ৫০, ১৯৯৮, পৃ. ১০৩-১০৯

১৫ *ঢাকা 'ল' রিপোর্টস*, খণ্ড ৬৪, ২০১২, পৃ. ১৬৯

১৬ সা কা ম আনিছুর রহমান খান, "বাংলা ভাষা প্রচলন আইন অনুশীলন, সমস্যা ও সম্ভাবনা", *ঢাকা 'ল' রিপোর্টস জার্নাল*, খণ্ড ৫৫, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ২৯

১৭ এরশাদুল বারী, "বাংলা ভাষা রক্ষা: উচ্চ আদালত হতে পারে আদর্শ", *বাংলাদেশ আইন সমিতি জার্নাল*, ২০১৩, সংখ্যা ১, পৃ. ২১৫

১৮ সাখাওয়াৎ আনসারী, "বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলা ভাষার মর্যাদা", *নিবন্ধমালা*, পঞ্চদশ খণ্ড, ২০০৯, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৩২

১৯ এস এম আব্রাহাম লিংকন, "উচ্চ আদালতে বাংলা আইন ও হাতুড়ে অজুহাত", দৈনিক *কালের কণ্ঠ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ৭

২০ *ঢাকা ল' রিপোর্টস* (আপিল বিভাগ), খণ্ড ২৭, ১৯৭৫, পৃ. ৬১; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, "বাংলায় সংবিধান", *মানববিদ্যা বক্তৃতা*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩৪

২১ *ঢাকা ল' রিপোর্টস* (হাইকোর্ট বিভাগ), খণ্ড ৩০, ১৯৭৮, পৃ. ১৪৪; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, "বাংলায় সংবিধান", *মানববিদ্যা বক্তৃতা*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষনা কেন্দ্র, ১৯৯৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩৫

২২ *বাংলা ভাষা প্রচলন আইন*, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সালের ২ নং আইন)

২৩ হাসমত উল্লাহ (মো.) বনাম আজমিরি বিবি ও অন্যান্য, *ঢাকা 'ল' রিপোর্টস*, খণ্ড ৪৪, ১৯৯২, ঢাকা, পৃ. ৩৩২-৩৩৮

২৪ কামাক্ষা নাথ সেন, "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার", *ঢাকা 'ল' রিপোর্টস জার্নাল*, খণ্ড ৫৩, ২০০১, ঢাকা, পৃ. ১১

২৫ আবু সালেহ রনি, "উচ্চ আদালতসহ সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার উপেক্ষিত", দৈনিক *সমকাল*, ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

২৬ *বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত প্রথম সরকারি আদেশপত্র*, ১৯৭৫ (নং ৩০/১২/৭৫, সাধারণ-৩৭০/১ (৩০০), ২৩ অক্টোবর, ১৯৭৫)।

২৭ *বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত সরকারি আদেশপত্র*, ১৯৭৮ (এ আদেশটি ১৯৭৯ সালের ১২ই জানুয়ারি জারি করা হয়)।

২৮ গাজী শামছুর রহমান, *বাংলাদেশের আইনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২৯ চৌধুরী মুনীর উদ্দিন মাহ্‌ফুজ, "উচ্চ আদালতে শুধুই বাংলা ব্যবহার: আবার কি শহীদ হতে হবে?", *ঢাকা 'ল' রিপোর্টার্স জার্নাল*, খণ্ড ৫৮, ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ১৮

৩০ আশরাফ-উল-আলম, "সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনে বড় বাধা ইংরেজিতে লেখা আইনগুলো", দৈনিক *কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ৮

৩১ মোঃ আবদুল হামিদ, *আইন কোষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪

৩২ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (সংকলিত ও সম্পাদিত), *আইন শব্দকোষ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬

৩৩ আজিজুল পারভেজ, "রাষ্ট্রের ভাষানীতি নেই, আছে নৈরাজ্য", *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১

৩৪ আরিফ খান, "সুপ্রীম কোর্টে বাংলা ভাষা: আশা ও তামাশা", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৭২

৩৫ কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩২৪

৩৬ আশরাফ-উল-আলম, "সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনে বড় বাধা ইংরেজিতে লেখা আইনগুলো", দৈনিক *কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃ. ৮

৩৭ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, "জগৎসভায় একুশে ফেব্রুয়ারি", দৈনিক *প্রথম আলো*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১১

৩৮ সৌরভ সিকদার, "ভাষানীতি ও পরিকল্পনা কেন জরুরি", দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১২

৩৯ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ১১১

৪০ কাজী এবাদুল হক, *নজির আইন সংহিতা*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৪

৪১ Md. Rizwanul Islam, "Do our Courts speak our language?", *The Daily Star,* Dhaka, 8 November 2008, p. 12

৪২ "বাংলাদেশে বাংলা ভাষা পরিস্থিতি", দৈনিক প্রথম আলো গোলটেবিল বৈঠক, দৈনিক *প্রথম আলো*, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৮

৪৩ কামাক্ষা নাথ সেন, "কথকতা: আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার", *ঢাকা 'ল' রিপোর্টস জার্নাল*, খণ্ড ৫১, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ১৬

৪৪ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, "বাংলায় সংবিধান", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৪৫ আব্দুর রহমান, "উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা", দৈনিক *প্রথম আলো*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১২

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, আটত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৭/ডিসেম্বর ২০২০

পূর্ববাংলার অসাম্প্রদায়িক জনচরিত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদঃ ভৌগোলিক প্রভাব

মো. আবদুর রহিম*

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও বাংলার পূর্বাংশকে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় জন্ম নেওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে জুড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল আকস্মিক ঘটনা। কেননা পাকিস্তানিদের সাথে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের জাতীয়তাবাদী বন্ধন তৈরির হওয়ার মত ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি ছিল না। মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের ধারণা প্রথম উঠে আসে ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সম্মেলনে দার্শনিক কবি স্যার ইকবালের সভাপতির ভাষণে। ঐ বক্তব্যে মুসলিমদের জন্য পৃথক আবাসভূমি গঠনের যে প্রস্তাব করা হয়েছিল সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ, সিন্ধু, এবং বেলুচিস্তান-এর সমন্বয়ে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। পূর্ববাংলার কথা সেখানে ছিল না। ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলী প্রমুখদের প্রস্তাবিত 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রেও পূর্ববাংলা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে মুসলিমদের পৃথক আবাসভূমির যে রূপরেখা প্রদান করা হয় সেখানেও পাকিস্তান শব্দটি ছিল না বরং মুসলমানদের জন্য একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনীতে আকস্মিকভাবে পাকিস্তান নামে একটিমাত্র রাষ্ট্রের কথা বলা হয়। এভাবে ঐতিহাসিক ধারাক্রম ও ভৌগোলিক বাস্তবতার বিপরীতে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এখানে দ্রুতই পাকিস্তানের ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটে। পূর্ববাংলায় গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তি এ অঞ্চলের কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। পূর্ববাংলার ভৌগোলিক পরিচয়, অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক ও ভাষিক পরিচয় একই নামসূত্রে আবদ্ধ। সাধারণভাবে কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে সে অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া ও জলবায়ু এবং ভৌগোলিক নৈকট্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমান প্রবন্ধে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রগঠন, জাতীয় চেতনা তথা জাতিসত্তা বিকাশের ক্রমধারায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ গঠনে এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া জলবায়ু এবং ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব নিরীক্ষা করা হয়েছে।

পূর্ববাংলার অধিকাংশ ভূ-ভাগ নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। ঐতিহাসিক তথ্যমতে এটি অপেক্ষাকৃত নবীন ভৌগোলিক অঞ্চল যার গঠন প্রক্রিয়া এখনও চলমান রয়েছে। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোলের গঠন প্রক্রিয়া অনেক ঐতিহাসিক উত্থান-পতন এবং ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। নিকট অতীতে ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তির মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ভূগোলের বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। সর্বশেষ ১৯৭১ সালে

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম এবং স্বশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ভৌগোলিক অঞ্চলটি দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্রমবির্তনের মধ্যদিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ক্রমধারায় সুলতানি আমলে পূর্ববাংলা সর্বপ্রথম একক শাসনাধীনে আসে। এর পূর্বে এটি কোন একক শাসনাধীনে ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চল ছোট ছোট জনপদে বিভক্ত হয়ে সামন্ত শাসকদের শাসনাধীনে ছিল। রেঁনেলের মানচিত্র তৈরির পূর্বে সম্ভবত এদেশের পূর্ণাঙ্গ কোন মানচিত্রও ছিল না। কাজেই আলোচনাধীন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবর্তনের সঠিক ইতিহাস নির্মাণ করাও বেশ কঠিন। বিখ্যাত গ্রিক (ম্যাসিডেনীয়) বীর আলেকজান্ডার (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭-৩২৪) ভারতবর্ষ অভিযানে এসে পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করে পূর্বে যাত্রার রণকৌশল নির্ধারণের সময় জানতে পারেন প্রাসিয়ার (প্রাচ্য) পূর্বে 'গঙ্গারিডি' নামে একটি দেশ আছে। ঐতিহাসিকগণের মতে, গঙ্গার ঋদ্ধি (বৃদ্ধি) প্রাপ্ত অঞ্চলই গঙ্গারিডি হিসেবে পরিচিত।[১] ধারণা করা হয়, এটিই পূর্ববাংলার প্রাচীন সীমা নির্দেশক। এ অঞ্চলে গড়ে ওঠা প্রাচীন জনপদের মধ্যে পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল, বঙ্গ ইত্যাদি অঞ্চল নিয়ে আধুনিক পূর্ববাংলা গঠিত বলে ধারণা করা হয়।[২] ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ[৩] এ অঞ্চলে মুসলমানদের অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ নামের বিভিন্ন অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণের মধ্যে জিয়াউদ্দিন বারানী (মৃত্যুঃ ১৩৫৭ খ্রি.) সর্বপ্রথম 'বাঙ্গালা' শব্দটি ব্যবহার করেন।[৪] শামস্-সিরাজ আফীফ সুলতান শামস্-উদ-দীন ইলিয়াস শাহকে 'শাহ্-ই-বঙ্গালা', 'সুলতান-ই-বাঙ্গালিয়ান' বা 'সুলতান-ই বাঙ্গালা' বলে আখ্যা দেন।[৫] ইলিয়াস শাহ্ তাঁর শাসনামলে সর্বপ্রথম এ অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদ একক শাসনাধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এ অঞ্চলটি সুলতানি আমলে 'বাঙ্গালা', মোগল আমলে 'সুবা বাংলা', ব্রিটিশ আমলে 'বেঙ্গল' অতঃপর 'বাংলা' হিসেবে পরিচিতি পায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় 'বেঙ্গালা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মার্কোপোলো (১৩ শতক), ইবনে বতুতা (১৩৩৩-১৩৪৬), ভার্থেমা (১৫০৩-১৫০৮), ডুয়ার্তো বারবোচা (১৫১৪), জোয়াও দ্য ব্যারোস (১৫৫০), সীজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩-১৫৮১), র‍্যালফ ফিচ্ (১৫৮৬), দুজারিক (১৫৯৯), স্যামুয়েল পর্চাস (১৬২৬), ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ার (১৬২০-১৬৮৮) প্রমুখ পরিব্রাজকদের বর্ণনা এবং ব্লুভের (১৬৫০), সসেন (১৬৫২), ও গ্যাস্টালদি (১৫৬১) প্রমুখ ভূগোলবিদদের মানচিত্র অনুযায়ী 'বেঙ্গালা' বলতে পূর্ববাংলার ভৌগোলিক সীমাকেই নির্দেশ করে।[৬] 'বেঙ্গালা' বা 'বঙ্গ' এ অঞ্চলের দক্ষিণ পূর্ব দিকে সমুদ্র উপকূলের কাছে অবস্থিত ছিল বলে বিদেশি বণিকদের মাধ্যমে এ অঞ্চলটি বাইরের দুনিয়ায় পরিচিতি পায়।[৭] এছাড়া বঙ্গকে এক সময় জাতিবাচক অর্থে বোঝানো হতো যাদের মুখের ভাষা ছিল বাংলা।[৮] বাংলা শব্দটি ভৌগোলিক, ভাষাগত এবং জাতিবাচক এই তিনটি অর্থেই ব্যবহৃত হতে থাকে। চট্টগ্রাম

সমুদ্র বন্দর 'বাঙ্গালার' ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত হওয়ায় এই বন্দরের মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকেই বাঙ্গালা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি পায়।

এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোলের ক্রমবিবর্তন লক্ষ করে একথা বল যায় যে, 'বঙ্গ' শব্দ থেকেই আধুনিক বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে। বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উৎপত্তির পথ পরিক্রমায় এ অঞ্চল যে সকল রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, গুপ্ত, হরসা-শশাঙ্ক, পাল, সেন বংশ, সুলতানি ও মোগল আমল, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল এবং সর্বশেষ পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উৎপত্তি। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বারে বারেই এর রাজনৈতিক ভূগোলের পরিবর্তন হয়েছে। জেমস রেঁনেলের মানচিত্রের মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক ভূগোলের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

মানচিত্রে বাংলা ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল (জেমস রেঁনেল, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ)[৯]

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক ভূগোল দুবার পরিবর্তিত হয়। ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে একদিকে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোলে নতুন মাত্রা যোগ হয় অপরদিকে অধিবাসীদের মনস্তত্ত্বেও নতুন রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বোধের জন্ম লাভ করে। আর ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগ এক অভাবনীয় রাজনৈতিক মানচিত্রের জন্ম দেয়। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের দুটি আলাদা ভৌগোলিক অবস্থান তৈরি হয়। দুটি অংশের মধ্যে ১২০০ মাইলের ব্যবধান তৈরি হয় মাঝখানে অন্য

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অবস্থিতির কারণে। পৃথিবীর মানচিত্রে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর বাইরে এধরনের রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিরল। ১৯০৫ সালের বাংলা ভাগ করার কারণ হিসেবে ব্রিটিশ সরকার যে কথাই বলুন না কেন এটি ছিল বাঙালির ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনার প্রতি প্রথম আঘাত।

নিচের মানচিত্রে ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার ভৌগোলিক বিবর্তনের একটি চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে–

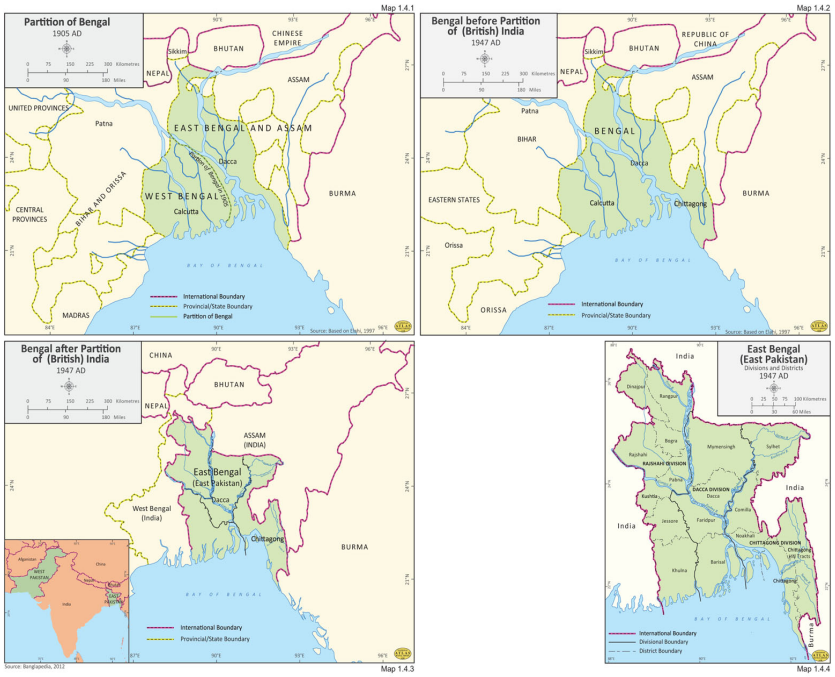

চিত্র: ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ভূগোলের বিবর্তন।[১০]

উপরের মানচিত্রে বৃটিশ-বাংলার প্রশাসনিক ক্রমবিবর্তন দেখানো হয়েছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে পূর্ববাংলার মুসলমানগণ স্বাগত জানিয়েছিল। এর ফলে পূর্ববাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তবে পূর্ববাংলার কিছু হিন্দু নেতৃবৃন্দ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের দিন রাখি বন্ধন, অনশন, গঙ্গাস্নান, নগ্নপদযাত্রাসহ বিভিন্নভাবে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ দৃশ্যত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের নামে করা হলেও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ছিল ভিন্ন। মূলত এর মাধ্যমে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে দুর্বল করা ব্রিটিশদের

অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তথাপি এর সুবিধা পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগের ফলে বাংলার অধিবাসীগণ দুটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্থায়ীভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। রাজনীতির মাঠের বাইরে ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভাজনের কুশীলব ছিলেন বড় বড় অবাঙালি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী। এছাড়া হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস প্রভৃতি সংগঠন ও নেহরু-প্যাটেল প্রমুখদের একগুয়েমি তো ছিলই। তবে জিন্নাহ নিজে স্বাধীন বাংলার প্রশ্নে গণভোট আয়োজনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তার ধারণা ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলমানদের পক্ষে ভোট দেবেন। কিন্তু ভাইসরয় জিন্নাকে এ চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে বলেন।[১১] একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০৫ সালে যে হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৪৭ সালে তারাই বাংলাভাগের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানগত জন বিন্যাস যথা: পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু আধিক্য, পূর্ববাংলায় মুসলিম আধিক্য, ৪৭-পূর্ব একদশকের শাসন ব্যবস্থায় হিন্দুদের কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অংশ গ্রহণ করতে না পারা, ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলকাতার মহা দাঙ্গা, হিন্দু মহাসভা ও নেহেরু-প্যাটেলের ভূমিকা বাংলার অখন্ডতা রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য দায়ী।[১২] তবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবিত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনায় তৎকালীন বাংলার প্রধান প্রধান বাঙালি হিন্দু নেতৃবৃন্দের মনোভাব ইতিবাচক ছিল।[১৩] বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে বাঙালির ভাগ্য নির্ধারিত হয় স্বার্থান্বেষী অবাঙালি ব্যবসায়ী-রাজনীতিকদের মিলিত শক্তির হাতে। এবারের বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বাঙালিত্বের একতাকে বিভক্ত করে ধর্মীয় ভাবধারায় জাতি গঠনের প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে পাকিস্তানের সাথে বাঙালির ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠেনি কখনও। যেটা হয়েছিল তা হলো, পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিভূ হিন্দু জমিদারদের অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তির আশায় পাকিস্তানিদের সাথে সাময়িক ঐক্য গড়ে তুলেছিল পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তিতে।[১৪] তবে তা কোনভাবেই একটি মাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে নয়। তৎকালীন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাঙালি নেতৃবৃন্দের রাষ্ট্রভাবনা ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখার মধ্যে। সে কারণে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মধ্যেই ভাঙনের বীজ রোপিত হয়েছিল, যা এ অঞ্চলের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করে।

পূর্ববাংলার রাজনৈতিক সীমা এবং এর ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

পূর্ববাংলার অধিবাসীদের জনচরিত্র নির্মাণে ভৌগোলিক প্রভাব নিরীক্ষার জন্য এ অঞ্চলের রাজনৈতিক সীমা এবং তার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় ব্রিটিশ ভারতের 'বেঙ্গল' প্রদেশকে ভাগ করে যেসব অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তানের পূর্ববাংলা প্রদেশ গঠন করা হয়েছিল সেসব ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যেই এ আলোচনা সীমাবদ্ধ। ইতোমধ্যে স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে পূর্ববাংলার বিকাশের

সংক্ষিপ্ত অথচ ধারাবাহিক একটি বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। অবিভক্ত বাংলার সর্বমোট আয়তন ছিল ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল। মুসলিম সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে বাংলার ৪৯,২৫৯ বর্গমাইল এবং সিলেট ও আসাম প্রদেশের প্রায় ৪,৮৮২ বর্গমাইল এলাকাসহ নবগঠিত পূর্ববাংলা প্রদেশের সর্বমোট আয়তন হয় ৫৪১৪১ বর্গমাইল।[১৫] তৎকালীন পূর্ববাংলার উত্তরে ভারতের মেঘালয় ও আসাম প্রদেশ, পূর্বদিকে ত্রিপুরা ও বার্মা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ছিল এর আন্তর্জাতিক সীমানা। পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশের কিছু পার্বত্য এলাকা ব্যতীত পূর্ববাংলার বেশির ভাগ এলাকাই সমতল। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মিলিত প্রবাহে যুগ যুগ ধরে পলি সঞ্চয় করে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ পূর্ববাংলার ভূ-ভাগ গঠিত হয়েছে।[১৬] বি এম মরিসন বাংলাকে যে পাঁচটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করেছেন তার অধিকাংশই পূর্ববাংলার অংশ।[১৭] চট্টগ্রাম ও সিলেটের পার্বত্যাঞ্চল মূলত টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি এলাকা যা বার্মা এবং আসামের পাহাড়ি এলাকার বর্ধিতাংশ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহীর উঁচু ভূমি 'বরেন্দ্র অঞ্চল' নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কিছু ছোট-বড় নদী যা এ অঞ্চলের জীবনধারা সচল রেখেছে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র এবং বুড়িগঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ প্লায়োস্টোসিন যুগের উঁচু ভূমি নামে পরিচিত। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ও প্লায়োস্টোসিন যুগের ভূমি। পূর্ববাংলার অবশিষ্ট অংশ সাম্প্রতিক কালের পলিমাটি দ্বারা গঠিত সমভূমি। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং যমুনা অববাহিকা জুড়ে এই সমভূমির অবস্থান। ময়মনসিংহের পূর্বাংশ এবং সিলেট অঞ্চলের বেশির ভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে অনেক হাওড় তথা নিচু এলাকা। উত্তরাংশের বড় নদী থেকে সৃষ্ট খালের জল প্রবাহের দ্বারা চলন বিল সৃষ্টি হয়েছে। চলন বিল বর্তমানে নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলা নিয়ে গঠিত। ফেনী, মাতামুহুরী, সাঙ্গু এবং কর্ণফুলি নদী চট্টগ্রাম, ফেনী ও নোয়াখালী অঞ্চলের জীবনযাত্রার ওপর ব্যাপক প্রভাব রেখে চলেছে। গঙ্গা নদী থেকে সৃষ্ট অসংখ্য ছোট বড় খাল প্লাবিত হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের পলল ভূমি গঠিত হয়েছে। গড়াই, মধুমতী এ অঞ্চলের দুটি প্রধান নদী। নদীর গতি-প্রকৃতির সাথে এ অঞ্চলের গতি-প্রকৃতিও নিয়ত পরিবর্তনশীল। গঙ্গা অববাহিকার দক্ষিণাংশে জোয়ার ভাটার মাধ্যমে সৃষ্ট পলল ভূমিতে পৃথিবীর বৃহত্তম 'ম্যানগ্রোভ' বনভূমি সুন্দরবন অবস্থিত। এ অঞ্চলের জনজীবনে সুন্দরবনের ভূমিকা অপরিসীম।

পূর্ববাংলায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমী জলবায়ু বিরাজমান। এখানে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকাল শুষ্ক ও ঠাণ্ডা থাকে। ছোট আয়তন, সাগরের নৈকট্য, সমতলভূমি, গাছপালার আধিক্য, প্রচুর নদ-নদী এবং হাওড়-বাওড়ের পর্যাপ্ত জল সরবরাহ থাকায় পূর্ববাংলায় স্থানভেদে জলবায়ুর তারতম্য খুব একটা নেই। শীতকাল এখানে আরামদায়ক। গ্রীষ্মকালে এখানে কিছুটা গরম আবহাওয়া বিরাজমান। জুলাই থেকে অক্টোবর মাস বর্ষাকাল। বর্ষাকালে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের ফলে তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। বর্ষাকালে দেশের নিম্নাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যায়। বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি সঞ্চিত হয়, ফলে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রাকৃতিকভাবে এদেশ উচ্চ

ফলনশীল কৃষি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। উর্বর ভূমি এ অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করেছে। এছাড়া প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চল বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছে।[১৮] মোগলদের পতনের যুগে তাদের রাজস্ব আয়ের একটা বড় জোগান যেত বাংলা থেকে। ব্রিটিশ শাসনামলেও পূর্ববাংলা কলকাতার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং শিল্পের কাঁচা মালের প্রধান জোগানদাতা ছিল। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান রপ্তানি পণ্য পাট প্রধানত পূর্ববাংলায় উৎপাদিত হত। সে সময় এটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল।

জনজীবনে আবহাওয়া জলবায়ু ও ভৌগোলিক প্রভাব

একটি অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু এবং ভূ-প্রকৃতি সে অঞ্চলের জনজীবনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। জার্মান দার্শনিক জর্জ ভিলহেলম ফ্রেডরিখ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) জাতীয় চরিত্র গঠনে ভূগোল ও জলবায়ুর উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ুর প্রভাবে একটি জাতির আত্মিক পরিচয় গড়ে ওঠে, যা কালের ব্যবধানে সুনির্দিষ্ট নীতি হিসেবে গৃহীত হয়। তা থেকে জন্ম নেয় বিশেষ চেতনা ও বাস্তবতা। এভাবেই সৃষ্টি হয় জাতির অভ্যন্তরীণ ইতিহাস।[১৯] হেগেলের তত্ত্বের আলোকে পূর্ববাংলার জনচরিত্র ও জাতীয়তাবাদী মানস গঠনে ভৌগোলিক উপাদান ও জলবায়ু কী প্রভাব রেখেছিল তা নিরীক্ষা করা হয়েছে।

ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর আবর্তনে পূর্ববাংলার আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হয়। আবহাওয়া ও জলবায়ুর মতই পূর্ববাংলার মানুষের চরিত্রও বৈচিত্র্যের অধিকারী। এখানে মানুষকে সর্বদা প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা, সাইক্লোনসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্ববাংলার ভৌগোলিক বাস্তবতা। এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে টিকে থাকার কারণে এ অঞ্চলের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সংগ্রামী চেতনার অধিকারী হয়। বাঙালির এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিদ্রোহী ও সংগ্রামী চেতনার যথার্থ চিত্র অঙ্কন করেছেন জিয়াউদ্দিন বারানী। তিনি বলেছেন,

> অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা লক্ষণাবতীকে 'বলগাকপুর' (বিদ্রোহী অঞ্চল) বলিয়া ডাকিতেন। প্রাচীনকাল অর্থাৎ মুয়েজউদ্দিন মুহম্মদের দিল্লী অধিকার করার পর হইতে দিল্লীর বাদশাহগণ যে সকল লোককে লক্ষণাবতীর শাসক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে; যাহারা বিদ্রোহ করে নাই, অন্য লোকেরা তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে ...। ফলে অনেক দিন হইতেই বিদ্রোহ ঘোষণা এই অঞ্চলের লোকজনের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে এবং যে কোন শাসক এই অঞ্চলে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তথাকার বিদ্রোহী জনসাধারণ তাহাকে কেন্দ্রের বিরোধী করিয়া তোলে।[২০]

এই বক্তব্যটি মধ্যযুগের বাংলা সম্পর্কে হলেও বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য পূর্ববাংলা সম্পর্কেও একইভাবে প্রাসঙ্গিক। জিয়াউদ্দিন বারানীর এই বক্তব্য খুবই গুরুত্বসহকারে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর বিবরণে তিনটি বিষয় ফুটে উঠেছে। প্রথমত, বাংলায় নিয়োগ লাভের পরই যে কোন শাসক তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন; দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহ না

করলে অন্যরা তাকে হত্যা করতেন; তৃতীয়ত, স্থানীয় অধিবাসীরা নিযুক্ত শাসককে বিদ্রোহী হতে প্ররোচনা দিতেন। বারানীর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে পূর্ববাংলায় শাসক যেখান থেকেই আসুক সে বিষয়ে অধিবাসীদের কোন সমস্যা নেই, তবে তাকে অন্যের অধীনতামুক্ত থাকতে হবে। তাঁরা শাসকের পরাধীনতাকে নিজেদের পরাধীনতা হিসেবে দেখেছেন। অর্থাৎ শাসককে তারা সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে মনে করতেন। পরবর্তীকালে মোগল অভিজাত আবুল ফজলও বাঙালি চরিত্রের প্রায় একই রকমের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি তাঁর আকবরনামায় লিখেছেন "বঙ্গদেশ এমন একটা জায়গায় অবস্থিত, যেখানে আবহাওয়ার কারণে মানুষের মনে বিদ্রোহের মনোভাব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষ শঠতার শিকার হয়। এই শঠতা পরিবার ও জনপদকে ধ্বংস করে। প্রাচীন গ্রন্থে সে কারণে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে অশান্ত গৃহ হিসেবে (Balghakkana- house of turbulence)।"[২১] আবুল ফজল ও জিয়াউদ্দিন বারানীর বক্তব্য অনুসারে বাংলার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান জনচরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ধারক। আর এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়; কারণ এ দুজন ঐতিহাসিক দুটি পৃথক যুগের প্রতিনিধিত্ব করে; একজন সুলতানী আমলের অন্যজন মোগল আমলের। তাঁদের এ মন্তব্যে বাংলার অধিবাসীদের ওপর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের বিষয়টি ফুটে ওঠে, যা পূর্বে উল্লেখিত জনজীবনের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মানস গঠনে ভৌগোলিক প্রভাব সংক্রান্ত হেগেলের মতকেও সমর্থন করে।

বাংলায় দুইশ বছরব্যাপী স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোগল আমলের শুরুর দিকেও বাংলা প্রায় স্বাধীন ছিল। বাংলার ভাটি অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার বার ভূঁইয়ারাও মোগল সেনাদের বিরুদ্ধে সর্বদা লড়াই করে স্বাধীন জমিদারি পরিচালনার চেষ্টা করেছেন।[২২] সুলতানি ও মোগল আমলের আগেও প্রাচীনকালেও এ অঞ্চলে স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। গ্রীকদের বর্ণনা মতে, গঙ্গাঋদ্ধি হয়তো চার-পাঁচশো বছর স্বাধীন ছিল।[২৩] ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে গুপ্ত শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।[২৪] ধারণা করা যেতে পারে যে, এই স্বাধীনতা বলতে মূলত স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় তা ১৯৭১ সালের পূর্বে এ অঞ্চলে গড়ে ওঠেনি। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা এবং ভৌগোলিক দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার সুযোগে এ অঞ্চলের শাসকরা কখনো কখনো কার্যত স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সেটাকে কোনভাবেই সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলা যাবে না। তবে এ অঞ্চলের মানুষের স্বাধীনচেতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা অনেক ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন।

এ অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাধীনচেতা মনোভাব গঠনে ভৌগোলিক প্রভাবের বিষয়ে আবুল ফজলের ধারণা একেবারেই অযৌক্তিক নয়। পূর্ববাংলার সাংবাৎসরিক আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক কার্যকলাপ একটি ছকে বাঁধা। গ্রীষ্মের শেষে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে কালবৈশাখী ঝড় রুদ্র মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং জনপদ ও সম্পদের ওপর ধ্বংসলীলা চালায়। আবার

জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এক বা একাধিক সাইক্লোনের আবির্ভাব জনপদকে পর্যুদস্ত করে। এভাবে সম্পদ এবং জীবনহানি এখানকার অধিবাসীদের নিয়তি। এছাড়া বন্যা, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগও বাংলার মানুষকে নিয়মিত মোকাবেলা করতে হয়। আবহাওয়ার এই রুদ্ররোষ একদিকে মানুষকে বিদ্রোহী চেতনার অধিকারী করে অপরদিকে প্রকৃতির অপার মহিমায় খাদ্যের সহজলভ্যতা মানুষকে করে অলস ও আরামপ্রিয়। এই অদ্ভুত বৈপরীত্যের মাঝেই এ জনপদ সর্বদাই কর্মমুখর থেকেছে। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানকার মানুষের আর্থ-সমাজিক কার্যক্রমকে মাঝে মাঝে ব্যাহত করতে পারলেও এর অগ্রগতিকে রোধ করতে পারেনি। এখানে হেগেলের তত্ত্ব অনুযায়ী বিদ্যমান পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়ে মানুষ নিজেরাই সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করার শক্তি অর্জন করেছে যা কালের আবর্তে জাতীয় চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই সংগ্রামী চেতনাই ধীরে ধীরে মানুষের মনে জাতীয় স্বাধীনতার চেতনা জন্ম দেয়।

এ অঞ্চলের অধিবাসীরা নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁদের জীবন সচল রেখেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা দেশ বিদেশের মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়ে, যা এ অঞ্চলের রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। কখনও রাজনৈতিক কারণে, কখনও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিরীক্ষা করার জন্য, কখনো আবার নিছক ভ্রমণের নেশায় বহু বিদেশি পর্যটক বাংলা ভ্রমণ করেছেন। এদের বর্ণনায় বাংলার প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ আছে। আফ্রিকান পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা ও সৌন্দর্যের যেমন প্রশংসা করেছেন[২৫], তেমনি মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ফ্রান্সের অধিবাসী ফ্রাসোঁয়া বার্নিয়ার বাংলাকে অদ্ভুত এক সৌন্দর্যমণ্ডিত সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বাংলার ভৌগোলিক সৌন্দর্যের বর্ণনার পাশাপাশি এর ভৌগোলিক গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। বার্নিয়ার বাংলাকে তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধশালী দেশ মিশরের চেয়ে উন্নত বলে মনে করেছেন। বাংলার অসংখ্য নদ-নদী সমুদ্রের সাথে যুক্ত হওয়ায় নৌবাণিজ্যের আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তর্দেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।[২৬] বার্নিয়ারের তথ্যে বাংলার বাণিজ্যিক সুবিধার পাশাপাশি এর কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের গুরুত্বের বিষয়টিও ফুটে উঠেছে; কেননা প্রাচীন কাল থেকে আরব বণিকরা চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যেমন বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, পরবর্তীকালে পর্তুগীজ ও ইংরেজ বণিকরা এ অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিল। পূর্ববাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অন্য একটি দিকও উল্লেখযোগ্য, তা হলো নদ-নদী যেমন বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, ঠিক তেমনি এসবের সুবিধা নিয়ে বাংলা বহিঃশত্রুর প্রভাব মুক্ত থেকেছে। সুলতানি ও মোগল শাসনামলে এ কারণে বাংলার শাসকরা কার্যত স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে পেরেছে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে পূর্ববাংলার ওপর কিছুটা প্রভাব রাখতে পারলেও বর্ষা মৌসুমে তাঁরা দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে বসতেন। বাংলাকে আয়ত্তে আনা মোগলদের জন্যও কঠিন হয়ে পড়েছিল যা আবুল ফজলের মন্তব্যেও

বোঝা যায়। এভাবে যুগ যুগ ধরে ভৌগোলিক সুবিধা নিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ এক ধরনের স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা ভোগ করেছে।

তবে একথা সত্য যে বাংলা অধিকাংশ সময়ই বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর দ্বারাই শাসিত হয়েছে, কিন্তু শাসকশ্রেণির লোকেরা কর আদায় ব্যতীত অধীবাসীদের নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং জীবনধারা ব্যাহত হয় এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এ কারণে শাসকগোষ্ঠীর ব্যাপারে তারা সর্বদা উদাসীন থেকেছে। এ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অধিবাসীদের মনে জন্ম হয়েছে স্বায়ত্তশাসনের আগ্রহ। যার ফলে তারা কখনোই নিজস্ব জীবনাচরণের ক্ষেত্রে বাইরের আরোপিত কোন ধরনের প্রভাব মেনে নেয়নি। পি সি চৌধুরী ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তাঞ্চলের জনজীবনে ভৌগোলিক প্রভাব নির্ণয় করতে গিয়ে লক্ষ করেছেন যে, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এখানকার জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনচেতা মনোভাবাপন্ন করেছে।[২৭] পূর্ববাংলাও একই প্রাকৃতিক অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এ অঞ্চলকে যে প্রাকৃতিক সুরক্ষা দান করেছে তা অধিবাসীদের মনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেতনা জন্ম দেয়।[২৮] এই ধরনের মনোভাব যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলের মানুষের জাতীয় স্বাধীনতার চেতনার উন্মেষ ঘটায়। বাংলার অধিবাসীদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি সকলেই একমত পোষণ করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে, এসব বিবরণের বহু পূর্বে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ (Hiuen Tsang, 629-645) বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসূচক বিবরণ দিয়েছেন।[২৯] পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজক বা রাষ্ট্রদূতগণও বাংলার স্বতন্ত্র ভৌগোলিক গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন।[৩০] তাঁদের সকলের বর্ণনায় বাংলার জনজীবনে ভূ-প্রকৃতির প্রভাবের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে চিত্রিত হয়েছে। আমেরিকার প্রাক্তন সেনাকর্মকর্তা জেমস জে নোভাক বহু বছর বাংলা ভ্রমণ করে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে পূর্ববাংলার (বাংলাদেশ) জনজীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি এখানকার আবহাওয়া ও জলবায়ুর বর্ণনা দিতে গিয়ে ষড়ঋতুর চিত্র এমনভাবে অঙ্কন করেছেন যা থেকে এ অঞ্চলের জনচরিত্র গঠনে ভূ-প্রকৃতির প্রভাবকে দৃশ্যমান করে। তার মতে, পূর্ববাংলার মত মনোরম আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় দেশ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। বাংলার ষড়ঋতুর আবর্তনের সাথে সাথে এর আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হয়। প্রতি ঋতুতে জন্মে ভিন্ন ভিন্ন ফল ও ফসল। তিনি মনে করেন, পূর্ববাংলার রয়েছে একটি সমৃদ্ধশালী এবং স্বাতন্ত্র্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।[৩১] ঋতুর আবর্তনের সাথে সাথে মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডও নিয়ত পরিবর্তিত হয়। আবহাওয়া ও জলবায়ু কিভাবে পূর্ববাংলার মানুষের লোকজ প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে তা নীহাররঞ্জন রায়ের বর্ণনায়ও ফুটে উঠেছে।[৩২] পূর্ববাংলার মানুষের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু আদিবাসী এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠী থাকলেও অধিকাংশ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে, পোশাক পরিচ্ছদ খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রায় সকলের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। ফলে অধিবাসীদের মধ্যে একটি সাধারণ চেতনা গড়ে উঠেছে যা তাদের মধ্যে একটি জাতীয়তাবোধের ধারণা তৈরি করতে সহায়ক।

অপরদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের অধিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই ব্যাপক বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। সেখানকার আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূমিরূপ অত্যন্ত রুক্ষ এবং চরমভাবাপন্ন। মরুময় উষর ভূমি, চরমভাবাপন্ন জলবায়ু, রুক্ষশুষ্ক পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভৃতির প্রভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের আচার-আচরণে অসহিষ্ণুতা ও রুক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই পাকিস্তানের উভয় অংশের গঠনগত পার্থক্য অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠার পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এ ক্ষেত্রে ই.এল. হামজার একটি পর্যবেক্ষণ খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন,

> When a number of different races have been living in different climatic conditions for ages, it is not been possible that there should be much common between them. Bengal its 80 inches of annual rainfall, its hot and humid atmosphere, its rice fields, its impenetrable thick forests, its mighty cities and its amazing dense population of dark lithe, jute and rice cultivators, is a different world from the Punjab with its dry, treeless plains, its extremly cold winters and extremly hot summers, its desert flora and fauna, and its comparatively spares population of tall, big-boned Aryan and cotton growers.[৩৩]

এই বক্তব্যে ভৌগোলিক কারণে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পরিবেশ প্রতিবেশ এবং অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্যে ফুটে উঠেছে। সে কারণে পাকিস্তানের মত একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতে, 'কংগ্রেসীদের মধ্যে দেশভাগের সবচাইতে বড় সমর্থক ছিলেন সর্দার প্যাটেল। তিনি দেশভাগকে ভারতীয় সমস্যার সবচেয়ে সেরা সমাধান বলে মনে করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল পূর্ববাংলা পাকিস্তানের সাথে বেশি দিন থাকতে পারবে না'।[৩৪] মাওলানা আবুল কালাম আজাদ নিজে দেশভাগের পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন,

> Even without partition, there had been riots in Kolkata, Noakhali, Bihar, Bombay and the panjab. Hindus had attacked Muslims and Muslims had attacked Hindus. If the country was divided in such an atmosphere there would be rivers of blood flowing in different parts of the country and the British would be responsible for the earnage.[৩৫]

উল্লেখ্য যে, পণ্ডিত নেহেরুও দেশভাগ বলকান পরিস্থিতি ডেকে আনতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন[৩৬]। ভৌগেলিক বাস্তবতার কারণে ব্রিটিশ বাংলার সর্বশেষ গভর্নর বারোজ (Burrows) বাংলাভাগের বিরোধী ছিলেন। বাংলাকে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার পক্ষেই তাঁর মত ছিল।[৩৭] পূর্ব ও পশ্চিমের পার্থক্য লক্ষ করে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। এ রকম দুটো বৈসাদৃশ্যপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল নিয়ে একটি জাতি রাষ্ট্রের চিন্তাকে অবাস্তব বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। অনেক চিন্তাবিদ পাকিস্তানকে দেশ হিসেবে 'অঙ্গবিকৃত' এবং ভৌগোলিক দিক থেকে 'অসামঞ্জস্যপূর্ণ জাতি' হিসেবে মন্তব্য করেছেন।[৩৮] উভয় অংশের মানুষ মুসলিম শুধু এই বাস্তবতা একটি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। আবহাওয়া এবং জলবায়ু একজন মানুষের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, পেশা, আবেগ, অনুভূতি, রুচি, অনুরাগ, বিরাগ ইত্যাদি মানবিক মূল্যবোধ গঠনে ভূমিকা রাখে। এভাবে গড়ে

ওঠে একটি সমাজের সাধারণ পরিচয়। ইএল হামজা উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রস্তাবিত রাষ্ট্র এবং পূর্ব ভারতে বাংলার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবনপ্রণালি, অধিবাসীদের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য, জনঘনত্ব ইত্যাদির পার্থক্য তুলে ধরে উভয় অংশের মানুষের একত্রে থাকার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেন।[৩৯] ভৌগোলিক ভিন্নতাই পাকিস্তানের উভয় অংশের মানুষের মধ্যে মূল পার্থক্য গড়ে দেয়। আর সে কারণেই ধর্মীয় চেতনাকে পুঁজি করে জাতি রাষ্ট্র গড়ে ওঠার স্বপ্নে বিভোর নেতাদের ঘুম ভাঙার আগেই নতুন রাষ্ট্রের ভাঙনের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর উপাদানই যে জাতিগত পার্থক্যের অন্যতম প্রধান কারণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিখ্যাত সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে যে ভাষ্য প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, "পশ্চিম পাকিস্তানের প্রকৃতি জনগণকে কর্মঠ ও উগ্র করেছে। কষ্টসহিষ্ণু পার্বত্য মানুষ ও উপজাতীয় কৃষকদের সবসময় বন্ধুর পরিবেশে জীবন ধারণের জন্য তৎপর থাকতে হয়। বাঙালি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। ভদ্র ও মর্যাদাসম্পন্ন বাঙালি, তারা সহজ জীবন যাপন ও ব-দ্বীপ এলাকার প্রাচুর্যে বসবাসে অভ্যস্ত।"[৪০] পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-দর্শন, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্যের প্রাথমিক কারণ জলবায়ু ও ভূ-প্রাকৃতিক ভিন্নতার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

প্লাবণ-ভূমির বৈশিষ্ট্য পূর্ববাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূ-প্রকৃতি থেকে আলাদা করেছে শুধু তা-ই নয়, এ অঞ্চলকে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অঞ্চলের মর্যাদা দান করেছে। সে কারণে উভয় অংশের অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের শত প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের উভয় অংশের মানুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ৫০০ টাকা যৌতুক প্রদানের রীতি চালু করা হলেও এক্ষেত্রে খুব একটা সফলতা আসেনি।[৪১] জাতিগত চেতনার প্রতি বাঙালির সহজাত আকর্ষণই এর মূল কারণ। ব্রুনেল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কবির উদ্দিন আহমেদ বলেন,

> Its (Pakistan) geography did not constitute a natural boundary of a 'Nation State'. ... the Bengali speaking people of the Eastern wing were linguistically, culturally and economically a` homogeneous group while the population of West Pakistan were a heterogenous conglamerate of various nationalities.[৪২]

অবশ্য এ ধারার বিপরীত ছিলেন টরেন্টো ইউনিভার্সিটির রাজনৈতিক ভূগোলবিদ অধ্যাপক আলী তাইয়েব। পাকিস্তানের দুই অংশের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য নিয়ে যখন দুই অংশের রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানীরা তুমুল বিতর্কে লিপ্ত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন নানা আলোচনা চলছে এমন সময়ে তিনি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ববাংলার আবির্ভাব হলে তা পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর রাষ্ট্র হবে বলে মত প্রকাশ করেন।[৪৩] পূর্ববাংলার জনঘনত্ব, ভূমি ও জনসংখ্যার অনুপাত, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে তাঁর বক্তব্যের পক্ষে তুলে ধরেন। কিন্তু মজার বিষয় হলো, জনঘনত্ব এবং

পূর্ববাংলার প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বলা হলেও ২৪ বছরের ইতিহাসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কানাকড়িও পূর্ববাংলার উন্নয়নে ব্যয় করা হয়নি, এমনকি পূর্ববাংলার জন্য কখনো বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থাও করা হয়নি। উল্টো পূর্ববাংলার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের একজন প্রবাসী ভূগোলবিদের চিন্তা এরকম একদেশদর্শী হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তিনি যখন গ্রন্থটি রচনা করেন তখনও পূর্ববাংলায় প্রাকৃতিক সম্পদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়নি। তাঁর বক্তব্যের অনেক পরে অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে তিতাস গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়। এ ছাড়াও আলী তাইয়েব পূর্ববাংলার ভূমির উর্বরতা এবং নতুন নতুন চর জেগে ওঠার মাধ্যমে এদেশের আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নেননি। অথচ বাস্তবতা হলো পূর্ববাংলার বুক চিরে সাগরের পথে বয়ে চলা শত শত নদী প্রচুর পরিমাণ পলি জমা করে নতুন ভূমি সৃষ্টি করে চলেছে অব্যাহতভাবে।[৪৪] নবসৃষ্ট এই ভূমির উর্বরতা এটিকে উচ্চ ফলনশীল কৃষি অঞ্চলে পরিণত করেছে। রিচার্ড এম ইটন পূর্ববাংলার ভাটি অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং কৃষির উচ্চ ফলনশীলতা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মত দিয়েছেন।[৪৫] নীহাররঞ্জন রায়ও মনে করেন, বাংলার নদনদী বাংলার ইতিহাস রচনা করেছে। তাঁর মতে,"এইসব নদনদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের ব-দ্বীপের নিম্নভূমি গড়িয়াছে, এখনও সমানে গড়িতেছে।... পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের প্রায় সবটাই ভূতত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্ট"।[৪৬] পৃথিবীর অনেক দেশের জন্য নতুন নতুন ভূ-ভাগ গঠনের বিষয়টি কল্পনাতীত। অতিসম্প্রতি ভূগোলবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম তাঁর একটি গবেষণায় স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সৃষ্টির যৌক্তিকতা ও এই দেশটির অস্তিত্ব টিকে থাকার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বাস্তবতাকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে দেখিয়েছেন।[৪৭] পূর্ববাংলার আপেক্ষিক অবস্থান, দেশটির আকার-আয়তন, ভূ-গাঠনিক ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু ও আবহাওয়াগত দিক, জনসংখ্যা ও এর গুণগত পরিচয়, অর্থনৈতিক সম্পদ, মানবসৃষ্ট, বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে পূর্ববাংলা যে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল তথা ভৌগোলিক বাস্তবতা একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

ভৌগোলিক কারণেই এখানে অধিবাসীদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটেছে। আধুনিক শিল্পের বিকাশের আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগে এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই ছিল কৃষিজীবী। পেশাগত পরিচয়, কৃষিক্ষেত্র, নদীভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, হাটবাজার, গ্রামগঞ্জ, আড়ং, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপাদানের সার্বজনীন উৎসস্থলে একে অপরের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যদিয়ে কালের পরিক্রমায় অধিবাসীদের মন থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা মুছে যায় এবং একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনার জন্ম নেয়। যুগ যুগ ধরে এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোক পাশাপাশি এবং পরস্পরের খুব কাছাকাছি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা খুব একটা জানা যায় না। প্রাক-মুসলিম সমাজের প্রচলিত ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসকে বর্ণনা করতে গিয়ে 'ফোক-ইসলাম', 'পপুলার ইসলাম', 'লৌকিক বা লোকায়ত ইসলাম' 'আদর্শ ইসলাম' ইত্যাদি নতুন শব্দের অবতারণা

করেছেন কোন কোন গবেষক।[৪৮] এই অভিব্যক্তির মাধ্যমে তাঁরা গ্রাম-বাংলার মানুষের সহজ সরল জীবন প্রণালির সাথে ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয়ের বিষয়টিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। বাংলার মানুষের চিন্তা চেতনায় নাথ, বাউল, অতীন্দ্রিয়বাদ এবং সহজিয়া মতবাদের প্রভাব যেমন দেখা যায় তেমনি মধ্যযুগীয় উদারনৈতিক সুফি প্রভাবও মানুষের অসাম্প্রদায়িক ধর্মীয় চেতনা নির্মাণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। গ্রামীণ জীবনে ধর্মীয় চিন্তায়, সামাজিক আচার ব্যবহারে এবং জীবনযাত্রায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে খুব কমই প্রভেদ লক্ষ করা যায়।[৪৯] ধর্ম না জাতিসত্তা কোনটি আগে এ প্রশ্নে পূর্ববাংলার মানুষের মনোভাব তারা প্রথমত জাতিগতভাবে বাঙালি অতঃপর হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম বা খ্রিষ্টান। উনিশ শতকের বাংলায় বাঙালি না মুসলমান সে প্রশ্নে এক বিতর্কের সূত্রপাত হয়। বহিরাগত অভিজাত মুসলমানরা বাঙালিদের মুসলমান মনে করত না। তাদের মতে, বাঙালিরা হিন্দু। বাঙালি সংস্কৃতি ও ইসলাম সাংঘর্ষিক।[৫০] পরবর্তীকালে এধরনের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলার মুসলমানদের আরবি-ফারসি বা উর্দু সংস্কৃতিকীকরণ প্রক্রিয়া সফল হয়নি। বাঙালির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ধর্মভাবনা গুরুত্বপূর্ণ হলেও জাতীয় জীবনে ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার স্থান সবার উপরে। একটি দেশের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে ভৌগোলিক পরিচয়, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ইত্যাদি উপাদান ভূমিকা রাখতে পারে। পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে ভাষা এবং সংস্কৃতিই এর জাতীয়তাবোধের মূল উপাদান। বাঙালি চরিত্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং এখানকার মানুষের ভাষা সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণেই পাকিস্তান কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদের প্রচেষ্টা এখানে ব্যর্থ হয়। সাংস্কৃতিক পরিচয় কীভাবে ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে গভীরতর হয় তার উদাহরণ আরব-পারস্য সম্পর্কের মধ্যে নিহিত। পারসিকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও আরবীয়দের ওপর পারস্য সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আরবীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠা অসম্ভব। ১৯৬১ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদ হোসাইন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ বিষয়ক এক সেমিনারে বলেন,

> After all there must be some explanation of the fact that in spite of the great cementing force of Islam, the world of Islam could no, except in the earliest times, be united into a single state during these so many centuries[৫১]

পূর্ববাংলার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিমাংশের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাকে কেন্দ্র করে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য এবং পাকিস্তানের দুই অংশের আলাদা ভৌগোলিক সত্তাকে অস্বীকার করে একক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন ছিল ঐতিহাসিকভাবে ভুল। আরব-পারস্য বা মুসলিম বিশ্বের কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠেনি তেমনিভাবে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেও এ ধরনের জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ভুল ছিল। পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রে বাঙালিত্বের পরিচয়টাই ছিল মুখ্য। এ প্রসঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একটি উক্তি এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন,

> বাঙালি হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক বাঙালি বাঙালি। বাঙালির একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালির একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙালি সৃষ্টি স্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি, লীলাধারের রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে বাঙালি একটি বিশিষ্টরূপ অনন্তরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙলা সেই রূপের মূর্তি। আমার বাঙলা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইলেন।[৫২]

উপর্যুক্ত বক্তব্যে বাঙালির ঐক্যসূত্রের একটি ইঙ্গিত আছে। বাঙলির ধর্মীয় পরিচয় যাই হোক না কেন, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, সংস্কার, কুসংস্কার, গ্রামীণ বিনোদন ব্যবস্থা, ক্রীড়া-কৌতুক,সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৃষ্টি, জীবনদর্শন, ভাব-ভাবনা প্রভৃতি মৌলিক মানবিক জীবনাচরণ একই সূত্রে গাঁথা। একই নদীর জলে সূচি হয়ে হিন্দু যায় মন্দিরে, মুসলিম যায় মসজিদে, বৌদ্ধ যায় বিহারে। এসব ক্ষেত্রে ভৌগোলিক প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। দেশবন্ধুর বক্তব্য বাঙালির শাশ্বত চরিত্রের মূর্ত রূপায়ণ। বাঙালি তাঁর নিজস্ব সত্তা এবং জাতীয় চেতনা নিয়ে সর্বদা অন্যের প্রভাব মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ১৯০৫ সালের বাংলা ভাগকে একান্নবর্তী পরিবারের ভাগাভাগির মত বিষাদময় ঠেকেছে অনেকের কাছে। সে কারণে ভৌগোলিক অঙ্গহানির পাশাপাশি এটিকে বাঙালিত্বের অঙ্গহানি মনে করেছেন অনেকে। মৌলভী লিয়াকত গজনভী, মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, ইউসুফ আলী খান বাহাদুরসহ অনেক মুসলিম নেতাও বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাধ ঠাকুর বলেছিলেন, আইনের দ্বারা বাংলাকে ভাগ করা গেলেও বিধাতা বাংলাকে ভাগ করতে পারেন না। তিনি বলেছেন, ভাই কখনো ভাগ হতে পারে না। তিনি এর প্রতিবাদে গঙ্গামুখে পদযাত্রা করেছিলেন, যার স্রোতধারায় বাংলা অববাহিকা গড়ে উঠেছিল এবং যার দুগ্ধবৎ স্রোতধারা অধিবাসীদের মাতৃরূপে লালন করে চলেছে। তিনি রচনা করেন 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল গানটি।[৫৩] রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাংলার নদী বাংলার ভূ-প্রকৃতির ছবি চিত্রিত হয়েছে, এর নদী মূলত পূর্ববাংলাকে সৃষ্টি করেছে এবং অধিবাসীদের রসদ যুগিয়েছে, লালন পালন করেছে। একই উৎস হতে প্রাপ্ত খাবার, জল, এবং বায়ু জীবনদায়ী ভূমিকা পালন করেছে এবং বাঙালিকে একে অপরের আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে রেখেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। কবির এই বাণী শুধুই কি কবিত্বের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল? দ্বিতীয়বার বাংলা ভাগ করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত করা হলেও সেটা বেশি দিন টেকেনি, এর প্রাথমিক কারণ ভৌগোলিক। একই কারণে পূর্ববাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হয়েও তা একটি জাতি রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি। পূর্ববাংলার ভৌগোলিক অবস্থানের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ ছিল শুধু আইনগতভাবে, ভৌগোলিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এর দুটি অংশ ততটাই আলাদা ছিল। জাতিতাত্ত্বিক একাত্মবোধ কীভাবে মানুষকে আলোড়িত করতে পারে সেটি অনুধাবনের জন্য ১৮৭৪ সালে বাংলার সিলেট জেলাকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনাটি স্মরণ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে সিলেট বাংলার অংশ ছিল। সিলেটকে আসামের সাথে যুক্ত করায় 'সিলোটি'রা বিপন্ন বোধ করেছিল। কারণ তারা সব সময় নিজেদের বাংলার অংশ বলে মনে করত। ১৯৪৭ সালে সিলেটের গণভোটে

অংশগ্রহণকারী নুরুল ইসলাম বলেন, 'যদিও আমরা আসামে ছিলাম কিন্তু তারপরেও কখনো আমরা নিজেদের আসামি জনগোষ্ঠী বলতে পারতাম না। আসামি জনগোষ্ঠী আমাদের বলত সিলেটিরা হচ্ছে 'বাঙালি'। আর এদিকে বাঙালিরাও আমাদের ডাকত 'আসামি' বলে'। অবশেষে ১৯৪৭ সালের গণভোটে সিলেট পূর্ববাংলার সাথে ফিরে আসার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়ে।[৫৪] সিলেটের এ ঘটনা থেকেও বোঝা যায় জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষিক পরিচয়ই মানুষকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করে। আমেরিকান কূটনীতিক আর্চার কে ব্লাড দুই দফায় ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকায় অবস্থানকালে পূর্ববাংলার জনজীবন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি মনে করেন, পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তান যেমন ভৌগোলিকভাবে আলাদা তেমনি জাতিতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিকভাবেও তারা আলাদা।[৫৫] এই কূটনীতিক আরও মনে করেন, ভৌগোলিক নৈকট্য এবং সাদৃশ্যের কারণে পূর্ববাংলার মানুষ ভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গকে বেশি আপন মনে করে। একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দুই বাংলার মানুষ হাজার বছরব্যাপী অভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক সাথে থেকেছে। কাজেই শুধু ধর্মীয় কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক দুটি অঞ্চলের মধ্যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা গেলেও পূর্ব এবং পশ্চিমের জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে একটি জাতি গঠিত হয়নি। এধরনের ভৌগোলিক কাঠামো বিশিষ্ট রাষ্ট্র পূর্ববাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। একই কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরাও বাঙালিদের কখনো আপন করে নিতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা-সংস্কৃতি অনেকটা মধ্যপ্রাচ্যের অনুরূপ। সে কারণে পশ্চিম পাকিস্তান নিজেকে মধ্যপ্রাচ্যের অংশ মনে করে। অন্যদিকে পাকিস্তানের অংশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববাংলার রয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের প্রতি সহজাত আকর্ষণ।[৫৬] এমনকি দূরত্বের বিচারে ভারত এবং মিয়ানমারের পরে এর নিকট প্রতিবেশি দেশ নেপাল এবং ভূটান। আর পুরো পূর্ববাংলাকে বেষ্টন করে আছে ভারত ও মিয়ানমারের অবস্থান। পূর্ববাংলা দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংযোগ স্থলে অবস্থিত। এর উত্তর-পূর্বাংশ পর্বতশ্রেণি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত এবং দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান। ফলে পশ্চিম দিক থেকে আগত আক্রমণকারী অথবা অভিবাসীদের অগ্রযাত্রা এখানে এসে থেমে যায় অথবা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ কারণে রিচার্ড এম ইটন এটাকে 'ফ্রন্টিয়ার জোন' এবং 'ট্রানজিশান জোন' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৫৭] পূর্ববাংলার এ ধরনের অবস্থান দেশটিকে এশিয়ার বিভিন্ন অংশের প্রবেশ দ্বার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অনেকে এটিকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে কৌশলগত ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৫৮]

পক্ষান্তরে, পূর্ববাংলার সাথে তো বটেই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর মধ্যে নানা ধরনের ভিন্নতা বিদ্যমান ছিল। ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে সকল প্রদেশের মানুষের জীবনধারার দৃশ্যমান ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাষা এবং সংস্কৃতির পার্থক্য তো ছিলই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাও দু'অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। স্থল পথে পূর্ববাংলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব বার'শ মাইল। সমুদ্র পথেও এর দূরত্ব

তিনগুণ বেশি অর্থাৎ তিন হাজার মাইল।[৫৯] আকাশ পথেও তৃতীয় কোন দেশের আকাশসীমা পাড়ি দিতে হত। অর্থাৎ পাকিস্তানের দুই অংশের সাথে সরাসরি যোগাযোগের কোন পথই ছিল না। আঞ্চলিকতার কারণে পূর্ববাংলা উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার হয়। পাকিস্তানের গণ পরিষদে বিভিন্ন সময় বৈষম্যের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালের ২৩ আগস্ট গণ পরিষদ সদস্য আবুল মনসুর আহমদ বৈষম্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রশ্ন রাখেন, 'ভৌগোলিক কারণে যদি কেন্দ্র এ অঞ্চলের প্রতি নজর দিতে না পারে তবে এ অঞ্চলের স্বাধিকার দাবি মেনে নিতে বাধা কিসের'?[৬০] এভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকে ভৌগোলিক বাস্তবতার কারণেই পূর্ববাংলার অধিবাসীদের মনোভাব বদলাতে থাকে।

পূর্ববাংলার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হলো, এর বর্ধনশীল চরিত্র। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনাসহ অসংখ্য নদ নদীর বহমান স্রোতধারায় যুগ যুগ ধরে পলি সঞ্চিত হয়ে এর ভূ-ভাগ গঠিত। অপেক্ষাকৃত নবীন কিন্তু এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ। পূর্ববাংলার আয়তন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমবর্ধমান। এর উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবহমান অসংখ্য নদ নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হওয়ার পথে প্রচুর পলিমাটি জমা করে অব্যাহতভাবে নতুন ভূ-ভাগ গঠন করে চলেছে। পলি জমা হয়ে গঠিত হয় বলে এদেশের ভূ-ভাগ অত্যন্ত উর্বর। বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে এর উর্বরতা প্রতিবছর প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে নবরূপ লাভ করে। ভূমির উর্বরতা, জলের সহজ জোগান এবং ক্রান্তীয় জলবায়ুর প্রভাবে এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিজীবী এবং অলস প্রকৃতির। নদীই এখানকার জনজীবনকে সচল রেখেছে। ভূমির উর্বরতা এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপাদানের সহজলভ্যতার কারণে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী পূর্ববাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছে। এখানকার মাটি, বায়ু, পানি ও পরিবেশ অকাতরে সকলকে ধারণ করেছে, খাদ্য ও বাসস্থান যুগিয়েছে এবং বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নৃগোষ্ঠীর মানুষকে একই সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এই গ্রহণ ও সমন্বয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলায় একটি বহুত্ববাদী সমাজ (Pluralistic society) বিকাশ লাভ করেছে, যে সমাজ সর্বদা মানবিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর দাঁড়িয়ে মানবতার জয় গান গেয়েছে।

পূর্ববাংলার মতো ছয়টি আলাদা ঋতুতে বিভক্ত দেশ পৃথিবীতে আর কোথাও হয়তো নেই। ঋতু বৈচিত্র্যের মতই জনজীবনের উৎসব পালা পার্বণের বৈচিত্র্যময়তা পূর্ববাংলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। এখানে মানুষের মন প্রকৃতির মতই উদার এবং বৈচিত্র্যময়। মানুষের মন বর্ষার কাদামাটির মত কখনো নমনীয়, কখনো চৈত্রের শুষ্ক মাটির মতই দৃঢ়তা লাভ করে। প্রকৃতির প্রভাবে এখানকার মানুষ সহজ, সরল, শান্ত ও বিনয়ী, কিন্তু প্রয়োজনে হয়ে ওঠে চরম প্রতিবাদী। সমতল ভূমির সমতার মনোভাব নিয়ে এখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হয়। পূর্ববাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ভৌগোলিক উপাদান এবং জলবায়ুর গভীর প্রভাব বিদ্যমান। এখানে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, বাউল, কবিগান, গাথা, কবিতা প্রভৃতি মানবতাবাদী সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড

জনজীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। এসকল গান ও কবিতার উপজীব্য হলো এখানকার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপাদান। যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও মনীষীদের জন্ম হয়েছে পূর্ববাংলায়, যাঁদের মানবতাবাদী জীবনদর্শন মানুষকে করেছে উদারনৈতিক চেতনার অধিকারী অপরদিকে তাঁদের লেখনী বাংলা ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধ। এছাড়া নাথ, বাউল, সহজিয়া, সুফি প্রভৃতি মতবাদ ও দর্শন এখানকার মানুষকে করেছে অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। পূর্ববাংলার অধিবাসীদের ভাষা, দেশ, জাতি (বাঙলা, বাঙলাদেশ, বাঙালি) একই শব্দ থেকে উদ্ভূত। বাঙালির রয়েছে গৌরবময় অতীত, উন্নততর কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আবহমান কাল ধরে সকল মত পথ দর্শনের মানুষের অবদানের মাধ্যমে পূর্ববাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সভ্যতা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই উন্নত সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্ম, ও বর্ণের সমন্বয়ে এখানে গড়ে ওঠে বাঙালির সার্বজনীন আত্মপরিচয় যা থেকে কালের ব্যবধানে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটে। এই জাতিসত্তা থেকেই বিকাশ ঘটে বাঙলি জাতীয়তাবাদের।

অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের পার্বত্য, কঙ্করময় উষর ভূমির রুক্ষতার মতই অধিবাসীরা উগ্রপন্থি ও পরমতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাবের অধিকারী। তাদের খাদ্যাভ্যাস, রুচি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আবেগ অনুভূতি সবকিছু বাঙালিদের থেকে আলাদা। উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের পশতু ভাষার অধিকারী অধিবাসীগণ আফগানিস্তানের অধিবাসীদের অনুরূপ। পাঞ্জাবের অধিবাসীরা 'মার্শাল' জাতি বলে নিজেদের পরিচয় দেয় যা তাদের দাম্ভিকতার বহিঃপ্রকাশ। বেলুচিস্তানের অধিবাসীদের ভাষা বেলুচ। দেখা যায়, পূর্ববাংলা ও পাকিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক পার্থক্যের কারণে জনজীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পার্থক্য সৃষ্টি হয়। বলা হয়ে থাকে, একজন পাকিস্তানি যখন যমুনা নদী পাড়ি দিয়ে গঙ্গা অববাহিকা দিয়ে পূর্বদিকে যাত্রা করে তখনই সে বুঝতে পারে সে তার মাতৃভূমি ছেড়ে এসেছে, এবং সে ভিনদেশে একজন আগন্তুক মাত্র। এই বক্তব্যই পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগোলিক কারণে জনমানসের পার্থক্যের মাত্রা নির্দেশক।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ভূগোলের উত্থান হয়েছে যা বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত। ভৌগোলিক প্রভাব এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত কারণে যুগ যুগ ধরে এখানকার অধিবাসীগণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের চেতনা হৃদয়ে লালন করে এসেছে। প্রাচীন বাংলার অন্যান্য জনপদের মত আমাদের আলোচনাধীন অঞ্চলটি বেশিরভাগ সময়ই একধরনের স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেছে। 'গঙ্গাঋদ্ধি' চার পাঁচশো বছরের বেশি স্বাধীন ছিল। মুসলিম শাসনামলের পুরো সময় জুড়ে অঞ্চলটি হয় স্বাধীন না হয় আধা স্বাধীন থেকেছে। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'বঙ্গভঙ্গ-কে কেন্দ্র করে পক্ষে-বিপক্ষে কয়েকটি ধারা বিদ্যমান ছিল। যারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি অংশ ছিল কায়েমী স্বার্থান্বেষী গ্রুপ, অন্যটি ছিল সত্যিকার অর্থে

স্বতন্ত্র বাঙালি জাতিসত্তার ধারক ও বাহক। আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য তা হলো, পূর্ববাংলার অধিবাসীরা পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হলেও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জাতি গঠন তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাঙালি স্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তিতে লাহোর প্রস্তাবের আলোকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করা। সে কারণে বিভিন্ন চক্রান্তের শিকার হয়ে ১৯৪৭-এ পশ্চিম পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হলেও এই রাষ্ট্রের শুরু থেকেই ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চেতনা বিকশিত হতে থাকে। কতকগুলি ভিন্ন ভাষার অধিকারী বিভিন্ন জাতি, এবং আলাদা সংস্কৃতির ধারক নানা জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি ভৌগোলিক অঞ্চল নিয়ে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্তার অধিকারী পূর্ববাংলার অধিবাসীরা মেনে নেয়নি। এ ধরনের রাষ্ট্রের ধারণা ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোতেই কেবল সম্ভব। সুতরাং অনিবার্য বাস্তবতার কারণেই পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর থেকেই বাঙালি জাতিসত্তা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার মাধ্যমে বাঙালির মুক্তির সংগ্রামের সূচনা হয়, ১৯৭১ সালে যা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। কাজেই ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব, তুলনামূলক ভৌগোলিক অবস্থান এবং কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক কারণে পূর্ববাংলায় অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশ তথা সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ অনিবার্য ছিল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৬-১৭

২ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, "বাংলাদেশ, বাঙালি-ইতিবৃত্তের সন্ধানে" *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতামালা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৬, পৃ. ২১৩-২১৪

৩ মিনহাজ-ই-সিরাজ ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লী সালতানাতে প্রধান কাজীর দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ইতিহাসবিদও ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ *তবকাত-ই-নাসিরী* তেইশ খণ্ডে রচিত। এর মধ্যে চার খণ্ডে ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এ সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন নাসিরউদ্দিন মাহমুদ। মিনহাজ-ই-সিরাজ যেখানে শেষ করেন জিয়াউদ্দিন বারানী সেখান থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেন।

৪ জিয়াউদ্দিন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* (অনুবাদ, গোলাম সামদানী কোরায়শী), দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭৬

৫ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪

৬ আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫

৭ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫

৮ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *পূর্বোক্ত, পৃ.* ২১৪

৯ Nazrul Islam, (ed.), *National Atlas of Bangladesh,* Asiatic Society of Bangladesh, 2018, p. 8

১০ *ঐ*, পৃ. ৯

১১ Leonard Mosley, *The Last Days of the British Raj*, Jaico Publishing House, Bombay, 1960, p. 146

১২ Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947*, The University Press Limited, Dhaka, Third inpression, 2015, pp. 319-328

১৩ বিস্তারিত- হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্র ভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, অন্যপ্রকাশ, পৃ. ৩৩-৩৮

১৪ Harun-or Rashid, "The Political Accendancy of the Muslim League, 1937-1947 and India's Partition" in Sabyasachi Bhattachaya (ed.), *A comparative History of Modern Bengal, 1700-1950,* Vol. 3, Kolkata Asiatic Society, 2020, p. 395

১৫ *Census of Pakistan*, 1951, Vol. 3, East Bengal, Report and Table, p. 1

১৬ Iftekhar Iqbal, *The Bengal Delta: Ecology, State and Social Change, 1840-1943*, England, palgrave macmillan, 2011, p. 1

১৭ There are five distinct major geographical regions in`Bengal'- the deltic plain, the Tippera surface and the Sylhet basin, all of which are made up of recent alluvial deposit; and the Madhupur and the Verendra upland composed of ancient Pleistocene alluvium. See, B. M morison, *Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal*, Tucson: University of Arizona Press, 1970, Reprint Rawat publications, Delhi, 1994

১৮ ভৌগোলিক গুরুত্বের বিবেচনায় মোগলরা ১৬১০ সালে ঢাকায় প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করে। কিন্তু তৎকালীন সুবাবাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খান এবং সুবাদহদার আজিমউস্সানের বিরোধকে কেন্দ্র করে ১৭০৭ সালে প্রথমে দিওয়ানী এবং পরবর্তীকালে ১৭১৭ সালে রাজধানী ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে স্থানান্তর করা হয়। মোগল আমলে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলে ঢাকায় পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী স্থাপন এ অঞ্চলের ভৌগোলিক গুরুত্ব নির্দেশ করে।

১৯ Br. Stallo A. M. *General principles of the philosophy of nature*, W.B Crosby, Boston, H.P nichols, Washington, 1848, p. 518

২০ জিয়াউদ্দিন বরানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬

২১ Fazal, A. Allami, (translated by Beveridge), *Akbar Nama*, Vol. III, Delhi, Low price Publication, Reprint 1989, p. 427

২২ আবদুল করিম, "বার-ভুঞা পরিচিতি", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতামালা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৬, পৃ. পৃ. ১৭-৪৭

২৩ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, ১৫৮

২৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, জেনারেল, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৮

২৫ Ibn Batuta (Trnslated by Mahdi Husain), *The Rehla of Ibn Batuta (India, Maldives and Ceylon)*, Orient Institute of Baroda, 1953, pp. 234-245

২৬ Francois Barnier, Translated by Archibald Constable), *Travel in Mogul Empire AD 1656-1668*, Delhi, Low Price Publication, 1934, pp. 437, 442

২৭ P. C Choudhury, *The History of Civilization of the People of Assam,* Department of historical and Antiquarian Studies in Assan, Guahati, 1959, p. 50

২৮ Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2009, p. 58

২৯ ননী গোপাল চৌধুরী, *বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত* (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী খ্রিষ্টীয়-সপ্তদশ শতাব্দী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪, পৃ.৩৭

৩০ বিস্তারিত দেখার জন্য: ওয়াকিল আহমদ, *মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৮; সুখোময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস*, ১২০৪-১৫৭৬, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৫, পৃ. ৬০৮-৬২০

৩১ James J. Novak, *Bangladesh: Reflection on the water*, Dhaka, The University Press Ltd, 2008, p. 22

৩২ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, আষাঢ় ১৪১১, পৃ. ১০৫

৩৩ E.L. Hamza, *Pakistan: A Nation*, Lahore, Kashmiri Bazar, 1944, p. 33

৩৪ Maulana Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom,* Oriental Longmans, Calcutta, 1959, p. 207

৩৫ Leonard Mosley, *The Last Days of the British Raj,* Jaico Publishing House, Bombay, 1960, pp. 142-43

৩৬ Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947,* The University Press Limited, Dhaka, Third inpression, 2015, p. 282

৩৭ বিস্তারিত-Harun-or-Rashid, *পূর্বোক্ত*, P.268-270

৩৮ Marta R. Nicholas, Philip Oldenburg, (ed.). *Bangladesh: the birth of a nation*, Madras, India, M. Seshachalam & co, 1972, p. 10

৩৯ E.L. Hamza, *Op.cit,* p. 32-33

৪০ অ্যান্থনী মাসকারেনহাস, *দ্যা রেপ অব বাংলাদেশ*, (বাংলা অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, ঢাকা, পপুলার পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃ. ১৮

৪১ *ঐ*, পৃ. ১৭

৪২ Kabir U Ahmad, *Breakup of Pakistan: Background and prospects of Bangladesh,* London, The Social Science Publishers, 1972, p. 53

৪৩ ALi Tayyeb, *Pakistan: A Political Geography*, London, Oxford University Press, 1966, পৃ. ১৮৫-১৮৬

৪৪ Haroun Er Rashid, *Geography of Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka, 1991, p. 18; Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and The Bengal Frontier, 1204-1760*, Delhi, Oxford University Press, 1994, p. 194

৪৫ Richard M. Eaton, Ibid, p. 198

৪৬ নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২

৪৭ নজরুল ইসলাম, "ভৌগোলিক বাস্তবতায় বাংলাদেশ", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রয়োত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জুন, ২০১৫, পৃ. ১-১৯

৪৮ Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims,1871-1906, A Quest for Identity*, Delhi, 1981, Details: Chapters III, & IV, pp. 106, 108

৪৯ A. R Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal*, Dhaka, 1977, pp. 3-10

৫০ Rafiuddin Ahmed, *op, cit*., pp. 109-112

৫১ *The Morning News*, November 6, 1961, Dacca, cited in- D. R. Mankekar, *Pak Colonialism in East Bengal*, Somaiya Publications Pvt. Ltd. Bombay, p. 158

৫২ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, "*বাঙালার কথা*", *দেশবন্ধু রচনা সমগ্র ১৯২০*, দেখুন- রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পা.) *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮, পৃ. ১১

৫৩ Nitish Sengupta, *Land of Two Rivers,* New Delhi, Penguin Books, 2011, p. 296

৫৪ আশফাক হোসেন, "১৮৭৪-১৯৪৭ কালপর্বে বাংলা-আসামের সীমান্তে অদলবদল এবং সিলেটের গণভোটের ইতিহাস", *প্রতিচিন্তা*, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৮৪, ৮৯, ৯২, ৯৩, ১১৪

৫৫ Archer K Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat*, Dhaka, The University Press limited, 2002, p. 2

৫৬ অ্যান্থনী মাসকারেনহাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

৫৭ Richard M. Eaton, *Op. cit*, pp. xxii-xxv

৫৮ Maneck B. Pithalla D. Sc., F.G.s. *Op. cit*. p. 24

৫৯ *Ibid*. p. 9

৬০ মোঃ হাবিবুল্লাহ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯): পার্লামেন্টের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪১৯

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, আটত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৭/ডিসেম্বর ২০২০

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় রাজাদের অভ্যন্তরীণ নীতিতে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ, ১৭৮৯-১৮৬০

আনন্দ বিকাশ চাকমা*

সারসংক্ষেপ

১৭৮৯ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় রাজাদের অভ্যন্তরীণ নীতিতে ব্রিটিশ সরকারের 'পলিসি অব নন-ইন্টারফিয়ারেন্স' বা 'হস্তক্ষেপ না-করার নীতি' নিয়ে প্রচলিত ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স বা বয়ানের যথার্থতা যাচাই এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য। ১৮৬৯ সালে ক্যাপ্টেন টমাস হার্বার্ট লুইন তাঁর *দ্য হিল ট্র্যাক্টস অব চিটাগং অ্যান্ড ডুয়েলার্স দেয়ারইন* গ্রন্থে এই বয়ানটি ব্যবহার করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো তাঁর এ বক্তব্যটি যাচাইবাছাই ছাড়া পরবর্তীকালে অনেকেই আপ্তবাক্যের মতো উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ওই সময়ের ঔপনিবেশিক দলিলপত্র নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ঔপনিবেশিক সরকার পার্বত্য রাজাদের অভ্যন্তরীণ নীতিতে হস্তক্ষেপ করেছিল। অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল বলেই তার প্রতিবাদে ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত চাকমা রাজাদের সহিংস প্রতিরোধ সংঘটিত হয়েছিল। ব্রিটিশদের পরাধিকার-প্রবেশ বা আধিপত্য বিস্তারের সীমা শুধু রাজগদিতে বসার স্বীকৃতি দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রাজাদের ভূমি মালিকানা ও রাজস্ব আদায়ের চিরাচরিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বেও তারা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ধীরে ধীরে এ হস্তক্ষেপের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, চাকমা ও বোমাং রাজ পরিবারে রাজপদ লাভ সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক শাসকদের অনুজ্ঞা বা স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আলোচ্য প্রবন্ধে স্থানীয় রাজাদের অভ্যন্তরীণ নীতিতে ঔপনিবেশিক শাসকদের হস্তক্ষেপের কারণ, প্রকৃতি ও প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মূল শব্দ: কার্পাস মহল, জুমবঙ্গ, বোমাং রাজা, চাকমা রাজা, রানি কালিন্দী, কুঞ্জধামাই ও কুকি আক্রমণ, হেনরি রিকেটস।

ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে ১৭৮৯ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত কালটি ঘটনাবহুল। ১৭৭৬ সাল থেকে শুরু হওয়া দীর্ঘ এক দশকের সশস্ত্র চাকমা বিদ্রোহ, সিরাজুল ইসলাম যেটিকে 'ব্রিটিশবিরোধী গেরিলা যুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, সেটার অবসান ঘটে ১৭৮৭ সালে। অতঃপর ১৭৮৯ সালে স্থানীয় রাজাদের জন্য অবমাননাকর ইজারাদারি প্রথা রহিত করে ঔপনিবেশিক সরকার স্থানীয় চাকমা ও বোমাং রাজাদের সাথে সরাসরি কার্পাসমহল তথা জুমবঙ্গ বন্দোবস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একইবছর তুলার পরিবর্তে মুদ্রায় রাজস্ব আদায়ের নিয়মও প্রবর্তিত হয়। ১৭৮৯ থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত সাত দশকব্যাপী নানা ঘটনার পর ১৮৬০ সালে চাকমা রাজা ও বোমাং রাজা শাসিত চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল 'চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস ডিস্ট্রিক্ট' নামে পৃথক জেলা হিসেবে সরাসরি ব্রিটিশাধিকারভুক্ত হয়। ক্যাপ্টেন টমাস হার্বার্ট লুইন পার্বত্য অঞ্চলে ব্রিটিশ নীতি প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন, 'Up to 1829, therefore, we seem to have

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

exercised no direct influence or rule over the hill tribes.'[১] আবার পাহাড়ের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'Until the year 1860, it appears, we did not interfere directly with the internal economy of the hills.'[২] তাঁর প্রথমোক্ত বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় যে ১৮৩০ সাল থেকে ব্রিটিশ শাসকরা পার্বত্য অঞ্চলের রাজাদের অভ্যন্তরীণ নীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করেছিল বা তখন থেকে এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যা ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপকে আহ্বান করেছিল। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্যটি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৬০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। সুতরাং বক্তব্য দুটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু চাকমা ও বোমাং রাজাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি সরকারের প্রশাসনিক নথিপত্র পর্যালোচনা করলে ক্যাপ্টেন লুইনের উক্ত বক্তব্যগুলোর অসারতা স্পষ্ট হয়। উক্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে এটা বলা যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে ১৭৮৯-১৮৬০ পর্যন্ত কালটি ঘটনাবিহীন এবং অকিঞ্চিৎকর ছিল না। বরং ১৭৮৯ সালে তুলার পরিবর্তে টাকায় রাজস্ব নির্ধারণের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের দ্রব্য বিনিময় প্রথানির্ভর জীবনধারণ অর্থনৈতিক জীবনে মুদ্রা অর্থনীতির প্রবেশ ঘটে। চাকমা ও বোমাং রাজপরিবারের স্বকীয় উত্তরাধিকার প্রথা বা রীতিতে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ শুরু হয়। এটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ব্রিটিশরা পার্বত্য অঞ্চল দখলের বহু আগে থেকেই চাকমাদের রাজা এবং রাজপদ ছিল বংশগত। তারা 'ল অব প্রিমোজেনিচার' বা জ্যেষ্ঠতার নিয়মেই রাজগদির পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতেন। কিন্তু ১৮১২ সালে রাজা ধরম বক্স খাঁর চাকমা রাজপদ লাভের সময় থেকেই ব্রিটিশরা অযাচিতভাবে 'স্বীকৃতি' প্রদানের রাজনীতি শুরু করে। অন্যদিকে ১৮১৮ সাল থেকে বোমাং রাজ পরিবারের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা আরোপ করে তাদের ওপর আর্থিক-রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। ফলে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে এসে রাজস্ব উসুল ও পরিশোধের বিষয়াদি নিয়ে বোমাং সাথাং ধ্রুর বংশধরদের মধ্যে গৃহবিবাদ ও উত্তরাধিকার সমস্যার সূত্রপাত হয় ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। একই সময় চাকমা রানি কালিন্দীর প্রভাবশালী দেওয়ানদের মধ্যে প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়। বিবদমান দেওয়ানরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আগ্রাসী কুকিদের ভাড়াটে হিসেবে নিয়োগ করলে পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ নেয়। এ উভয় রাজপরিবার যখন অন্তর্কোন্দলে বিপর্যস্ত তখন মানিকছড়িতে কুঞ্জধামাই নামে আরেকজন মারমা দলপতির উত্থান ঘটে। স্বীয় প্রচেষ্টা ও ব্রিটিশদের আনুকূল্য লাভের মাধ্যমে তাঁর উত্তরাধিকারীরা পরবর্তীকালে মং রাজা নামে 'স্বীকৃতি' হন। আলোচ্য সময়ে ঔপনিবেশিক শাসকদের হস্তক্ষেপের আরেকটি কারণ ছিল উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে তেড়ে আসা উপর্যুপরি কুকি আক্রমণ ও সেই আক্রমণ প্রতিরোধে স্থানীয় রাজাদের অক্ষমতা। একারণে সীমান্ত অঞ্চলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ও আইন শৃঙ্খলার অবনতির ফলে রাজস্ব আহরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

উপর্যুক্ত ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে ১৭৮৯ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত কালটি ঘটনাবহুল এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটাও স্পষ্ট হয় যে, ১৮৬০ সাল বা পরবর্তী সময় থেকে নয়, বরং বহু আগে থেকেই পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ঔপনিবেশিক সরকারের হস্তক্ষেপ ছিল। বর্তমান প্রবন্ধে এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা

পার্বত্য চট্টগ্রামের আঠার ও উনিশ শতকের ইতিহাস সম্পর্কে লিখিত উৎসসমূহের খোঁজ নিয়ে চাকমা বিদ্রোহের ওপর লেখা বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ও পুস্তক পাওয়া যায়।[৩] এর মধ্যে ইতিহাসবিদ রতন লাল চক্রবর্তীর প্রবন্ধে চাকমা বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি নিয়ে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যুক্তিসঙ্গত কারণেই পরবর্তী ইতিহাস তাঁর প্রবন্ধে অনুপস্থিত। অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন তাঁর গ্রন্থে চট্টগ্রামের জমিদার ও সায়ের রাজস্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কার্পাস মহলের জমিদার-রাজা ও তাদের বিদ্রোহ নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এছাড়া তিনি পার্বত্য রাজাদের উৎপত্তি বিশেষত চাকমা রাজাদের নিয়ে আরও দুটো প্রবন্ধ লিখেছেন। দুটো প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রায় একই অর্থাৎ ১৭৭২-১৭৮৭ সালে ব্রিটিশ নথিপত্রে প্রতিফলিত বিদ্রোহের কারণ, ঘটনা, পরিণতি ও রাজস্ব নির্ধারণের প্রক্রিয়া এবং চাকমা জাতির উদ্ভব, মোগলদের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ঘটনাবলি আলোচনার বাইরে থেকে যায়। তবে চাকমা বিদ্রোহ নিয়ে চমৎকার বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন অধ্যাপক সুনীতি ভূষণ কানুনগো। তাঁর মাত্র ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত পুস্তকটিতে চাকমা বিদ্রোহকে 'স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম' হিসেবে আখ্যায়িত করে যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু তিনিও ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত গিয়ে আর অগ্রসর হননি। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ''পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশবিরোধী গেরিলা যুদ্ধ'' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধে রাজাদের নাম, কালানুক্রম ও বিদ্রোহ ঘোষণাকারী রাজার নাম নিয়ে তথ্য ও বানান বিভ্রাট লক্ষণীয়। তবে তিনিও সুনীতি ভূষণ কানুগোর মতো চাকমা রাজা জান বক্স খাঁ ও তার সেনাপতি রনু খানের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সগৌরবে তুলে ধরেছেন। ১৮৬০ সাল এবং তৎপরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে অনেকেই লিখেছেন। আমেনা মহসীন, ভেলাম ভ্যান সেন্দেল, আদিত্য কুমার দেওয়ানসহ এ নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এই গবেষকও ১৮৬০ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত কাল নিয়ে একটি ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেছেন।[৪] কিন্তু উল্লিখিত লেখকদের গবেষণায় বক্ষ্যমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা নেই বললেই চলে। উদাহরণ স্বরূপ আমেনা মহসীন তাঁর *The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts Bangladesh (2002)* শীর্ষক গ্রন্থে ১৭৮৯ সালের আগের সময়কার বিদ্রোহ, নিরাপত্তা ও অর্থনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করে তাঁর আলোচনাকে সরাসরি ১৮৬০ অব্দে নিয়ে গেছেন। মাঝখানের সময়টা অনালোচিত থেকে গেছে। সুতরাং এসময়ের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার এখনো অবকাশ আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস-সম্পর্কিত উৎসসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্তমান প্রবন্ধের নির্ধারিত গবেষণাধীন কাল ও ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে তথ্য উপাদান অপ্রতুল ও ধারাবাহিকতাহীন। তবে সৌভাগ্যক্রমে রাঙামাটিস্থ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে এবং অন্যত্র সংরক্ষিত কিছু মৌলিক উপাদান[৫] পাওয়া গিয়েছে যা আলোচ্য সময়ের চাকমা, বোমাং ও মং রাজাদের ইতিহাস ও তাদের সাথে ঔপনিবেশিক শাসকদের সম্পর্কের ইতিহাস পুনর্গঠনে সহায়ক। অন্যদিকে রাজশাহীস্থ হেরিটেজ আর্কাইভসে সংরক্ষিত মানিকছড়ির (বর্তমানে খাগড়াছড়িতে স্থানান্তরিত) 'মং রাজাদের পারিবারিক ইতিহাস' পুস্তিকা থেকে ওই রাজাদের উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য মিলেছে। আঠার শতকের শেষ দশকের ইতিহাস জানার জন্য ফ্রান্সিস বুকাননের

প্রত্যক্ষ বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব মৌলিক উপকরণের পাশাপাশি ব্রিটিশ প্রশাসকদের লিখিত আকর গ্রন্থাদি, গেজেটিয়ার ও তৎকালীন বেঙ্গল গভর্নমেন্টের প্রকাশিত রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসনিক পত্রসংকলন ও বিভিন্ন পণ্ডিতের লিখিত প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধমালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছে।

চট্টগ্রামে ঔপনিবেশিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা

পলাশির ঘটনা ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতার চালকের আসনে অধিষ্ঠিত করে। সমসাময়িক কোম্পানি কর্মকর্তা হ্যারি ভেরেলস্টের কথায়,''When Meer Jaffier was dying, he declared his son, Nudjum al Dowlah, his successor; but such a declaration could have little effect, until an acknowledgement of him as Subahdar was procured from the English.''[৬] ওই ঘটনার ফলে ১৭৬০ সালে ইংলিশ ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (ফোর্ট উইলিয়াম) গভর্নর হেনরি ভ্যান্সিটার্ট (১৭৩২-১৭৭০) নবাব মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং ঐ বছরের ১৫ অক্টোবর তার মনোনীত নতুন নবাব মীর কাশিম আলী খানের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সেই চুক্তি মারফত কোম্পানি নবাবের কাছ থেকে তিনটি Ceded বা হস্তান্তরিত জেলা– বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম– এর রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। ওই তিন জেলা ছিল বাংলার সমগ্র-ভূমি রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ। চুক্তির পর ১৭৬০ সালে চট্টগ্রাম শাসনের জন্য কোম্পানির তিন সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিলের চিফ বা প্রধান নিযুক্ত হন হ্যারি ভেরেলস্ট (১৭৬০-১৭৬৫)। ১৭৬১ সালে মোগল গভর্নর মোহাম্মদ রেজা খান জানুয়ারিতে চট্টগ্রামের রাজস্ব প্রশাসনের ভার কোম্পানির উক্ত কাউন্সিল প্রধান ভেরেলস্টের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।[৭] এভাবে চট্টগ্রামে ঔপনিবেশিকায়ন পর্বের সূচনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভেরেলস্ট চট্টগ্রাম দখলে নেওয়ার পর তাঁর সরকার পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যও দ্রুত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দখলে নেয়। তিনি ১৭৬১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি লে. জন ম্যাথিউর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন। ইতিপূর্বে নায়েব মোহাম্মদ রেজা খানের বাহিনীকে প্রতিহত করতে সক্ষম হলেও ত্রিপুরার রাজা কৃষ্ণ মাণিক্য এ যাত্রা ত্বরিত বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন ।[৮] এভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ভূখণ্ডেও উড়ানো হয় ব্রিটিশ পতাকা।[৯]

১৭৬৩ সালে মীর জাফর পুনরায় গদিতে বসলে ওই হস্তান্তর চুক্তি নবায়ন হয় এবং ১৭৬৫ সালে সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে বাংলার দিওয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে কোম্পানির চট্টগ্রাম অধিকারও পাকাপোক্ত হয়। হস্তান্তরের সময় চট্টগ্রাম জেলার আয়তন ছিল ২,৯৮৭ বর্গমাইল এবং রাজস্ব সংগ্রহ হতো ৩,২৩,১৩৫ টাকা।[১০] ১৭৬১ সালে কোম্পানি চট্টগ্রাম জেলার যে-অংশটির এখতিয়ার লাভ করে তা ছিল জেলার পশ্চিম অংশ, বন্দর ও তৎসংলগ্ন এলাকা যা সুনির্দিষ্টভাবে নিজামপুর সড়ক– ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড– থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন, 'During the first few years after the cession of Chittagong to the British Government in 1760 the attention of the executive authorities appears to have been mainly directed to the administration of that portion of the ceded territory which now forms the Regulation District.'[১১] আর কোম্পানির নবনিযুক্ত চট্টগ্রাম কাউন্সিল চট্টগ্রাম দখলে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষকে লিখিত পত্রে তাদের অভিব্যক্তি ও অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ পায়।

> Cossim Ally Cawn the Subadar of Bengal our good friend and Ally had granted to us the Lands and Privileges of the Province of Chittagong and we are come to settle here in order to establish trade and prosperity through the Country.[১২]

উক্ত পত্র থেকে পরিষ্কার যে, কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি। মাহবুব উল আলমের ভাষায় 'রাজত্বের নামে বাণিজ্য আর বাণিজ্যের নামে লুট'[১৩] ছিল কোম্পানি শাসনের মূলনীতি। এ প্রেক্ষাপটে কোম্পানির পার্বত্য অঞ্চল নীতির উপযুক্ত ব্যাখ্যান সম্ভব।

চাকমা রাজার অভ্যন্তরীণ স্বশাসনে ঔপনিবেশিক শাসকদের হস্তক্ষেপের সূচনাপর্ব

ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে কোম্পানি শাসকরা চট্টগ্রাম জেলার মোগল আমলের রাজস্ব নথিপত্র যাচাই করে দেখতে পায় যে, ভূমি রাজস্ব এবং *সায়ের* মহল রাজস্ব হল এ জেলার মূল রাজস্ব খাত। সুতরাং কোম্পানি প্রথমে ভূমি রাজস্বের দিকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। তার অর্থ এ নয় যে, রাজস্বের অন্য খাতসমূহকে অবহেলা করেছে। *সায়ের* মহল থেকে রাজস্ব সংগ্রহ বিভিন্ন মহল শিরোনামে রাজস্ব নথিপত্রে অন্তর্ভুক্ত ছিল। চট্টগ্রাম জেলার *সায়ের* (Sair) রাজস্ব বা বিবিধ রাজস্ব ১১টি উৎস থেকে আসত যার মধ্যে মহল শিরোনামে ছিল ৭টি। যথা: ১. পান মহল, ২. তামাক মহল, ৩. গুড়কাটি মহল, ৪. দাওকাটি মহল, ৫. মাই মহল, ৬. কার্পাস মহল, ৭. নিমক মহল।[১৪] কার্পাস মহলটির অবস্থান ছিল জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে। ১৭৬৩ সালে (৬ শ্রাবণ ১১৭০ মঘী সন) কোম্পানির চট্টগ্রাম কাউন্সিলের চিফ হ্যারি ভেরেলস্ট (১৭৬১-৬৪) চাকমা রাজার শাসনাধীন কার্পাস মহলের ভূ-সীমানার স্বীকৃতি দেন। ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু বিচারে এ স্বীকৃতির ঘোষণা ছিল পরবর্তী ইতিহাসের জন্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ:

> Mr. Harry Verelst, Chief of the Chittagong Council of the period, declares that it had been proved to his satisfaction that all the hills from the Fanny to the Sungoo and from Nizampore road (apparently a road following the course of the present Dacca road) to the hills of the Kukee Rajah pertained to the zamindary of Rajah Sher Must Khan in the Kapas Mahal department and directed that he should continue in possession thereof paying the revenues of Government and prohibited the Subordinate Officers from interfering with him, his heirs and successors in this holding.[১৫]

অর্থাৎ এর সাথে সীতাকুণ্ডের পাহাড়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর ৩৫ বছর পরও বুকানন ১৭৯৮ সালে মিরসরাই ও সীতাকুণ্ডে জুমিয়া মগ, ত্রিপুরা ও চাকমা বসতি দেখেছিলেন।[১৬] আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের মতে, 'চাকমা রাজপরিবারের ভাগ্যনির্মাতা,'[১৭] রাজা শের মুস্ত খান রাঙ্গুনিয়ায় রাজধানী স্থাপন করে সেই মুগল আমল থেকে উক্ত জমিদারি এলাকা রাজকীয় ঢঙে শাসন করে আসছিলেন। অন্যদিকে সাংগুর দক্ষিণের কার্পাস মহল ছিল বোমাং রাজাদের শাসনাধীন। ১৮৪৭ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার খ্যাতিমান প্রশাসক হেনরি রিকেটস (১৮৪১-৪৮) প্রণীত রিপোর্টে সমগ্র কার্পাস মহলের অবস্থান স্পষ্ট জানা যায়। প্রতিবেদনের তৃতীয় প্যারায় লিখিত আছে, ''To the East and South-East of the open country there is a tract of hill and forests, about 140 miles from N. to S. and about, on an average, 50 miles (7000 sq. miles) wide, known as the "Kupas," or cotton Mehal."[১৮] এ এলাকাই মূলত মোগল রাজস্ব নথিতে কার্পাস মহল নামে নিবন্ধিত ছিল। চাকমা রাজা তাঁর রাজ্যকে উত্তরকুল অর্থাৎ কর্ণফুলী থেকে ফেনী নদী পর্যন্ত এবং দক্ষিণকুল অর্থাৎ কর্ণফুলীর দক্ষিণ থেকে সাঙ্গু নদী পর্যন্ত বিভক্ত করে

শাসন করতেন। এজন্য ১৯০৬ সালে হাচিনসন পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন, 'There is no doubt that they (The Marma) now occupy the country originally occupied by the Chakmas,'[১৯] কার্পাস মহল বাসিন্দাদের নিকট থেকে চাকমা রাজারা রাজস্ব সংগ্রহ করতেন, তবে সেটা নিছক কর ছিল না, ছিল স্মরণাতীত কাল থেকে গড়ে ওঠা প্রথা, রাজকীয় মর্যাদা ও প্রজাদের আনুগত্যের প্রতীক। উপর্যুক্ত ঘোষণা পাঠে মনে হয় চাকমা রাজাদের এই ঐতিহ্যের প্রতি ভেরেলস্ট সংবেদনশীল ছিলেন। ফলে তাঁর সময় থেকে ৬ষ্ঠ চিফ ওয়াল্টার উইলকিন্স (১৭৭০-৭২) পর্যন্ত চাকমা রাজাদের সাথে কোনো বিবাদ হয়নি। এসময় কলকাতায় কোম্পানি সরকারে রদবদল ঘটে এবং শাসননীতিতে ঘটে পরিবর্তন। ১৭৭২ সালের এপ্রিলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে গভর্নর নিয়োগের রেওয়াজ ভেঙে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসেন[২০] আর এদিকে জুনে চট্টগ্রামের চিফ নিযুক্ত হন চার্লস বেন্টলি। ১৭৭২ সালে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস বাংলা ও বিহারের নায়েব দিউয়ান রেজা খান ও সিতাব রায়কে অপসারণ করে কোম্পানিকে সরাসরি দিউয়ানি শাসন পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেয়। সে নির্দেশক্রমে ১৭৭২ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে *খালসা* বা দেওয়ানি বিভাগ ও কোষাগার কলকাতায় স্থানান্তরিত করে কোম্পানি নিজ হাতে দিউয়ানি শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।[২১] গভর্নর হেস্টিংস দিউয়ানি দায়িত্ব নেওয়ার পর ভূমি প্রশাসনে নিয়ে আসেন নানা পরিবর্তন। গঠিত হয় রাজস্ব বোর্ড। তিনি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে ১৭৭২ সাল থেকে বাংলায় আধুনিক জেলা প্রশাসন চালু করেন এবং প্রত্যেক জেলায় একজন কালেক্টর নিযুক্ত করেন; যদিও সে-ব্যবস্থা চট্টগ্রামে চালু হয় আরও পরে। ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রবর্তন করেন পাঁচসনা বন্দোবস্ত।[২২]

কার্পাস মহল নিয়ে সমস্যার সূত্রপাত হয় ৭ম চিফ চার্লস বেন্টলির চিফশিপের সময়। তিনি চট্টগ্রামে পাঁচসনা বন্দোবস্ত চালু করে সমগ্র চট্টগ্রামকে ৯টি চাকলায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক চাকলায় একজন করে চাকলাদার নিয়োগ করেন। চাকলা রাঙ্গুনিয়া ছিল কার্পাস মহলের সীমান্তবর্তী। তিনি রাজস্ব আদায় সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে পূর্বেকার নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে সমস্ত জমিকে 'সরকারি খাস জমি' করার একচেটিয়া পদক্ষেপ নিতে থাকেন যা খোদ সরকারের মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। রাঙ্গুনিয়ার ব্যাপারটি খুব ভালভাবে বুঝা যায় সুনীতি ভূষণ কানুনগোর নিচের ব্যাখ্যা থেকে:

> At that time Rangunia was a big tract of land much bigger than the present one. The Territory of Rangunia also extended to south across the Karnafulli. The eastern border of the Halda basin at that time was also includen in Rangunia. Thus Rangunia constituted about one third of the total area of the Chakma Kingdom. The territory of Rangunia contains both plainsland and hilly areas. The incorporation of Rangunia into the Regulation district of Chittagong was the immediate cause of the disruption of relation between the Chakmas and the British.[২৩]

মোগল আমলে চাকমা রাজা ট্রিবিউট হিসেবে মোগল সরকারকে দিতেন মাত্র ১১ মণ কার্পাস। সেখানে রনু খাঁ ৫০১ মণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাতেও চার্লস বেন্টলি সাহেবের চাহিদা মেটেনি। তিনি নিয়ম উপেক্ষা করে চট্টগ্রামের উত্তরে চাকমা রাজার এখতিয়ারাধীন রাঙ্গুনিয়ার

সমতল জমির রাজস্ব আদায়ের ভার বহিরাগত ব্যক্তি দুর্গারাম চৌধুরীর নিকট অর্পণ করেন।[২৪] আর বাৎসরিক ১৮০০ (পরে ২০০০-৪০০১ টাকায় বৃদ্ধি) টাকা জমার শর্তে কার্পাস মহলটির ইজারা দেওয়া হয় রামতনু সেনকে। চট্টগ্রামের প্রথম কমিশনার ন্যাথানিয়েল জন হেলহেডের মতে এই ব্যক্তি ছিল, '... is merely an agent, or mooktear, or medium of communication between his constituents and the authorities. He is not the ruler of the clan he represents, and possesses no control over the members of it."[২৫] এছাড়া বেন্টলি চাকলাদারদেরকে লিজভুক্ত জমির অতিরিক্ত সিক্রেট জমির সন্ধান করে যে রাজস্ব আয় হবে তা বেতন হিসেবে ভোগ করার নিয়ম চালু করেন। সুতরাং কার্পাস মহলকে সমতল রাঙ্গুনিয়া চাকলাদারির মধ্যে গুঞ্জাইশ বা অতিরিক্ত জমি হিসেবে ভোগ করার অপচেষ্টা চলে; এজন্য এইচ.জে.এস. কটন বলেছেন, ''The Kupas Mehal was an item of revenue since 1772."[২৬] কালেক্টর বেন্টলির এমন একতরফা কার্যকলাপ প্রসঙ্গে সুনীতি ভূষণ কানুনগোর অভিমত হলো, ''The Procedure by which the Collector of Chittagong assumed the jurisdictional authority over Rangunia and other tracts of land was in utter violation of the principles of justice and fairplay."[২৭] এ প্রসঙ্গে রতন লাল চক্রবর্তী বলছেন, ''Thus hill people had to face bifold exploitation – one in the form of revenue collection, and the other in the form of speculation."[২৮] এর প্রতিক্রিয়ায় কোম্পানিকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দেন 'প্রবল ক্ষমতাধর এবং অমিত সাহসী'[২৯] চাকমা রাজা শের দৌলত খান (১৭৬৫-১৭৮২)। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু হয় কর্তৃত্ব ধরে রাখা এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। কিন্তু বাংলার নবাব ও ত্রিপুরার রাজা যেখানে ব্রিটিশ কূটকৌশল ও সমর শক্তির কাছে ধরাশায়ী সেখানে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার রাজার পক্ষে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে চাকমা রাজাদের স্বীয় ভূ-খণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার চৈতন্যের পাশাপাশি জেলার ভৌগোলিক অবস্থা ছিল প্রলম্বিত বিদ্রোহ ও গেরিলাযুদ্ধ চালানোর পক্ষে যথোপযুক্ত। ফলে চাকমা রাজা শের দৌলত খান আমৃত্যু বিদ্রোহ অব্যাহত রাখেন। তাঁর সুদক্ষ সেনাপতি দেওয়ান রনু খাঁ চাকমা ও বাঙালিদের মধ্যে খুবই প্রিয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব[৩০] ছিলেন। তাঁর রণকৌশলের কাছে ব্রিটিশরা অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। রনু খানের ব্রিটিশ খেদাও যুদ্ধ ব্রিটিশদের মনে গভীর শঙ্কা তৈরি করে। কালেক্টর মি. ফ্রান্সিল ল এক চিঠিতে গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে লিখেন,

> I judged it necessary from the many complaints preferred to & loss & delay of the Company's Revenue to bring this said man to Account, & shew him his Behaviour could no longer be brooked … otherwise he would necessarily impute to a Weakness in the Government, & so make daily encroachment on the Company power and authority; news came to me of Daily Encroachments , & I found the companys Revenues suffering from the mas insolvence, besides his lately beating 2 sepoys who were sent on Government errand, & tearing the Perwannah, on all which accounts, I judged it no longer adviseable to remain a tranquil spectator or hearer of Acts Derugatory to the Company's honour & interest… I was flattered with the hopes of securing his person, & thereby at once putting an end to his evil designs and practices but this scheme proved abortive, the man fled from his usual place of Residence, the Sepoys of 50 in number sent up against him met with resistance, . . . I perceive now 'twill be difficult if not impossible to secure this Runoo Cawn, who has no fixed habitation.[৩১]

আঠার শতকের বাংলায় ঘটে যাওয়া ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পর শের দৌলত খানের বিদ্রোহ ছিল কোম্পানির শাসকদের জন্য একটি বার্তা ও বড় আঘাত। কারণ অবরোধ পাল্টা অবরোধে পার্বত্য অঞ্চলের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। শের দৌলত খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজা জান বক্স খাঁ সংগ্রামের তীব্রতা বাড়িয়ে দেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পুনঃপুনঃ সামরিক অভিযান চালিয়েও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। ১৭৮৪ সালে চট্টগ্রামের কালেক্টর জান বক্স খাঁর দুর্দমনীয় সহিংস কর্মকাণ্ডে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। জান বক্স খাঁকে তাঁর পূর্ব পুরুষের জমিদারি থেকে বরখাস্ত করার পদক্ষেপ নেন। কলকাতা রেভিনিউ কমিটির উদ্দেশ্যে লিখিত এক পত্রে আরউইনের অসহায়ত্ব ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে:

> From first to last, I have done everything in my power to induce him to see me both by letter and by my message but all to no purpose as for seeking him in the hills with our sepoys, I by no means recommend it, many lives would be lost to no purpose it was a failure of such a scheme about three years ago which has encouraged him to be so troublesome since; whereas taking from him the low lands puts it out his power to be so. It ought to be a rule never to admit the Jhum sirdars of the hills to possess lands below … the talooks therefore which he holds by virtue of the Joynagar pottahh must also be taken from him- a very serious evil which arises from this man holding zemindary (sic) land is, the refuge that all the riots of the country obtain within his limits may even in their own talooks dependent to other zemindars, should the talookdar fancy themselves aggrieved or be otherwise disgusted if at any time they seek his protection. In this case the zemindar (sic) are not to allowed to exercise his authority over his landholders and in this manner he has possessed himself of several talooks both joommabundee (revenue roll) and Khiraut.[৩২]

এভাবে জমিদার-রাজা হিসেবে 'বহুকাল যাবত স্বাধীনতা বজায় রাখা'[৩৩] সত্ত্বেও তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশেষত স্বজাতির লোকদের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে ১৭৮৭ সালে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহাচরণ পরিত্যাগ করে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হন। ওই বছরটি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসে বাঁক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল। কারণ, *বোর্ড অব রেভিনিউ প্রোসিডিংস*-এর বরাত দিয়ে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন যে,

> Juan Baksh went to Kolkata in February 1787 and signed an agreement with the government to the effect that the Company's government would recognise him as the bonafide chief of the Hill Tracts where he would rule autonomously. It was also agreed that Juan Baksh would be re-instate in his zamindari of pargana Rangunia and as a zamindar of the Company's State he like all other zamindars would be subject to the normal law of the country.[৩৪]

গভর্নর-জেনারেলের সাথে চুক্তি রাজনৈতিক সাফল্যের পরিচায়ক। এ সাফল্যকে সিরাজুল ইসলাম 'বাংলার ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা'[৩৫] হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার গুণে জান বক্স খাঁ রাঙ্গুনিয়া পরগনার জমিদার হিসেবে স্বীকৃত হন এবং এর মধ্য দিয়ে পার্বত্য জনগণের উপর ভুঁইফোড় চাকলাদার, ইজারাদার ও ওয়াদাদারদের দৌরাত্ম্য চিরতরে দূর হয়।

এ চুক্তির পর কোম্পানি কার্পাস মহল তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি কিছুটা নমনীয় নীতি গ্রহণ করে। কোম্পানি সরকার ১৭৮৯ সালের ১৫ জুন কার্পাসের পরিবর্তে মুদ্রায় রাজস্ব আদায়ের আদেশ জারি করে এবং কার্পাস মহলের রাজস্ব আদায়ে কোনো তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ না দিয়ে সরাসরি চাকমা ও বোমাং রাজার সাথে বন্দোবস্ত করার নির্দেশও জারি করেন। উল্লেখ্য, মোগলদের সাথে সম্পর্কাবনতি ঘটায় চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের বোমাং কং হ্লা প্রু ১৭৫৪ সালের দিকে চট্টগ্রাম ছেড়ে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের রাজনৈতিক কর্তৃত্বে পালাবদল ঘটলে ১৭৭৪ সালের তিনি আবার চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ব্রিটিশদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। আঠারো শতকের শেষপাদ হতে তিনি বান্দরবানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বুকাননের বর্ণনায় এর সাক্ষ্য মেলে যা প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে।

পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে সরাসরি দশসনা বন্দোবস্তঃ সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের নীতি

কার্পাস মহলের রাজস্ব আদায়কে কেন্দ্র করে ব্রিটিশদের সাথে স্থানীয় রাজাদের প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৭৮৯ সালে।[৩৬] ওই বছর চট্টগ্রামের বাণিজ্যকর্তা হ্যারিস কোম্পানি সরকারের সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চল থেকে বহিরাগত ইজারাদার দিয়ে কার্পাস রাজস্ব উসুলকরণকে বিগত দশ বছর ধরে ঘটমান চাকমা বিদ্রোহের মূল কারণ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৩৭] বিদ্রোহের যাতে পুনারাবৃত্তি না ঘটে সেই লক্ষ্যে হ্যারিস অতি সত্বর ইজারাদারি পদ্ধতি বাতিল করে সরাসরি জুমিয়া বা জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্তের সুপারিশ করেন। ১৭৮৯ সালের ২৯ মে তারিখের পত্রে তিনি বাংলা সরকারের নিকট লিখেছিলেন,

> That the monopoly of the hill cotton in the hands of the contractor should be abolished, and ''that settlement ''should be made direct with the jooms (joomeahs), or zemindars, who are fixed both by their habitations and habits, and have claims somewhat hereditary to ''the places or District they live in.[৩৮]

১৭৬১ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণের সময় চট্টগ্রাম থেকে ৩৬ মাইল পূর্ব-উত্তর-পূর্বে রাঙ্গুনিয়ায় ছিল চাকমা রাজার রাজত্ব এবং চট্টগ্রাম থেকে ৩২ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে বান্দরবানে ছিল বোমাং রাজা কংহ্লা প্রুর জমিদারি।[৩৯] উভয় রাজারই স্থায়ী রাজবাড়ি ছিল। হ্যারিস মূলত এ দুজন প্রভাবশালী রাজার সাথে কার্পাস মহল বন্দোবস্ত সম্পাদনের সুপারিশ করেন। তাঁর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৫ জুন ১৭৮৯ তারিখে হঠকারী ইজারাদারি পদ্ধতি বাতিলের নির্দেশ দেয় এবং সেই সাথে কার্পাসে রাজস্ব আদায় না করে নগদ অর্থে আদায়যোগ্য একটি পরিমিত জমা ধার্য করার নির্দেশনা প্রদান করে। ওই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কালেক্টর ১৭৯০ ও ১৭৯১ প্রথম দুই বছরকে দশসনা বন্দোবস্তের শুরুর বছর গণনা করে চাকমা রাজা জান বক্স খানের ওপর পূর্বের ৫০১ মণ তুলার পরিবর্তে ১৮৫২ টাকা এবং বোমাং রাজ কংহ্লা প্রুর ওপর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সাথাং প্রুর নামে ৭৩১ ও ৭০৩ টাকা নির্দিষ্ট জমায় বন্দোবস্ত সম্পাদন করেন।[৪০] রাজা জান বক্স খাঁর সাথে সম্পাদিত এ বন্দোবস্তের অন্য একটি বিশেষ তাৎপর্য হলো, এসময় থেকে বন্দোবস্তের নাম কার্পাস মহল থেকে পরিবর্তিত হয়ে জুমবঙ্গ নামকরণ হয়। পরবর্তী প্রশাসনিক নথিপত্রে কার্পাস মহল অর্থে জুমবঙ্গ নামটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। হাচিনসনও জান বক্স খানের সাথে সম্পাদিত দশসনা বন্দোবস্ত 'জুমবঙ্গ' নামে

খ্যাত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, This settlement is known as Jum Bangu or right to Jum under a chief and was in the name of Jan Baksh.[৪১] দুএকবার ব্যতিক্রম ছাড়া পরবর্তীকালে জুমকর বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে দশবছর মেয়াদি বন্দোবস্তই স্বীকৃত ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এছাড়া এ বন্দোবস্তের মাধ্যমে দুই প্রভাবশালী রাজা ব্রিটিশ শক্তির নৈকট্যে আসায় অন্যান্য ছোট পার্বত্য গোষ্ঠীপতিদের ওপর ধীরে ধীরে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা যেমন চাক, মুরং, মরু (ম্রো), টিপেরা (ত্রিপুরা), বনযুদের (বর্তমানে বম) একটি অংশ কংহ্লা প্রুর বশ্যতা স্বীকার করে। বুকানন পরিষ্কারভাবে লিখেছেন, পো-মাঙের অধীন প্রজার সংখ্যা অসংখ্য; জুমিয়া এবং মুরং তো আছেই, আরো আছে যেমন- তিপরা, তিপ্পেরা, অথবা তেওরা।[৪২] কর্ণফুলীর উত্তরের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর কিছু অংশ চাকমা রাজা টব্বর খাঁর করদ প্রজা বলে বুকানন উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায়, 'এখান (রাঙ্গামাটি) থেকে পাহাড় পর্যন্ত মধ্যবর্তী এলাকায় অনেক কুংখীলোক বসবাস করে; কুংখীরা (কুকিরা) হলো রাজার করদ প্রজা' । ... কুংখীর (কুকিরা) রামপাহাড়ের পূর্বপ্রান্তে চাষাবাদ করে এবং তারা তাউবুকার (টব্বর খাঁর) করদ প্রজা।[৪৩]

এভাবে অন্যান্য ছোটখাট বন্দোবস্তসহ ১৭৯০ ও ১৭৯১ এ দুবছরের জন্য কার্পাস মহলের রাজস্ব নির্ধারিত হয় যথাক্রমে ৫৩৮১ ও ৫৭০৩-১৩ টাকায়।[৪৪] অন্যান্য ছোটখাট বন্দোবস্ত কর্ণফুলী নদীর উত্তর প্রান্তে ছিল বলে হেনরি রিকেটস উল্লেখ করেছেন, তবে এদের মধ্যে সীতাকুণ্ডে বসবাসরত বর্তমান মং রাজার পূর্ব পুরুষ খেদু ছিলেন বলে স্যার রোপার লেথব্রিজের *দ্য গোল্ডেন বুক অব ইন্ডিয়া*[৪৫] ও হামিদুল্লাখ খানের *আহাদিসুল খাওয়ানিন* গ্রন্থ থেকে জানা যায়।

মোগল এবং ১৭৯১ সা.অব্দের ব্রিটিশ রাজস্ব নথিতে জান বক্স খান ও কংহ্লা প্রুকে জমিদার হিসেবে উল্লেখ করা হলেও এর ঠিক দুই বছর পর বাংলায় প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা পার্বত্য জমিদার-রাজাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়নি। যদিও জান বক্স খাঁর সঙ্গে সম্পাদিত বন্দোবস্তে তাঁর জমিদারিও বাংলার সাধারণ আইনের দ্বারা পরিচালিত হবে এমন প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ ছিল। অধিকন্তু বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হওয়ার পূর্বে রাজা জান বক্স খানের দশসনা বন্দোবস্তই ছিল। সুতরাং পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে যে ব্রিটিশদের একটি ভিন্নতর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল এটি তার ইঙ্গিত দেয়। চাকমা রাজারা ১৭১৫ সালে থেকে মুঘল সরকারকে তুলায় ট্রিবিউট দিত বলে প্রামাণ্য লিখিত ইতিহাস থাকলেও ১৭৮৯ সালের আগে বোমাং রাজাদের রাজস্ব প্রদান সম্পর্কিত কোনো লিখিত ইতিহাস কালেক্টরেট নথিতে নেই। যদিও হাচিনসন (১৯০৯) দাবি করেন ১৭৫৬ সালের কংহ্লা প্রুকে মোগলরা আরাকানে বিতাড়িত করেছিল। আরাকানি মগদের নিকট থেকে মোগল সরকার চট্টগ্রাম জয় করেছিল। একসময় যারা আরাকানি নাগরিক আরাকান রাজের শাসনাধীন চট্টগ্রামে বাস করত অথবা বার্মা থেকে এসে অভিবাসিত হয়েছিল তারা মগ নামে পরিচিত হয়। বুকানন জেনেছিলেন যে, চট্টগ্রামের স্থানীয় লোকেরা ক্ষুদ্রজাতি এবং বাংলার পূর্বদিককার অন্যান্য জাতিকে ঢালাওভাবে 'মগ' বলে।[৪৬] যদিও তাদের আসল নাম 'মা-রা-মা'(বর্তমানে মার্মা) বলে কংহ্লা প্রু বুকাননকে বলেছিলেন।[৪৭]

যাহোক মোগল সরকার আরাকানি মগদের দক্ষিণ চট্টগ্রামে ব্যাপকহারে উপস্থিতিকে সন্দেহের চোখে দেখত। ফলে নবাবী আমলে মগদের উপর 'মঘ জমা' নামে এক প্রকার মাথাপিছু কর

আরোপ করা হয়। এ করকে বর্ণনা করা হয় এভাবে : 'a tax on the bodies of every Mugg (Mugh) and foreigner that comes to reside in the Province' এবং জমার পরিমাণ ছিল বাৎসরিক ১,৩৫৮ টাকা।[৪৮] কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের ওপর এরকম কর আরোপের দৃষ্টান্ত না থাকায় মনে হয় সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলায় মগদের বসতি স্থাপনকে নিরুৎসাহিত করার জন্যই মোগলরা এই কর আরোপ করেছিল। উপরন্তু মোগল ফৌজদার মহাসিং (১৭৫৪-৫৯)-এর সময় মোগলরা সন্দেহভাজনদের ওপর কঠোর দমনপীড়ন চালিয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে কং হ্লা প্রুর চট্টগ্রাম ত্যাগ করে আরাকানে আশ্রয়গ্রহণ অস্বাভাবিক নয়। ফ্রান্সিস বুকানন কং হ্লা প্রু সম্বন্ধে এমন তথ্য দিয়েছেন: ''Kaung-la-pru, the greatest Joomea Chief, is said to have been born in Chittagong, but he was certainly educated in Arakan, and passed there the greatest part of his youth."[৪৯]

১৭৬০ সা.অব্দে চট্টগ্রামে মোগল শাসনের অবসান ঘটিয়ে কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানি সরকার মোগলদের নীতি থেকে সরে এসে চট্টগ্রামের বিশাল অনাবাদী জমি চাষাবাদের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বাড়ানোর লক্ষে বহিরাগতদের চট্টগ্রামে অভিবাসনকে উৎসাহ যোগায়।[৫০] এমন অনুকূল পরিস্থিতিতে ১৭৭৪ সা. অব্দে বোমাং কং হ্লা প্রু তাঁর জ্ঞাতিবর্গ নিয়ে পুনরায় দক্ষিণ চট্টগ্রামের রামু, ঈদগাহ ও মাতামুহুরী এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ফ্রান্সিস বুকাননের বৃত্তান্তও এ-তথ্য সমর্থন করে। দক্ষিণ চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনের পর ক্রমে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। বুকানন কং হ্লা প্রুকে 'একজন অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি' এবং তাঁর নামে হাট-বাজার ছিল বলে উল্লেখ করেন। অধ্যাপক আলমগীর সিরাজুদ্দীনের গবেষণায় আরাকানের উত্তাল পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামে মগদের ব্রিটিশ ভূখণ্ডে আশ্রয় লাভের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন:

> In 1775 some two thousands Arakanese deserted their country on account of the opressions of their king (Rephaw Thu) and came to Barapalong within the company's frontier. In accordance with the established policy of encouraging them to settle permanently in Chittagong Collector Bateman granted a joint patta to their leaders for a large quantity of uncultivated lands situated in pargana Ananda pore and Mauzas: Chambal, Poichari, Sonachari, Pulta Kottuck and Manikpore.[৫১]

কং হ্লা প্রু ১৭৯০ সালের মধ্যে সুয়ালোক এলাকায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সাথে ১৭৯০-৯১ সালের কার্পাস মহল বন্দোবস্ত তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী সাথাং প্রুর নামে সম্পাদন করেন। জন্ ম্যাক্‌রে ১৮০১ সালে কংহ্লা প্রুকে ''a Mug chief, commonly known by the name of the *Comlaphore Raja*, who is settled among the hills in the southern parts of this district.''[৫২] বলে বর্ণনা করেছেন। যাহোক অংশত, কোম্পানি অনুসৃত নীতির বদৌলতে এবং অংশত তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলি দিয়ে কংহ্লা প্রু বান্দরবানে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করেন, যেমনটি বলেছেন হেনরি রিকেটস:

> I now proceed with mention of the family and possessions of Kumla Phroo only, which are more immediately concerned in the matter referred to me. The Chieftainship of all the tribes and families between the ''Kurrumfoolee'' or Chittagong river, and the Naaf, is considered to be vested in the family whose residence is ... at ''Bindabun'' in the forest, 32 miles E.S.E from the town of Chittagong.[৫৩]

রাঙ্গুনিয়ার চাকমা রাজা জান বক্স খাঁ ও পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত বান্দরবানের মারমা রাজা কং হ্লা প্রু র প্রথাভিত্তিক রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি প্রায় একই রকম ছিল। সকল পাহাড়ি জুমিয়াদের উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদিত ফসল একই হওয়াতে তারা রাজস্ব হিসেবে তুলা গ্রহণ করতেন। ১৭৯০ ও ১৭৯১ সালে পার্বত্য রাজাদের সাথে যে-বন্দোবস্ত নির্দিষ্ট হয় তা চিরস্থায়ী ভিত্তিতে করা হয়নি। জুমিয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি সাপেক্ষে এ রাজস্ব বৃদ্ধি করা হবে বলে প্রচ্ছন্ন সরকারি ইঙ্গিত ছিল। কোম্পানি সরকার চট্টগ্রামের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে লিখেছিল:

> We authorise you to continue the jumma of 1198 now approved as the decennial jumma to be paid by the Joomeahs who have entered into engagements, but we desire you will occasionally notify to us any increase which may arise in the total jumma of the Mehal in consequence of the extension of cultivation by an accession of Joomeas.[৫৪]

এভাবে কার্পাস মহল ব্রিটিশদের করদরাজ্যে পরিণত হয়। দশসনা বন্দোবস্ত একটি দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত হয়। পরে রাজারা কায়েমি বা স্থায়ী মালিকানা বন্দোবস্ত দাবি করলেও সরকার তা অগ্রাহ্য করে। ফলে পার্বত্য রাজারা ঔপনিবেশিক সরকারের চুক্তিবদ্ধ রাজস্ব সংগ্রাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁদের সম্মান ও শক্তি উপভোগের ক্ষেত্রটা ক্রমে সংকুচিত হয়ে পড়ে। চাকমা ও বোমাং রাজারা ছিলেন শিকড় থেকে জন্ম নেওয়া সমাজপতি। তাঁরা ক্ষমতা চর্চা করতেন নিজস্ব পরিবেশ পরিস্থিতি ও চাহিদার নিরিখে গড়ে ওঠা সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন-সংস্থাপনের মাধ্যমে। গ্রামীণ সমাজের ভিত্তি হচ্ছে ভূমি। ভূমি থেকে উত্তোলিত রাজস্বই রাজাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, সামাজিক প্রতিপত্তি এবং বাহ্যিক কর্তৃত্বের প্রতীক। আর সে-রাজস্ব সংগ্রহ করা হতো শস্যে, নগদ অর্থে নয়। নগদ অর্থের চলও ছিল না। রাজ সরকারের কার্যাবলি, ভূমি বণ্টন ও রাজস্ব সংগ্রহের কাজটা তাঁরা অধীন দেওয়ান/রোয়াজাদের মাধ্যমে করিয়ে নিতেন। চট্টগ্রামের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার লর্ড এইচ ইউলিক ব্রাউনের মতে, এঁরা ছিলেন গ্রামবাসীদের "immediate superior and mouthpiece" বা "প্রথম প্রভু ও মুখপাত্র"।[৫৫] ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাক্কালে গ্রামের জুমভূমি ওইসব গুটিকয়েক প্রভাবশালী দেওয়ান/ রোয়াসা বা রোয়াজারাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। জে পি মিলসের মতে, চাকমা রাজা ও মারমা বোমাংদের গোত্রপতিত্ব (চিফটেইনশিপ) ও রাজস্ব আহরণ পদ্ধতির উৎপত্তি ইন্দোনেশিয়ান গোত্রপ্রথার অনুকরণে।[৫৬] কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সাথে পাহাড়ের অধিবাসীদের কোনো সম্পর্ক বা সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের কথা অন্য কোনো সূত্র থেকে পাওয়া যায় না। বরং মোগল এবং আরাকানি ব্যবস্থার সাথেই চাকমা ও বোমাং রাজাদের প্রশাসনের মিল বেশি। চাকমা রাজারা রাজস্ব আদায় করতেন দেওয়ান পদবিধারী জায়গিরদারদের মাধ্যমে যেখানে বোমাং রাজারা খাজনা আদায় করতেন রো-য়া-সা বা রোয়াজাদের দ্বারা। এছাড়া ত্রিপুরা ও মুরং সমাজ ব্যবস্থায়ও রোয়াজা পদ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[৫৭]

বুকানন বোমাং রাজা কং হ্লা প্রু এবং তাঁর রাজস্ব প্রশাসনে রোয়াসাদের ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দেন। কং হ্লা প্রু দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করে, লুসিয়েন বের্নোর পর্যবেক্ষণমতে, বোমাংদের 'প্রবাদপ্রতীম রাজপুরুষে'[৫৮] পরিণত হন। কর্ণফুলীর দক্ষিণের প্রায় সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করত এবং কর দিত। কং হ্লা প্রু বেশ শৌর্য বীর্য নিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতেন এবং তাঁর অধীনে ছিল নানা জাতিগোষ্ঠীর *রোয়াসা*। বুকানন লিখেছেন:

> A man of the tribe by the Bengalese called Joomea was brought to me. He says, that many little Villages of his Nation, each under the command of a Rua-sa Subject to Kaung-la-pru are scattered among the Hills east from this, on the banks of the Mamooree, and of its various branches. He says that his nation are Ma-ra-ma-gre, or Great Burmas, which is the name given by the inhabitants of Ava to the people of Arakan. ... The vallies of the Seita Hills, watered by the branches of this River, are inhabited by Joomea, and Moroong, dwelling in villages of from 10 to 40 houses, and each governed by a Rua-sa of its own tribe, appointed by Kaung-la-pru. ... All these Joomea and Moroong pay tribute to the Pow-mang; and some of them, who occupy lands belonging to the Zemeendars, pay to them a rent like other ryots. ... The subjects of the Pow-mang are said to be numerous, besides the Joomea (Mugh) and the Moroong, consisting of the tribes named Tiperah, Tipperah or Teura.[৫৯]

রোয়াজা পদটি আর্থিকভাবে লাভের চেয়ে অধিক সম্মানজনক ছিল বলে ক্যাপ্টেন লুইনের অভিমত।[৬০] ক্যাপ্টেন লুইন তাঁর গ্রন্থে বোমাং রাজপ্রশাসনে রোয়াজাদের ভূমিকা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশ করেন। তিনি বর্ণনা করেন:

> They (The Marmas) all dwell in village communities having a Roaja, or village head, through whom they pay revenue. … The position of Roaja, or village head, is more an honourable than a profitable one: he is chosen by the villagers, and appointed by the chief, to whom he must present a ''nuzzer'' on his nomination being ratified. The office, generally speaking, descends from father to son. The Roaja decides all petty cases and disputes that may occur in the village, and for so doing he receives certain fees from both parties, according to custom and the importance of the case. In some instances he recieves from the chief a percentage on the yearly revenue collections.[৬১]

বোমাংদের দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্রামীণ স্তরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল, এই পদাধিকারীকে 'ফেইংসি' নামে অভিহিত করা হত। এভাবে চাকমা রাজপ্রশাসনে ছিল খীসা ও কার্বারী পদ। গ্রামে রোয়াজার অনুপস্থিতিতে ফেইংসি বিবাদ মীমাংসার টাকা দুই পক্ষের কাছ থেকে আদায় করতেন।[৬২]

চাকমা রাজপরিবারের উত্তরাধিকার সংকট ও ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো চাকমা রাজপরিবারে উত্তরাধিকার সমস্যার উদ্ভব ও ঔপনিবেশিক সরকারের হস্তক্ষেপ। ঔপনিবেশিক শাসকদের দেশীয় রাজাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নতুন ঘটনা নয়। পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যেও তারা একই কাজ করেছে। সেখানে কৃষ্ণ মাণিক্যের পর রাজপদ নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং ঔপনিবেশিক শাসকরা হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়।[৬৩] পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজাদের ক্ষেত্রেও তেমন চিত্রই প্রতিভাত হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে জান বক্স খাঁর সাথে গভর্নর-জেনারেলের একটি চুক্তি হয়েছে। এতে যুদ্ধ বন্ধ হয়। অতঃপর চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য এলাকায় শান্তিপ্রতিষ্ঠা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করার কাজে নিয়োজিত হন। ১৭৯০-৯১ সালে কোম্পানি সরকারের সাথে তাঁর দশসনা জুমবঙ্গ বন্দোবস্ত সম্পাদনের ঘটনাকে এ পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। কিন্তু খুব সম্ভবত, দীর্ঘদিন যুদ্ধ পরিচালনা করায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং পুত্র টব্বর খাঁ তার স্থলাভিষিক্ত হন ১৭৯৫ সালে। ১৭৯৮ সালে ফ্রান্সিস বুকানন পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন। বুকানন পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কিত তথ্য

সংগ্রহের সময় টব্বর খাঁকে চাকমা রাজা হিসেবে জানতে পারেন এবং তাঁর সমসাময়িক ইংরেজ প্রধান/কালেক্টর পূর্বসুরীর দ্বারা টব্বর খাঁ আক্রান্ত হন বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু বুকানন টব্বর খাঁ সম্পর্কে আরও যেসব তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইংরেজ সরকার জান বক্স খাঁর সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত বরখেলাপ করেছে। যেমন চুক্তিতে রাজা জান বক্স খাঁকে পরগনা রাঙ্গুনিয়ার জমিদার হিসেবে তাঁর বে-হাত ভূ-সম্পত্তি ফেরত প্রদানের শর্ত ছিল। কিন্তু কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সেটা বাস্তবায়ন করেনি বলে বুকানন পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন:

> The greater part however of that fertile district was seized on by the native officers about the courts of law, during the dispute, which about 14 years ago took place between the Resident at Chittagong and the father of Taubboka: and although Government found their agent to have been in the wrong, yet regular grants of the lands seized having been given to the Bengalese, the Chakma has never been able to obtain the restitution of his property.[৬৪]

ঔপনিবেশিক সরকার বাঙালিদের দখলে থাকা জমি চাকমা রাজাকে প্রত্যর্পণের কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বরং চট্টগ্রামের ইংরেজ কালেক্টর কর্নেলিয়াস ফ্রায়ার (১ মে ১৭৯৩ - ৮ অক্টোবর ১৭৯৫) টব্বর খাঁর উপর আক্রমণ করে ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করেন। বুকানন এর বিবরণ দিয়েছেন, 'He has not yet recovered from the fear, occasioned by the attack made on him by the former Chief at Chittagong, and wishing to live retired from the eyes of government, is willing to submit to temporary depredations.'[৬৫] এমন অনুমান করা অযৌক্তিক হয় না যে, টব্বর খাঁ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে রাঙ্গুনিয়ার পিতৃপুরুষের ভূ-সম্পত্তি দখলে পেতে চেয়েছিলেন বা দখলদারের বিরুদ্ধে বিহীত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এবং বেদখলদারদের প্ররোচনায় ইংরেজ কালেক্টর টব্বর খাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে অকস্মাৎ হামলা চালান। এতে নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে টব্বর খাঁ পিতৃপুরুষের রাজধানী ও বাসস্থান ছেড়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে রাঙামাটিতে দ্বিতীয় রাজবাড়ি নির্মাণ করেন। অধিকাংশ সময় তিনি ওখানেই বাস করেন; যে কারণে ওই রাজবাড়িকেই বুকানন টব্বর খার "The principal residence of Taubboka, which by the Bengalese is commonly called Rajar bary.[৬৬]" বলে উল্লেখ করেছেন।

রাজা জান বক্স খাঁর সাথে সম্পাদিত বন্দোবস্তে ধার্যকৃত জমার পরিমাণ ১৭৫৫ টাকা তাঁর দুই উত্তরাধিকারী টব্বর খাঁ ও জব্বর খাঁর সময়ে অর্থাৎ ১৮১২ সাল পর্যন্ত বহাল থাকে। সে-বছর বাধা বিপত্তির মধ্যে ধরম বক্স খাঁ চাকমা জাতির রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন। ইংরেজ সরকার তাঁকে ''Dhurum Bux is fully recognized as head of the Chakmas and the proprietor of the Zemindary below the hills.'' বলে স্বীকৃতি দেন।[৬৭] এসময় থেকে ঔপনিবেশিক সরকারের নিকট থেকে রাজা হিসেবে 'স্বীকৃতি প্রাপ্তি'র বিষয়টি চাকমা পরিবারের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধরম বক্স খাঁ স্বেচ্ছায় (সম্ভবত কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) জুমবঙ্গ ও জুম নোয়াবাদ বন্দোবস্তের বিপরীতে পূর্বের ১৭৫৫ টাকার অতিরিক্ত আরও ৭০০ টাকা বর্ধিতহারে খাজনা পরিশোধের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব বোর্ড ১৮১৪ সালের ১৯ এপ্রিল পরবর্তী দশ বছরের জন্য ২৭০৫ টাকায় জমা বন্দোবস্ত নবায়ন করে। কিন্তু ধরম বক্সের এ পদক্ষেপ শুভ হয়নি। একই বছর কালেক্টর মি. হান্টার বোর্ডকে জানায়, ''all these hills are the property of Government who have an undoubted right to appoint whom they choose

to collect the tax.[৬৮] এখন ধরম বক্সকে নিজের পূর্ব পুরুষের অধিকারে থাকা জমিতে চাষাবাদ করার জন্য সরকারের নিকট থেকে লিজ নিতে হয়। ১৭৯৮ সালে কর্ণফুলীর উভয় তীরে রাঙামাটির নিকটবর্তী যেসমস্ত ভূখণ্ডকে বুকানন 'টব্বর খাঁর সম্পত্তি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন সেখানে ১৮১৮ সালে তাঁর উত্তরসুরিকে হাল চাষাবাদের জন্য সরকারের নিকট থেকে 'নোয়াবাদ' নামে বন্দোবস্তির অনুমোদন নিতে হয়। এটা পরবর্তীকালে রাজস্ব নথিতে জুমবঙ্গের পাশাপাশি 'জুম নোয়াবাদ' নামে লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৮২১ সালে রাজস্বের পরিমাণ আবার কমিয়ে ধার্য হয় ২০০৫ টাকা।[৬৯] শুধু তাই নয় এরপর স্থানীয় কালেক্টর ওয়াল্টার ভুয়া আমিন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ১৮২২ সালে ধরম বক্স খাঁর উপর ৮০০ বা ৯০০ টাকা অতিরিক্ত কর ধার্য করেন। এতে ধরম খাঁ প্রতিবাদী হয়ে একই বছর গভর্নর-জেনারেল মার্কুসইস অব হেস্টিংসের বরাবরে পিটিশন দাখিল করেন। ঐ পিটিশনে যা ছিল:

> The rest of the petition is mainly occupied with complaints against Mr. Wslters the collector, and it is specially deserving of notice that one of the charges brought against him was that he endeavoured to impose an assessment on the mountain as producing grass, such a tax being in addition to the assessment by capitation (tax).[৭০]

ধরম বক্স খাঁ এতে প্রতিকার লাভ করেন। এ সংক্রান্ত সরকারি অফিস আদেশটি ছিল নিম্নরূপ:

> The Governor-General in Council resolves that, the collection of the cess in question shall be prohibited, and that a clause containing the prohibition, shall be inserted in the agreement taken from, and Pottah granted to, Dhurm Bux Khan. Not forty years ago (from 1873) the Chakma tribe was a united entity strongly bound together by the ties of kinship and clanship, and under the direction of an able head, the Raja Dharam Baksh Khan.[৭১]

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, ১৮২৯ সালের পূর্ব থেকেই স্থানীয় চাকমা রাজাদের অর্থনৈতিক ব্যাপারে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ছিল। পরে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারেও তারা সমভাবে হস্তক্ষেপ করে।

ধরম বক্স খাঁ ১৮৩২ সালে পরলোক গমন করলে চাকমা রাজপরিবারের উত্তরাধিকার নিয়ে ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ শুরু করে। কারণ মৃত্যুর আগে ধরম বক্স খাঁ রেখে যান তিন রানিকে (কালিন্দী, হারিবি, আটকবি) যাদের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। দ্বিতীয় স্ত্রী হারিবির চিকনবিবি নামে একটি মেয়ে ছিল। ফলে চাকমা রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী বা কার্পাস মহল তথা জুমবঙ্গের বন্দোবস্ত কার নামে হবে এ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। ১৮৪২ সালের একটি চিঠিতে প্রথম দিকে দেওয়ানি আদালত কালিন্দী রানিকে উত্তরাধিকারী হিসেবে সাব্যস্ত করে। চট্টগ্রামের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার জন ইংলিস হার্ভে[৭২] রানির যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করায় সেটা ভেস্তে যায়। চিঠিতে পরিষ্কার লেখা আছে,

> On the death of the late Rajah Durrumbux Khan in 1832 the Civiil Court recognized the succession of the Ranee Kalindee to his lands and possession, and on the 27th March 1833, the Collector recommended "that she should be left in charge of the property" and that the estates should be recorded in "her name". The Commissioner doubted her capability to manage the property, but it appears her incapacity was considered

> established because she refused to engage for some Noabad lands the justness of the assessment of which she denied.[৭৩]

কমিশনার হার্ভের (লোক ঠকানো ছিল যার কৌশল) জেন্ডার সংবেদনশীলতার অভাবে প্রথম দিকে রানি স্বামীর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। ব্রিটিশ সরকার রাজা ধরম বক্স খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালিকা কন্যা চিকনবিবিকে রাজ পরিবারের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করে এবং জুমবঙ্গের চাকমা রাজ এস্টেটের দায়িত্বও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে নিয়ে নেয়। তবে বোর্ড বিষয়টির অধিকতর তদন্ত ও মুসাবিদার জন্য জুম বঙ্গের ওপর একটি সারাৎসার (*আ মিনিট অ্যাকাউন্ট অব জুম বঙ্গ*) প্রতিবেদন তলব করে। *চাকমা জাতি* গ্রন্থপ্রণেতা সতীশ চন্দ্র ঘোষ এ অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন 'অরাজকতা' হিসেবে। তাঁর কথায়, 'ধরম বক্স খাঁর মৃত্যুর পর দেশে অরাজকতা পড়িয়া গেল। অগত্যা "কোর্ট অব ওয়ার্ডস"[৭৪] হারিবিবির অবিবাহিতা তনয়া চিকনবিবির অভিভাবক স্বরূপে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কন্যাই সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হওয়াতে হারিবিবি অতিশয় অহঙ্কার করিয়াছিল, তিনি বড় রাণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।'[৭৫] এসব আচরণ বড় রানি কালিন্দীর আত্মসম্মানে বিঁধে। ফলে পারিবারিক কলহের সূত্রপাত হয়। রাজা ধরম বক্স খাঁর পরবর্তী চাকমা রাজ পরিবারের উত্তরাধিকার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন:

> His death was the begining of discord: he left no son, although (unfortunately) he had three wives, and the tribe was left without a leader. The three widows squabbled among themselves who should be the heir-at-law, and the matter was eventually taken into the Chittagong courts, and after some years of litigation was decided.[৭৬]

প্রথমা রানি কালিন্দী আপত্তি উত্থাপন করে মৃত স্বামীর রাজ্যভার প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করেন। এ প্রসঙ্গে ১৮৩৪ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার জন হার্ভে সরকারকে লেখেন,

> the position of the petitioner's family (Kalindee Ranee's family) to be that of Sirdars of Joomeahs. That no proprietary right was vested in them, he declared to be shewn clearly both by the nature of the tenure and the farming engagements entered into with them. He recommended that for reasons of Political expediency they should be continued as amils on the part of Government. The Board approved in their No. 13 of the 16th March 1834, and the Collector was instructed to appoint one of the family (members) as *Surbarakar*. Shook Lall, the brother of the Kalindee Ranee, was appointed *Surbarakar* in conformity with these orders and subsequently the Kalindee Ranee became herself the *Surbarakar* and was eventually in 1855 the other windows of Dharam Bux Khan being dead she was declared in the Boards No. 42 of the March of that year, entitled to settle as Malik.[৭৭]

অতঃপর কোম্পানি সরকার রাজনৈতিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে ২,৪২১-১৩-১১ টাকা বাৎসরিক জমায় ১৮৩৪ সালে ধরম বক্স খাঁর স্বগোত্রীয় সুখলাল দেওয়ানকে কার্পাস মহলের 'ম্যানেজার' নিয়োগ করে। কিন্তু সুখলাল দেওয়ানের ব্যবস্থাপকত্বে রাজস্ব আদায়ে অব্যবস্থাপনা দেখা দিলে কোম্পানি ১৮৩৬ সালে বাধ্য হয় বন্দোবস্ত রহিত করতে। পরে ১৮৩৭ সালে কালিন্দী রানিকে ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি সরকারকে ২,৫৮৩-৫-২ টাকা পরিশোধে রাজি হন। তিনি দুই বছর পর ১৮৩৯ সালে ম্যানেজারের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। ফলে কার্পাস মহল খাস পড়ে থাকে পুরো দুই বছর। এটি স্পষ্ট যে কার্পাস মহলের রাজস্ব আদায়কে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক শাসকদের হস্তক্ষেপে চাকমা রাজ পরিবারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

স্মরণকালের ইতিহাসে চাকমা রাজপরিবারে উত্তরাধিকার নিয়ে বহিঃশক্তির এমন হস্তক্ষেপ বিরল। অতঃপর ১৮৪২ সালে পরবর্তী কমিশনার হেনরি রিকেটস (১৮৪১-১৮৪৮)[৭৮] এ অচলাবস্থার সুষ্ঠু নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে লেখেন:

> In all parts of India these jungles Rajas are exempt from division under the Hindoo Law of Succession, and it appears to me in every account desirable that the integrity of the Raj should be preserved and opportunities embraced of strenghthening the hands of these border Rajahs instead of weaking their authority. We can only rule in the hills by their means and they can be of use only when strong. On the death of a Raja leaving no son of an age to succeed to the management of the Zamindary it is always usual for the Ranee to administer the management. I see no reason for depriving Kalindee Ranee of the management, and you will carry my instructions of the 15th instant, No. 746 into execution.[৭৯]

তৎকালীন দায়িত্বশীল ও দুরদর্শী কমিশনার হেনরি রিকেটসের যুক্তিসহকারে লিখিত পত্রের সুফল অচিরেই পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সরকার সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করে ১৮৪৪ সালে কালিন্দী রানিকে প্রয়াত রাজার উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি দেয়। রাজস্ব বোর্ড সেক্রেটারি ৪২ নং পত্রে চট্টগ্রামের বিভাগীয় রাজস্ব কমিশনারকে এ স্বীকৃতির কথা জানিয়ে লেখেন:

> In April 1844, the Ranee was admitted to engage as Surbarakar on a Jamma of Co. Rs. 2,583-8 annas which was the Mufussil Jamma of the Mehals when brought under the Court of Wards, the Suddar Jamma at the same period having been no more than Rs. 2224-4 Annas 5 pies.[৮০]

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন লুইন চট্টগ্রামের তৎকালীন অফিসিয়েটিং কমিশনার মি. স্কন্সের পত্র (৩১ আগষ্ট ১৮৫৫) থেকে রানি কালিন্দীর চাকমা মহলের রানি হিসেবে আবির্ভাবের পটভূমির ওপর চমৎকার বিবরণ খুঁজে পান এবং পরে তাঁর Report on the capitation tax revenue settlement of the Chittagong Hill Tracts প্রতিবেদনে তা পুনরুল্লেখ করেন। এখানে সেটা এক নজর দেখা যেতে পারে:

> The Kalindee Ranee's Mehal was during the life of Dhurum Singh (Bux) Khan held at a rental of sicca Rupees 2,085-4-3. On his death in 1832, the whole of his property was brought under the Court of Wards in trust for his daughter by his second wife. Two years after his death no definite arrangement was made. In 1835 the Collector entered into an engagement with Sook Lall Khan as Manager, for the minor of the Kapas Mehal to pay Rs. 2,421-13-11 per annum and to do his best to pay into the Collectorate any surplus what might accrue as to fee. In 1836, this engagement was brought to a close and shortly after in 1837 the management was given to the Kalindee Ranee, she agreeing to pay Rs. 2,583-5-2 a clear jumma to Government. She in 1839, threw off this engagement and the mehal was held ''khas'' for about two years but on her applying for a farm of the estate, it was again settled with her for two years at the same rental and finally in 1844 it was settled with her as ''Surbarakar'' in the same sense that the *Surbarakar* of the landed property of her husband was made over to her.[৮১]

বাংলা ও ভারতের ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে 'সরবরাহকার' পরিভাষাটি কোথাও পাওয়া যায় না। রাজা, জমিদার, তহশিলদার, তালুকদার, রেড্ডি, প্যাটেল, পান্ডে, দেশমুখ বহু পদবি আছে।

কিন্তু 'সরবরাহকার' পদবাচ্যটির উদ্ভব গবেষণা সাপেক্ষ। এটা চাকমা রাজাদের 'রাজা' পদ ও পদমর্যাদাকে অবমূল্যায়নের শামিল। এভাবে নানা ঘাত-প্রতিঘাত উতরিয়ে চাকমা রাজ পরিবারের গদিতে আসীন হন কালিন্দী রানি (১৮৪৪-৭৩)।

কালিন্দী রানির দেওয়ানদের মধ্যে সংঘাত : কুকিদের ভাড়াটে হিসেবে ব্যবহার

রানি একদিকে যেমন নিজের উত্তরাধিকার অধিকার আদায়ের জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়েছেন আবার আশ্চর্যজনকভাবে ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের দুর্দিনে ঠিকই সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এসব দিক তাঁর অসীম সাহসিকতা ও দুরদর্শিতার পরিচায়ক। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর রানির নিজ রাজ্যের অভিজাত দেওয়ানদের মধ্যে প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ দেখা দেয়। কামিনী মোহন দেওয়ান এ ঘটনাকে স্বজাতীয়গণের মধ্যে 'অন্তর্বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন। এ অন্তর্বিপ্লব ব্রিটিশ হস্তক্ষেপকে ত্বরান্বিত করে।

উল্লেখ্য, স্মরণাতীতকাল থেকে চাকমা রাজ প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল দেওয়ান। শের দৌলত খাঁর আমল থেকে দেওয়ানদের নাম-পরিচিতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের মনিব রাজাদেরও ছাড়িয়ে যায়। ১৭৭৭ সালে চট্টগ্রামের কাউন্সিল প্রধানের ওয়ারেন হেস্টিংসকে লেখা পত্র রনু খানের (দেওয়ান) বর্ণনায় ভরপুর। ১৭৮৫ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখের রেভিনিউ কমিটির প্রসিডিংসে রাজা জান বখশ্ খাঁর সেনাপতি হিসেবে পাঁচজন প্রভাবশালী দেওয়ানের উল্লেখ পাওয়া যায়: রনু খাঁ, ডুলুপ, ছুড়ি, কনু তুটাং। ফ্রান্সিস বুকানন কোম্পানির নির্দেশে ১৭৯৮ সালের মার্চ থেকে ২১ মে পর্যন্ত আড়াই মাস ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন। বুকানন কর্ণফুলী ও এর উপনদীগুলোর তীরবর্তী চাকমা গ্রামে বেশ কয়েকজন দেওয়ানের সাক্ষাৎ পান যারা চাকমা রাজা টব্বর খাঁর শাসনাধীন । তারা হলেন রাইংখ্যাং এ আলীশান লস্কর; মানিকছড়ি নদী তীরে কোনাকা (কনু খাঁ) দেওয়ান যাকে চাকমা-বাঙালিদের অতিপ্রিয় রাজদিওয়ান বা মন্ত্রী বলে অভিহিত করেন, রাঙামাটিতে থাকতেন রোনোকা (রনুখাঁ) দেওয়ান; যিনি শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর দুই পুত্র ছুন্দনকা; এবং রতন খাঁ যারা পিতার খ্যাতির কারণে বেশ নামডাক নিয়ে বসবাস করতেন, বসন্ত গ্রামে ছিলেন বুসদরকা, সুভলং-এ দায়িত্ব পালন করতেন সুরতকা দেওয়ান আর কান্দাছড়ায় (বর্তমানে কান্দেবছড়া) দেখেছিলেন পেটান (প্রীতম) ও সেরাম (শ্রীরাম) দেওয়ানকে। নামগুলোর বানান এবং উচ্চারণ অদ্ভুত। কিন্তু একজন ইউরোপিয়ানের পক্ষে চাকমাদের নাম রপ্ত করে সঠিকভাবে লেখাও সম্ভবপর ছিল না। তিনি একটি দেওয়ান-শাসিত গ্রামের বর্ণনা দেন যেখান থেকে ধারণা করা যায় দেওয়ানরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন:

> This village at the mouth of the Basunta (Near Rangamati) is pretty large, contain[in]g above 50 houses, and is etremely populous. It is one of the fixed residences of the Chakmas, under the administration of a Dewan. ... The Chakma villages derive their name from the dewan under whose authority they are, and must therefore frequently change their appellation.[৮২]

বুকাননের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মীমাংসার পথ ও পদ্ধতি নিয়ে রাজা জান বক্স খানের সঙ্গে রনু খাঁর সম্পর্কের টানাপড়েন সৃষ্টি হয়। বুকাননের দেওয়া তথ্যমতে, রনু খাঁ অপমানে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। মহারাজা ধরম বক্স খাঁও দেওয়ানদের উদীয়মান

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ফলে দেওয়ানদের প্রভাব হ্রাস করার মানসে আরও নতুন নতুন দেওয়ান সৃষ্টি করেন। হাচিনসনের কথায়, 'The Chief finding the influence of the Dewans somewhat irksome, tried to lessen it by creating several additional Dewans, and he was to a certain to extent successful.'[৮৩] কালিন্দী রানির সময় প্রভুত্ব স্থাপন নিয়ে দেওয়ানরা মহারাষ্ট্রের মারাঠা গোত্র ভোঁসলে, সিন্ধিয়া ও হোলকারদের মতো গোত্রদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। একপক্ষ অন্যপক্ষকে দমনের জন্য সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে মারাত্মক হলো তাদের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে কুকিদের ভাড়াটে হিসেবে ব্যবহার। কামিনী মোহন দেওয়ান একটি বাস্তব ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। ঘটনাটি হলো:

> এক সময় ধাবানা বংশীয় দুই দলের নেতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। একপক্ষে স্বনামপ্রসিদ্ধ দুঃসাহসী গিরিশ চন্দ্র দেওয়ান ও অপরপক্ষে ত্রিলোক চন্দ্র দেওয়ান উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধের আকারে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে গিরীশ চন্দ্র দেওয়ান তাঁহার ভগ্নিপতিকে অপরপক্ষ অবলম্বনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া, স্বয়ং গুলি করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। ইহার ফলে এক সময় ত্রিলোক চন্দ্র পক্ষীয়, এক কুকী রাজা কর্তৃক গিরীশ চন্দ্র দেওয়ানের গ্রাম অবরুদ্ধ করা হয়। . . . এই ঘটনাতে গিরীশ চন্দ্র দেওয়ানের সঙ্গীয় লোকদের প্রতিশোধ স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিল। সুতরাং তাহারাও বিপক্ষীয় দলের প্রতি কুকী লেলাইয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ইহার একদিন পর হঠাৎ ত্রিলোক চন্দ্র দেওয়ানের পাড়া (গ্রামা) বিপুল সংখ্যক কুকী দ্বারা আক্রান্ত হইল। গ্রামবাসীরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিলে লাগিলেন। ত্রিলোক চন্দ্র দেওয়ান সপরিবারে পলায়নে সক্ষম হইলেন বটে কিন্তু . . . তাড়াতাড়ি জঙ্গলের ভিতর আত্মগোপন করার পূর্বে কুকীদের নিক্ষিপ্ত এক বন্দুকের গুলি বিদ্ধ হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। ইহাতে কুকীরা বিশেষভাবে আনন্দ ও উল্লাস করিতে লাগিল।[৮৪]

এভাবে প্রভাবশালী দেওয়ানদের মধ্যকার সংঘর্ষে প্রচুর সম্পদ ও প্রাণহানি ঘটতে থাকে। এ সংঘাতে নরমুণ্ড শিকারী ও লুণ্ঠনপ্রিয় কুকিদের ভাড়াটে সেনা হিসেবে ব্যবহার পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়। সুবির ভৌমিক যথার্থই বলেছেন যে, পার্বত্য রাজাদের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে কুকিদের মোতায়েনের ফলে কুকিরা 'পূর্বাঞ্চলের মারাঠা' হিসেবে আবির্ভূত হয়।[৮৫] উপর্যুক্ত ঘটনা তার সাক্ষ্য দেয়। অতঃপর পিতৃবিয়োগে শোকাতুর ত্রিলোক চন্দ্র দেওয়ানের পুত্র নিলচন্দ্র দেওয়ান অপর দেওয়ানদের সঙ্গে পরামর্শ করে কুকি দমনে ব্রিটিশ সহযোগিতা চাওয়ার প্রসঙ্গ রানি কালিন্দীর নিকট উপস্থাপন করেন। কিন্তু এধরনের পদক্ষেপে স্বশাসন বিপন্ন হবে এমন যুক্তিতে রানি অসম্মত হওয়ায় নিলচন্দ্র বিক্ষুব্ধ হন। উমেশ সায়গল নিলচন্দ্রের এ প্রতিক্রিয়াকে বলেছেন 'নিলচন্দ্রের বিদ্রোহ'।[৮৬] এ ঘটনার পর নিলচন্দ্র ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট আশ্রয় ও সাহায্য লাভের জন্য তৎপর হন। কামিনী মোহন দেওয়ানের মতে, 'তিনি (নিলচন্দ্র দেওয়ান) ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য পুনঃ পুনঃ প্ররোচিত করিতে লাগিলেন।"[৮৭] অতঃপর ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ সীমান্তে আরও ভয়ানক আক্রমণ সংঘটিত হলে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য অঞ্চল সরাসরি দখলে নেয়।

দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রামে বোমাং রাজ পরিবারের উত্তরাধিকার সমস্যা ও ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ

আঠার শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের শুরুতে কং হ্লা প্রুর শাসনে বান্দরবানের বোমাং রাজ পরিবার ছিল ঐক্য, সমৃদ্ধি ও সুশাসনের প্রতীক। প্রতাপশালী জুমিয়া সর্দার কং হ্লা প্রুর পরিবারে ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি ধনৈশ্বর্য ও প্রাচুর্যের কোনো কমতি ছিল না। মন্ত্রী, পুরোহিত, উপদেষ্টা,

তিন রানি, ছয় রাজকুমার, ছয় রাজকন্যা, বিশ জন ভৃত্য ও অনেক দাস-দাসী নিয়ে তার বিশাল পরিবার ছিল। ১৭৯৮ সালে সাধারণের নিকট দুর্গখ্যাত রাজবাড়িতে বুকাননের সাথে বোমাং কং ল্লা প্রুর সাক্ষাত ঘটে। তাঁর বিবরণে বোমাং কং ল্লা প্রুর পরিবারের এমন সচ্ছলতার চিত্রই ফুটে উঠেছে।[৮৮] এলাকার প্রজারা সুখে শান্তিতে দিনযাপন করত। কং ল্লা প্রুর অধীন ল্যাংগা নামে পরিচিত কুকিরা বুকাননকে জানায়: 'ইংরেজদের অধীনে যতদিন থেকে তারা আছেন, অর্থাৎ কং ল্লা প্রুর অধীনে বসবাস করছেন, তারা শান্তি উপভোগ করছেন; কিন্তু এর আগে বনযোগীদের সাথে তাদের কেবল যুদ্ধ বেঁধে যেত। বনযোগীরা যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের দাস বানাতো।'[৮৯]

এভাবে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জনের মাধ্যমে কং ল্লা প্রু এতই নির্ভীক হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি ব্রিটিশের কাছে দাবি রাখেন যে তাঁর নিজস্ব সামরিক বাহিনী থাকা উচিত।[৯০] এ দাবি সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষার তাগিদে যৌক্তিক ছিল। অবশেষে অসীম দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে বান্দরবানে বোমাং রাজপরিবারকে প্রতিষ্ঠা করে ১৮১৯ সালে কং ল্লা প্রু ইহলোক ত্যাগ করলে সাথাং প্রু তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। সীমান্ত এলাকায় স্থানীয় রাজার উত্থান ঔপনেবিশক সরকার সবসময় হুমকি হিসেবে মনে করে। কং ল্লা প্রুর সময় পর্যন্ত ব্রিটিশরা বোমাং রাজাদের রাজস্বের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেয়নি। কিন্তু সাথাং প্রুর সময় থেকে কার্পাস মহল বন্দোবস্তের সময় রাজস্বের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে বোমাংদের উপর একপ্রকার অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। এ চাপ সামলাতে গিয়ে তাদের হিমশিম খেতে হয়। তার উপর ছিল, মারমা বসতিগুলোতে স্বাধীন জাতিগুলোর দুর্ধর্ষ হামলা। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৭ সালের মধ্যে কমপক্ষে দশবার আক্রমণের ঘটনা ঘটে।[৯১] এ হামলা মোকাবেলা করতেও সাথাং প্রুকে বাড়তি অর্থব্যয় করতে হয়। হাচিনসনের গ্রন্থে এ ধরনের নৈমিত্তিক হামলার কথা জানা যায় যা সাথাং প্রুকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

> In August 1813 a free-booter by name Khyanbrai, a resident of Arracan, with a band of 200 desperadoes committed great ravages in the surrounding country, so much so that the residents fled away from their homes. . . . Sathanfru, collected a force of 400 men and utterly routed Khyanbrai and his gang of free-booters, driving them forth from the country. … In 1823 Sathanfru defeated the Bunjogi Chief Rang Chooloom.[৯২]

এছাড়া ঔপনিবেশিক সরকার ১৮০৪ সাল থেকে এমনভাবে রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্পাদন করে যাতে বোমাং রাজপরিবারে অন্তঃকলহ দানা বাঁধে। বন্দোবস্তের ধরন ও পরিচালনা পদ্ধতিও যে রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে সেটা বাংলায় প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে (১৭৯৩) দেখা গেছে। ওই বন্দোবস্তের অভিঘাতে অনেক বনেদি জমিদার পরিবার খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। কোনো কোনো জমিদার নির্ধারিত রাজস্ব পরিশোধ করতে না পেরে চিরতরে ভূমি থেকে উৎখাত হয়। কৃষি বিপ্লব ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যেই বর্ধমান রাজ ছাড়া অবশিষ্ট সব বড় জমিদারি সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু পার্বত্য রাজারা জমিদার হলেও তাদের সাথে চিরস্থায়ী ভিত্তিতে বন্দোবস্ত সম্পাদিত হয়নি, হয়েছে দশসনা আকারে। যাহোক বোমাং রাজপরিবারের সাথে সম্পাদিত বন্দোবস্তের মধ্যেই আন্তঃকলহ সৃষ্টি ও সংঘাতের বীজ নিহিত ছিল। ১৮৬৭ সালের সরকারি রিপোর্টেও একথা অকপটে স্বীকার করা হয়েছে। রিপোর্টে লিখিত আছে:

> In the Moung Phroo family of Bundarbun whose head is known as the Bhomang instead of our acknowledging and appointing one head we have admitted all the sons of the old Bhomang to share alike and equally in the rulership of the tribe. This has already given rise to many disputes (the share of each brother not being determined) although there are now only four brothers as however each brother has at present some 3 to 4 sons I fear that the future will see a series of still more serious embroilment.[৯৩]

নিম্নের সারণির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, কিভাবে দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রামের কার্পাস মহল বন্দোবস্তে কংহ্লা প্রুর সকল ওয়ারিশদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

সারণি- ১

সাথাং প্রু ও অন্যদের সাথে সম্পাদিত কার্পাস মহল বন্দোবস্তের বিবরণী

(১২১১ বঙ্গাব্দ হতে)

বন্দোবস্তের বছর	বন্দোবস্ত গ্রহীতাদের নাম	জমার পরিমাণ	মোট
১২১১ সন, ১৮০৪ খ্রি.	সাতাং প্রু, শংখ নদীর বাসিন্দা পোমাং-গ্রি, কংহ্লা প্রুর পুত্র, থোইহ্লা প্রু, ক্যঅ জা প্রু ও ওম প্রু, কংহ্লা প্রুর পুত্র	১,৭০৯-২-১৫.২ ৭০১-০-০	২৪১০-২-১৫.২
১২১৬ সন বা ১৮০৯ খ্রি.	সাতুং প্রু ..... থোইহ্লা প্রু, ক্যঅ জা প্রু ও ওম প্রু....	১৭০৯-২-১৫.২ ৮০১-০-০	২৫১০-২-১৫.২
১২২৫-১২৩৪ সন বা ১৮১৮-১৮২৭ খ্রি.	চরই প্রু, ওম প্রু ও সাতুং প্রু..... সাতুং প্রু ও ওম প্রু	৩৫০০-২-১৯ ৯২৫-০-০	৪,৪২৫-২-১৯
১২৪৫ ও ১২৪৬ সন, ১৮৩৮ ও ১৮৩৯ খ্রি.	সাতুং প্রু, থোইহ্লা প্রু ও ওম প্রু.... সাতুং প্রু	৪,৪২৫-৭-০ ১৩৮-১০-৮	৪,৫৬৪-১-৮
১২৫০ ও ১২৫১ সন বা ১৮৪৩, ১৮৪৪ খ্রি.	থোইহ্লা প্রু, ওম প্রু ও চরই প্রু. ওম প্রু... ও চরই প্রু.....	৪,৪২৫-৭-০ ১৩৮-১০-৮	৪,৫৬৪-১-৮
১২৫২-১২৫৬ সন বা ১৮৪৫-১৮৪৯ খ্রি.	থোইহ্লা প্রু, ওম প্রুও মুন প্রু ..... ঐ..... ঐ	৪,৪২৫-৭-০ ১৩৮-১০-৮	৪,৫৬৪-১-৮

উৎস: রিপোর্ট অন দ্য ফরেইস অব দ্য ওয়াইলড্ ট্রাইবস অব দ্য চিটাগং ফ্রন্টিয়ার ইন *সিলেকশন ফ্রম দ্য রেকর্ডস অব বেঙ্গল গভর্নমেন্ট*, ১১(১৮৫৩), পৃ. ৯১-৯২

ব্রিটিশ সরকার বোমাং রাজাদের দিয়ে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে পৃথক নীতি অবলম্বন করে। ইতঃপূর্বে দেখা গেছে ১৭৯০ ও ১৭৯১ সালে দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রামের কার্পাস মহল বন্দোবস্ত শুধুমাত্র কংহ্লা প্রুর জ্যেষ্ঠ ছেলে সাথাং প্রুর নামে সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু ১৮০৪ সাল থেকে কোম্পানি সরকার কার্পাস মহল রাজস্ব আদায়ে কংহ্লা প্রুর অন্য দুই ছেলেকেও যুক্ত করে যেটি চাকমা বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। তবে রাজস্বের সিংহভাগ অংশ আদায়ের ক্ষমতা যায় সাথাং প্রুর হাতে, ১৭০৯ টাকা যেখানে তার অন্য ভ্রাতা থোইহ্লা প্রু ও ওম প্রু মাত্র ৭০১ টাকা খাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব পৃথকভাবে গ্রহণ করেন। এভাবে পুরো পরিবারের নামে রাজস্ব জমার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪১০ টাকায়।[৯৪]

১৮১৮-১৮২৭ সময়পর্বে রাজস্ব জমার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪,৪২৫ টাকা। ১৮৩২ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত সাথাং প্রুকে আরও ১৩৮ টাকা ধার্য করা হয়। এই অঙ্ক ছিল সমকালীন জুমিয়া সংখ্যা ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় এক বিশাল অঙ্ক। ১৮৬২ সালের জনশুমারি অনুসারে বোমাং রাজার অধীনে মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬,০৭৩ জন যার মধ্যে মারমা ছিল ২২,০৬০ জন যারা বোমাং রাজাকে কর দিত।[৯৫] সুতরাং ১৮২০-এর দশকে জনসংখ্যা হবে তার এক তৃতীংয়াংশ, আনু. ১১ হাজার। একইভাবে ১৮৬৯ সালে লুইন একটি জুমিয়া পরিবার ভাল মৌসুমে মোট ৭৬ টাকা রোজগার করতে পারত। কিন্তু খরচ হতো ১২৩ টাকা। হান্টারের মতে, জুমিয়ারা ছিল 'সাধারণভাবে গরিব' এবং ঋণগ্রস্ত'। সুতরাং ঔপনিবেশিক সরকারের বাড়তি রাজস্ব উত্তোলন করা ছিল বোমাংদের জন্য কঠিন বাস্তবতা।

এভাবে বোমাং রাজ পরিবারের মধ্যে কার্পাস মহল বন্দোবস্ত তথা রাজস্ব আদায়কে কেন্দ্র করে 'অদ্ভুত বন্দোবস্ত' ব্যবস্থার উদ্ভব হয় যা ক্রমশ জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অনুঘটকের কাজ করে। বোমাং চিফের ভাইদের সঙ্গে এভাবে আলাদা আলাদা চুক্তি করে তাদের 'Assessed Land holder' এর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়; কার্যত যে-অধিকার তারা পাননি। কিন্তু ১৮৩৮-১৮৩৯ সময়কালে বোমাংদের রাজস্ব জমা ৪৫৬৪ টাকায় উন্নীত করা হয়। বোমাং পরিবারের পক্ষে বর্ধিত হারে রাজস্ব আদায় করা কঠিন হয়ে ওঠে। এভাবে বন্দোবস্ত নিয়ে বোমাং পরিবারে অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। ১৮৩০-এর দশক থেকে বোমাং পরিবারের নিকট বন্দোবস্তকৃত গ্রামগুলোতে আরাকান ও পূর্বদিকের গহীন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা থেকে আগ্রাসী সেন্দু, মুরং, লাখেরদের আক্রমণ ও লুঠতরাজ আরম্ভ হয়। এ আক্রমণ বোমাংদের জন্য অভিশাপরূপে দেখা দেয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মনে করে আগ্রাসী কুকিদের ক্রমাগত আক্রমণের সাথে বোমাং পরিবারের সংহতি নষ্ট হওয়ার যোগসাজস আছে। ভক্ষগাং মে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'মার্মাদের উপর এই ক্রমাগত হামলাই হয়ে ওঠে ব্রিটিশদের মার্মাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কারণ বা উপলক্ষ্য'।[৯৬] ১৮৪০ সালে বোমাং কংহ্লা প্রুর উত্তরাধিকারী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সাথাং প্রু পরলোক গমন করলে ভাইদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে প্রচণ্ড গোলযোগ দেখা দেয়। ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাদের মধ্যে ভ্রাতৃকলহ ও গৃহবিবাদ চলমান থাকে। এ গোলযোগের সুযোগে বোমাংদের অধীন গ্রামগুলোতে অদমনীয় কুকি-সেন্দুদের আক্রমণ সংঘটিত হয় ঘন ঘন ।

এ অন্তঃকলহের প্রধান কারণ, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কার্পাস মহলের কর সংগ্রহের অধিকার এবং উত্তরাধিকার নিয়ে অচলাবস্থা। তার নমুনা হল, উপরের বন্দোবস্ত বিবরণীতে ১৮৪৩-৪৪ সালের বন্দোবস্তে সাথাং প্রুর নাম নেই, আছে তাঁর তিন ভাই থোইহ্লা প্রু, ওম প্রু ও চরই প্রুর নাম। ১৮৪৫-১৮৪৯ সালের বন্দোবস্তে চরই প্রুর পরিবর্তে তাঁর ছেলে মুন প্রুর নাম দেখা যায়। বোমাং পরিবারের তৎকালীন করুণ অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় হেনরি রিকেটসের রিপোর্টে। তাঁর পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

> So long as his strength lasted, Satung Phroo was chief manager of the Mehal, but some times previous to his death, which took place in 1840, becoming very infirm, he made over the management to his brother, Om Phroo. Up to this period all lived together at Bindabun, and, if harmony did not always prevail among them, there were no great

> disputes. Om Phroo was harsh ill-tempered man; Thoyla Phroo could not brook the treatment he received, and leaving Bindabun (Bandarban) he established himself to the South in the forests Eastward of *thana* Chakerrea, on the Meetamooree river. From that time till the death of Om Phroo in 1846, there were constant disagreements. After his demise, the conduct of his son Kumulungnio being such as to make living at Bindabaun no longer endurable, Mun Phroo and his brother, the sons of Charee Phroo, bringing with them their dumb uncle Ram and his son Charung, established themselves on the Kuptai river, a branch of the ''Kurrumfoolee'', about 30 miles east from Chittagong, so that only the two sons of Om Phroo now remain at Bindabun. [৯৭]

এভাবে বোমাং পরিবারের একটি অংশ মাতামুহুরী এলাকায় বসবাস আরম্ভ করে। অন্য এক অংশ বসতি স্থাপন করে সুদূর রাঙামাটির কাপ্তাই অঞ্চলে। কিন্তু এরপরও উত্তরাধিকার সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি। প্রু পরিবারের মধ্যে নানা প্রকার ব্যক্তি সংঘর্ষের ফলে পরিবার দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্রিটিশরা কার্পাস মহল বন্দোবস্তের চুক্তি একটি সুস্পষ্ট উত্তরাধিকার নিয়মে বোমাং পরিবারের উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে একজনের সাথে না করে সকল ওয়ারিশের সাথে করে। সমস্যা সৃষ্টি সেখান থেকেই। লরেন্স জি লোফলার মনে করেন, সমস্যাটি ব্রিটিশ নীতি থেকেই সৃষ্ট। ''These quarrels, however, did not arise out of sheer greediness. They resulted from British policy.''[৯৮] তবে রিকেটস অন্য ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন,

> That all the members of the family are great distress now, there is no doubt either, for we have, in order to the realization of last year's (1846) revenue, been obliged to attach and sell their personal property, and the question of individual responsibility for debts incurred by the family is one cause of the feud existing between them.[৯৯]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে অনুধাবন করা যায়, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও অর্থনীতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। ফলে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে যখন রাজস্ব আদায় অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং আগ্রাসী উপজাতিগুলোর আক্রমণ বৃদ্ধি পায় তখন ব্রিটিশ সরকারকেই সমাধানের পথ বের করতে হয়। এভাবে ব্রিটিশরা সুপরিকল্পিতভাবে বোমাং রাজ পরিবারের প্রথাগত শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। সরকারের নির্দেশে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার হেনরি রিকেটস বান্দরবানে হাজির হন। রিকেটস বোমাং পরিবারের সমস্যা সমাধানকল্পে একটি সমঝোতায় উপনীত হন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে 'রিকেটস সেটেলমেন্ট' হিসেবে খ্যাত এ চুক্তি অনুসারে বোমাং রাজ পরিবারের যোগ্যতম সদস্য কংহ্লাঞো-কে দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রামের পুরো কার্পাস মহলের চিফ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[১০০] এর পর থেকে ''eldest and fittest'' member of the royal family succeeds.'' নিয়মটি বোমাং রাজ পরিবারের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার এক স্বীকৃত নিয়মে পরিণত হয়। চিফের অধীন হিসেবে থোইহ্লা প্রুকে রাজমন্দির বা গোঁসাইখানা দেখাশুনার ভার দেওয়া হয় এবং মুন প্রু ও কুমহ্লা প্রুকে মারমা ব্যতীত অন্য উপজাতিদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের তহশিলদারের দায়িত্ব অর্পণ দেওয়া হয়। অন্যদিকে নতুন সেটেলমেন্ট অনুসারে বোমাং চিফের দেয় রাজস্বের বোঝা কমিয়ে ৪৫৬৪ টাকা থেকে কমিয়ে ২৯১৮ টাকায় নির্দিষ্ট হয়। এ হ্রাস সুবিধার জন্য বোমাংকে সরকারের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয় যে তারা সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা করবেন। এছাড়া বোমাংরা যদি ক্রীতদাস কেনা বন্ধ না করে তাহলে বোমাংদের গোটা পরিবারকে সমতলে নির্বাসন দেওয়া হবে বলেও বন্দোবস্তে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়। এ সমস্ত

বিষয় উল্লেখ করে বোমাং পরিবারের জন্য পরওয়ানা জারি করা হয়।[১০১] তবে এ বন্দোবস্তের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল বোমাংরা ভূমির ওপর স্বত্ব বা মালিকানা চিরতরে হারিয়ে ফেলেন। কারণ রিকেটস পরিষ্কার ঘোষণা করেন: ''that it be formally notified to them, that the Government acknowledges no right on their part to the soil of the forests, that the whole belongs to the State.''[১০২]

১৮৪৭ সালের এ বন্দোবস্তের মেয়াদ স্থির হয় পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত। কাজেই ১৮৬০ সালের যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা নামে দুই কার্পাস মহল সরাসরি ব্রিটিশাধিকারে নেওয়া হয় তখন বোমাং রাজার রাজস্ব জমা ২৯১৮ টাকা-ই বহাল থাকে। ভূমি মালিকানার বিষয়ে একই নীতি কালিন্দী রানির ক্ষেত্রেও গৃহীত হয়েছিল। তাঁকে শুধুমাত্র 'সরবরাহকারিত্ব' দেওয়া হয় ভূমির স্বত্ব স্বীকার করা হয়নি। এভাবে উত্তরাধিকার সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভূমির ওপর সমস্ত স্বত্ব হাতছাড়া হয়ে যায় পার্বত্য দুই রাজবংশের।

মং রাজ পরিবারের উত্থানে ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা

১৭৯০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সংঘটিত পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, মং রাজা নামে একটি রাজপরিবারের উদ্ভব। রাষ্ট্রনীতির ঘূর্ণাবর্তে ভারতবর্ষে কত রাজবংশের উত্থান পতন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রাচীন বঙ্গেও ছোট্ট সামন্ত রাজা থেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও রণনৈপুণ্যের গুণে অনেকে প্রভাবশালী রাজার আসনে উন্নীত হন। আধুনিক যুগের ব্রিটিশভারতেও ৫৬৩টি দেশীয় রাজ্য ছিল। কিছু রাজবংশ তাদের রাজনৈতিক দুরদর্শিতা, বাস্তববাদী মনন, প্রজাবাৎসল্য, সমাজহিতৈষী কীর্তির গুণে ইতিহাসে স্থায়ী আসন গড়ে নিয়েছে। আলোচ্য মং রাজপরিবারকে এ বর্গভুক্ত করা যায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ ও শরণার্থীদের আশ্রয়দানের মাধ্যমে অসামান্য অবদান রাখেন মং রাজা মং প্রু সাইন ও তাঁর পরিবার। কিন্তু এজন্য তাঁকে পাকিস্তানি-হানাদার বাহিনীর রোষানলে পুড়তে হয়। পাকবাহিনী মানিকছড়ি রাজবাড়িতে লুটতরাজ চালিয়ে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি তছনছ করে দেয়। রাজা মুক্তিবাহিনীর পক্ষ নেয়ার ক্রোধান্ধ হয়ে শতবছরের প্রিয় রাজবাড়ি জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়।

মং রাজাদের উদ্ভবের ইতিহাস পুনর্গঠনে বড় সমস্যা হলো তাদের নিজস্ব কোনো বংশবৃত্তান্ত বা কুলগ্রন্থ পাওয়া যায়নি। ব্রিটিশ প্রশাসক-লেখকরা তাঁদের গ্রন্থে ও প্রশাসনিক নথিপত্রে মং রাজাদের প্রসঙ্গে যা লিখেছেন সেসব বিবরণই তাদের সম্পর্কে জানার প্রধান উৎস। এসব গ্রন্থ ও প্রশাসনিক নথিপত্র অধিকাংশই উনিশ ও বিশ শতকে লিখিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সুপারিনটেন্ডেন্ট ক্যাপ্টেন গ্রাহাম তাঁর ১৮৬২ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে মং রাজা (অথবা মানরাজা) ক্যঅজ সাইন (অথবা মান রাজা) নামোল্লেখ করেন যার 'প্রভাব এবং মর্যাদা' বৃদ্ধি করা প্রত্যাশিত।[১০৩] এরপর ১৮৬৯ সালে ক্যাপ্টেন লুইন মংরাজার কথা উল্লেখ করে বলেছেন কর্ণফুলী নদীর উত্তরে বসবাসকারী যেসব খিয়ংথা গ্রামবাসীরা মং রাজার নেতৃত্ব মেনে চলে। কিন্তু তাদের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির ইতিহাস নাতিদীর্ঘ।

মং রাজারা নিজেদের ১৫৯৯ সালের *মান-রাজা-গ্রি* নামে এক আরাকান রাজার বংশধর হিসেবে মনে করেন।[১০৪] কিন্তু ঐসময় স্বাধীন আরাকান রাজ্যের ম্রাউক রাজাদের তালিকায় মিন ইয়াজাগি ওরফে নরাধিপতি বা সলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২) নাম ও উপাধিধারী রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনিই মং রাজাদের কথিত *মান-রাজা-গ্রি* কিনা গবেষণা-সাপেক্ষ। এটা সুবিদিত যে মং রাজাদের পূর্বপুরুষরা আরাকান থেকে আগত। আরাকান রাজ্যে পালেন খিয়ং নামে একটি অঞ্চল ছিল। হাচিনসন মং রাজাদের উদ্ভব প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, ১৭৮২ সালে ম্রাচাই নামে একজন আরাকানি মগ (মারমা) কয়েক পরিবার নিয়ে কোলাডান নদীর উপনদী পালেঙখ্যং থেকে চট্টগ্রামে অভিবাসিত হয়ে কোম্পানি শাসিত চট্টগ্রাম জেলার মাতামুহুরী উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেন। যেহেতু নদীর নামে অনেক মারমা গোত্রের নামকরণ হয় সুতরাং এরাও পালেঙস্যা মগ নামে পরিচিত হয়। ম্রাচাই তার অনুসারী জুমিয়াদের নামে সরকারের নিকট থেকে কার্পাস তুলার বন্দোবস্ত লাভ করেন। ১৭৮৭ সালে ম্রাচাইয়ের জীবনাবসান ঘটে। অতঃপর তার পৌত্র সাইলেঙ তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত ঐ কার্পাস মহল বন্দোবস্ত পরিচালনা করেন। ধীরে ধীরে তার গোত্র ও অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরের বছর তিনি বাৎসরিক ৩৭৪ টাকা খাজনা জমার শর্তে ১৮৭ পরিবারের বিপরীতে একটি বন্দোবস্ত লাভ করেন। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এই ম্রাচাই বা সাইলেঙ-এর সম্পর্কে বুকাননের বিবরণ নীরব। খুব সম্ভবত তারা উভয়েই কং হ্লা প্রুর অধীন রোয়াজা ছিলেন, যে কারণে তারা আলাদা করে উল্লিখিত হননি। তবে বুকানন মাতামুহুরীর নিকটে অনেক আরাকানি এসে বসতবাড়ি করেছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরও বলেছেন, ''এখান থেকে যা কিছু জানতে পারলাম, আমি নিঃসন্দেহ যে, কিছু সংখ্যক ত্রিপুরা ছাড়া কং হ্লা প্রুর সকল প্রজাই মূলত আরাকান থেকেই আগত।''[১০৫] যাহোক সাইলেঙ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র খেদু বন্দোবস্তির হাল ধরেন। ১৭৮৪ সালে সংঘটিত আরাকানের রাষ্ট্র বিপ্লবজনিত উত্তেজনায় সেখান থেকে দক্ষিণ চট্টগ্রামে উদ্বাস্তুদের ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি হয়। ১৭৯০-এর দশকে কক্সবাজার এলাকায় শরণার্থীর ঢল নামে, যার ফলে কক্সবাজার শহরের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ হয় আরাকানাগত মগ জনগোষ্ঠী। মগ(মারমা)দের পুনর্বাসনের ব্যাপারে চট্টগ্রামের কালেক্টর মি. ফ্রায়ারের (১৭৯৩-৯৪) নীতি ছিল: 'If they really wish to cultivate, he is prepared to find waste lands for them in the north of the district.'[১০৬] এমতাবস্থায় খেদু মাতামুহুরী এলাকা থেকে রেগুলেশন জেলাধীন সীতাকুণ্ড এলাকায় স্থানান্তরিত হন। ব্রিটিশদের সহযোগিতা ছাড়া বা তাদের নজর এড়িয়ে ১৮৭ পরিবারের বহর নিয়ে সুদূর মাতামহুরী থেকে কর্ণফুলী পেরিয়ে সীতাকুন্ডের পাহাড়ি এলাকায় এসে বসতি স্থাপন ও বন্দোবস্তি লাভ সম্ভবপর নয়। অনুকূল পরিস্থিতির কারণে খেদু তার চাচার নামীয় বন্দোবস্ত পুনরুজ্জীবন করেন এবং স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট ধাবেং বা সর্দার হিসেবে উন্নীত হন।[১০৭] বুকানন সীতাকুণ্ডে ভ্রমণকালে সীতাকুণ্ডের নিচু পাহাড়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা মগ-ত্রিপুরার বসতি লক্ষ করেছেন, যারা ওই সব পাহাড়ে জুমচাষ করে। এই বসতিগুলো খেদু ও তার অনুসারীদের হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণে বোধ হয় স্যার রোপার লেথব্রিজ তাঁর *দ্য গোল্ডেন বুক অব ইন্ডিয়া* (১৮৯৩) গ্রন্থে এই খেদুকে 'মং রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। স্যার রোপার মং রাজ পরিবার সম্বন্ধে আরও যেসব তথ্য সন্নিবেশ করেছেন তা আকর্ষণীয়। যেমন,

> The founder of the family was named Khedu; and he was originally the Dabaing or Sardar of a number of villages. His descendant was Konjoy, the grandfather of the late Mong Raja Narabadi, The latter did good service to the Government in the first Lusai war, by supplying coolies, boats, etc; and the hereditary title of Mong Raja has been confirmed to the family. [১০৮]

উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত কনজয় যিনি সাধারণের নিকট কুঞ্জ ধামাই নামে পরিচিত তাঁর সময় থেকে মং রাজাদের সঠিক বংশলতিকা পাওয়া যায়। তার সময়পর্ব ছিল ১৭৯৬ থেকে ১৮২৬ সালে পর্যন্ত। এক সময় মৌলভি হামিদুল্লাহ খানের পৈতৃক জমিদারি নিজামপুর পরগনায় ছিল তাঁর বসতবাড়ি। তাঁরা কখন সীতাকুণ্ড থেকে মানিকছড়িতে বসতি গড়েন তা অস্পষ্ট। তবে ব্রিটিশ রেকর্ডে প্রাপ্ত নথিতে কুঞ্জ ধামাইয়ের পুত্র ক্যজসাইনের জন্মস্থান মানিকছড়ি উল্লেখ আছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় কুঞ্জধামাই-ই জীবনসায়াহ্নে এসে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সীতাকুণ্ড থেকে মানিকছড়িতে বাসস্থান পরিবর্তন করেছিলেন। এর দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমত, জুম ভূমির স্বল্পতার কারণে নতুন জুম ভূমির সন্ধান। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নতুন জুম ভূমি দেখিয়ে নতুন বন্দোবস্ত লাভ। কারণ, ১৮১৪ সালের দিকে চাকমা রাজার অধীনে থাকা জুমবঙ্গের উত্তরকুল এলাকাটি ব্রিটিশরা অন্য পক্ষের নিকট বন্দোবস্ত দেয়ার চেষ্টা করে। যা হোক, তিনি উনিশ শতকের প্রথম মং দলপতি এবং নিজ সরলতা ও কর্মনিষ্ঠা দিয়ে সমকালীন প্রভাবশালী জমিদার এবং ব্রিটিশ প্রশাসকদের আনুকূল্য লাভে সমর্থ হন।

> Of the successive Mong Rajas, the name of Mong Raja Konjoy became prominent. He was an energetic administrator. He assisted the authorities in various ways and in recognition of his extraordinary valour and devotion to duty, he obtained the Reward of a "Sword" of Honour from the British Government. The "sword" was called in the local language as "Dhamai" and presentation of a sword of honour was so widely circulated in the Hill Tracts that Konjoys's family title "Manraja" was absord and his name became prominent as being the 'holder of Dhamai'. Mong raja Konjoy was thus commonly known as Konjoy Dhamai.[১০৯]

অন্যান্য সমসাময়িক উৎস থেকেও কুঞ্জ ধামাই সম্পর্কে চমৎকার তথ্য পাওয়া যায়। *আহাদিসুল খাওয়ানিন* নামক একটি ফার্সি গ্রন্থে মং রাজাদের উদ্ভব সম্পর্কে চমৎকার তথ্য পাওয়া যায়। গ্রন্থের লেখক উনিশ শতকের বিশিষ্ট পণ্ডিত হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর লিখেছেন,

> আমার জানা একটা আশ্চর্য ঘটনা এই যে– মগ গোত্রের একটি লোকের নাম ছিল কোনছা দাহমায়ী। সে বাস করতো পাহাড়ের উত্তর অঞ্চলে। আমার পিতার জমিদারির অন্তর্গত ছিল তার বসতবাড়ি। সে আমার মরহুম পিতার অনেক খেদমত করেছিল। লোকটা ছিল বেশ বুদ্ধিমান। সে নিজের প্রাণঢালা খেদমত আর প্রতিভার বলে আমার পিতার দরবারে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করে। পিতা তার খেদমতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমাদের জমিদারির মধ্যে পাহাড়ি অঞ্চলের এক স্থানে জমিন ছিল কার্পাস চাষের বেশ উপযোগী। সে জমিনে কার্পাসের ফসল হতো। পিতা লোকটাকে আমাদের সরকার থেকে সে জমিন বন্দোবস্ত দিয়ে দেন। বিনিময়ে লোকটা খাজনা হিসেবে কিছু অর্থ আমাদের সরকারে জমা দিত। সে ছিল পিতার একান্ত অনুগত এবং তাঁর হুকুম পালনে তৎপর। কোনছা দাহময়ীর মৃত্যুর পরে তার পুত্র কিউজাছায়ী (ক্যজসাইন) তার উত্তরাধিকারী । কিন্তু ছেলেটি তখন নাবালক ছিল বলে তার ধন সম্পদ চলে যায় সরকারের তত্ত্বাবধানে। কিউজাছায়ী বেশ কিছুদিন থাকে সরকার বাহাদুরের আশ্রয়ে। সে এ সময় বাংলা ভাষায়ও কিছুটা ব্যুৎপত্তি লাভ করে। সাবালক হয়ে সে সরকারের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত ধন সম্পদ ফেরত পায়। কিছু দিনের মধ্যেই সে তার নিজ গ্রামের

> স্বগোত্রীয়দের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সে নিজেকে মানরাজা বলে দাবি করে। তার কোনো মুরুব্বির সহায়তায় সে সরকারি দপ্তরে মানরাজা নামটা লিখিয়ে নেয়।[১১০]

এছাড়া সম্ভ্রান্ত পরিবারের ত্রিপুরা রমণীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তিনি কর্ণফুলীর উত্তরাঞ্চলের ত্রিপুরাদের সমর্থন ও আনুগত্য লাভ করেন। অধিকন্তু ত্রিপুরা থেকে অভিবাসিত ত্রিপুরারাও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে বলে উল্লেখ আছে।[১১১] ১৮২৬ সালে কুঞ্জ ধামাইয়ের মৃত্যুর পর তার পুত্র ক্যঅজ সাইন (১৮২৭-১৮৭০) পিতার উত্তরাধিকার লাভ করেন। তবে তিনি তখন মাত্র ৭ বছরের বালক। তাই তাঁর চাচা আইতান্যাকে রিজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে সরকার তাঁর অধীন মহল 'কোর্ট অব ওয়ার্ডসে'র অধীনে নিয়ে নেয়। ১৮৪০ সালে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পরে ক্যঅজ সাইন মং পিতার ধন-সম্পত্তি ও প্রশাসনিক দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি এসময় দক্ষিণের বোমাং রাজপরিবারে গোলযোগ দানা বেধেছে। ক্যঅজ সাইন পিতার মতোই সৎ স্বভাব ও সদগুণের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহ লাভ করে ১৮৪৮ সালে সর্বপ্রথম পার্বত্য ভূখণ্ডে 'মং' নামে একটি জুমকর বন্দোবস্ত রাজস্ব নথিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯০৪ সালের সরকারি পত্রে বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ আছে।

> In 1848 a ten years' settlement of Palang tha Mugh Mahal was given to the Chief then for the first time called Mong, for Rs. 1,021. This was renewed for one year in 1857, again for ten years in 1858, and again in 1869 for one year. In 1871 other mahals were included in the settlement on a jama of Rs. 3,187-12.[১১২]

ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে পৃথক জেলা গঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ১৮৮১ সালে মং রাজা কেওজাপ্রু (১৮৭৯-১৮৮৩) নবসৃষ্ট মং সার্কেলের প্রথম সার্কেল চিফ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। হাচিনসনের বক্তব্য দিয়েই এ প্রসঙ্গটি শেষ করা যায়।

> Since our occupancy of the country a third chief, who is also a Magh, belonging to the Palaingsa clan, has been appointed, and administers the northern portion of the district. He is known by the title of the Mong Raja.[১১৩]

উপসংহার

এ যাবৎ ক্যাপ্টেন টমাস হার্বাট লুইনের বক্তব্য অনুসারে বলা হতো, ১৮৬০ সালের আগে ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি। চট্টগ্রাম বিভাগের প্রথম কমিশনার ন্যাথানিয়েল জন হেলহেডের (১৮২৯-৩২) উদ্ধৃতি দিয়ে ক্যাপ্টেন লুইনই লিখেছেন যে, ''He (Halhed) finds that the hill tribes are not subjects but tributaries, "I do not recognize any right on our part to interfere with their internal arrangements. We have no authority in the hills: " [অর্থাৎ পাহাড়ি জাতিগুলো প্রজা নয়, বরং করদপ্রজা। তাই তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমাদের (ব্রিটিশদের) আছে বলে তিনি মনে করেন না।'] উপর্যুক্ত আলোচনার পর একথা বলা অযৌক্তিক নয় যে, ১৭৮৯ সাল এমনকি ১৭৭৬ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত ঘটনাসমূহের সাথে ঔপনিবেশিক সরকারের সংশ্লিষ্টতা ও মদদ ছিল। কার্পাস মহলের রাজস্ব বন্দোবস্তে জমার পরিমাণ সরকারই নির্ধারণ করত রাজারা নয়। উনিশ শতকের অর্থনীতি মোটাদাগে ভূমি রাজস্ব নির্ভর। ফলে একটি এলাকার বন্দোবস্তের

প্রকৃতি ও রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বোমাং রাজাদের সাথে যেভাবে বন্দোবস্ত করা হয়েছে তা ওই একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে এবং উত্তরাধিকার সংকটের জন্ম দেয়। চাকমা রাজা ধরম বক্স খাঁর উপর অতিরিক্ত করের বোঝা আরোপ করলে তাঁকে মার্কুইস অব হেস্টিংসের নিকট পিটিশন দিয়ে প্রতিকার চাইতে হয়। রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা যাওয়ার পর পাটরানী হওয়া সত্ত্বেও রানি কালিন্দীকে প্রথমাবস্থায় প্রয়াত স্বামীর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে দ্বিতীয় রানির কন্যার নামে চাকমা মহলের দায়িত্ব কোর্ট অব ওয়ার্ডসের (প্রতিপাল্য সভা) হাতে ন্যস্ত করে গৃহবিবাদের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। ফলে উত্তরাধিকার ফিরে পেতে রানি কালিন্দীকেও আইনের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার কেবল রাজস্বকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ এক যুগ ধরে চাকমা ভূখণ্ডকে রাজা ও নেতৃত্বহীন করে রেখেছিল। রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী কে হবেন তা প্রচলিত নিয়মে (Law of primogeniture) রাজপরিবারেরই ঠিক করার কথা। কিন্তু ব্রিটিশদের করদ রাজা হওয়াতে স্বাধীনভাবে সে-সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা কোনোটাই দেওয়া হয়নি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় রাজাদের। ব্রিটিশ সরকারের স্বীকৃতির দিকে মুখিয়ে থাকতে হতো রাজা হিসেবে অনুমোদন পাওয়ার জন্য। অন্যদিকে মং রাজার উত্থানের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে উনিশ শতকের ষাটের দশকে মং রাজার প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয় যা হাচিনসনের উক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে। বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, মং রাজাদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল পৃষ্ঠপোষকতার; কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য দুই রাজার প্রতি সরকারের নীতি ছিল বৈরিতার। পরিশেষে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের ৪৮ নং অনুচ্ছেদে ব্রিটিশদের রাজা বানানোর এখতিয়ারটি পরিষ্কারভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়। বলা হয়: ''The investiture of the Chiefs is regulated by the Bengal Government''। এভাবে উনিশ ও বিশ শতকের বাংলার একটি সীমান্তবর্তী জেলার স্থানীয় রাজাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগকে ঔপনিবেশিক শাসকরা সুকৌশলে ব্যবহার করেছে এবং 'হস্তক্ষেপ না-করা' নয় বরং 'যাচিত-অযাচিত' হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে তাদের উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তুলেছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা:

১ Capt. T. h. Lewin, *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein with Comparative Vocabularies of the Hill Dialects* (Calcutta: Bengal Printing Company Ltd. 1869), পৃ. ২২

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩ (ক) 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশবিরোধী গেরিলা যুদ্ধ, ১৭৭৬-১৭৮৭', আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *মুক্তির সংগ্রাম* (ঢাকা, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০১২), পৃ. ৩৭-৪০

(খ) Alamgir Muhammad Serajuddin, *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong 1761-1785 (*Chittagong: University of Chittagong,1971)

(গ) Ratan Lal Chakraborty, "Chakma Resistance to Early British Rule" in *Journal of Bangladesh Historical Studies,* Dhaka, 2 (1977), পৃ. ১৩৩-১৫৬

(ঘ) সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলিকাতা: বুক ওয়ার্ল্ড, ১৯৮৮), পৃ. ৬৬-৭১

(ঙ) Suniti Bhusan Qanungo, *Chakma Resistance to British Domination* (Chittagong: Published by Author,1998)

৪ আনন্দ বিকাশ চাকমা, ''সরকারী নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৮৬০-২০০০ খ্রি.'', পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮

৫ i. *List of Correspondence regarding the Chakma Raj of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong*. ii. *Joint Reply of the Three Chiefs of the Chittagong Hill Tracts To Mr. Mills' Report* (1929), iii. Family History of Mong Raja. iv. Ahdith al-Khwanin or Tarikh-i-Chatgram. *Bangladesh District Records, Chittagong*, Vol. 1, 1760-1787. Dacca: University of Dacca, 1978. v. Henry Rickets, ''Report on the Forays of the wild tribes of Chittagong Frontier.'' in *Selections from the Records of the Bengal Government*, N. XI, Calcutta: 1853, পৃ. ৭৮-১০০

৬ Harry Verelst, *A View of the Rise, Progress and the Present State of English Government in Bengal* (London: Bookfeller to His Majesty, 1772), পৃ. ৬৯

৭ Alamgir Md. Serajuddin, *The Revenue Administration of the East India Company,* পৃ. ১২, ১৫

৮ Serajul Islam (ed.), *Bangladesh Dist. Records,* Entry No. 1.13 পৃ. ৬৫

৯ Jagadis Gan-Chaudhury (ed.), *Tripura: The Land and its People*. (Delhi: Leeladevi Publications, 1980), পৃ. ৩২

১০ L. S. S. O' Malley, *Eastern Bengal District Gazetteer: Chittagong* (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot. 1908), পৃ. ৩৭

১১ W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal Vol. VI* (Delhi: D K Publishing House, Reprint, 1973, first published, London, 1876), পৃ. ২১

১২ To Hon'ble Henry Van Sittart Esqr President and Governor of Council of Fort William, From Harry Verelst, Randolph Marriot Thomas Rumbold, Islamabad, 16th February, 1761, *Bangladesh Dist. Records*, পৃ. ১২৩

১৩ মাহ্‌বুব-উল্ আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস : কোম্পানী আমল* (চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৬ ১ম মুদ্রণ, ১৯৪৭), পৃ. ৬৫

১৪ H. J. S Cotton, *Memorandum on the Revenue History of Chittagong* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1880), পৃ. ৭, ১৮; Alamgir Md. Serajuddin, *The Revenue Administration,* পৃ. ১৪৯

১৫ Govt. of Bengal. Resolution. Political. Dated Fort William, the 20th November, 1869. *List of Correspondence Regarding Chakma Raj of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong.* পৃ. ১৮

১৬ Willem van Schendel (ed.), *Francis Buchanon in Southeast Bengal (1798*) (Dhaka: University Press Ltd., 2nd Impr. 2008, 1st Published in 1992), পৃ. ৪৮

১৭ Alamgir Md. Serajuddin, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭

১৮ Henry Rickets, ''Report on the Forays of the wild tirbes of Chittagong Frontier.'' পৃ. ৭৮-১০০

১৯ R. H. Sneyd Hutchinson, *An Account of Chittagong Hill Tracts,* পৃ. ১১১

২০ P. J. Marshall, 'The Shaping of the New Colonial Regime in Bengal', in: Mahmudul Huque (ed.), *Bangladesh: History, Politics, Economy, Society and Culture* (Dhaka: University Pres Ltd., 2016), পৃ. ১৫-৪০

২১ H. J. S. Cotton, *Memorandum on the Revenue History of Chittagong* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1880), পৃ. ১৪-১৫

২২ সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো* (ঢাকা: চয়নিকা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১৩), পৃ. ৭২-৭৩

২৩ Suniti Bhushan Qanungo, *Chakma Resistance to British Domination,* পৃ. ২১

২৪ Suniti Bhusan Qanungo, *Chakma Resistance to British Domination*, পৃ. ৩১

২৫ Capt. T. H. Lewin, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২

২৬ H. J. S. Cotton, *Memorandum on the Revenue History of Chittagong*, পৃ. ১৮৯

২৭ Suniti Bhusan Qanungo, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৩

২৮ Ratan Lal Chakraborty, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩-১৫৬

২৯ Alamgir Serajuddin, "The Origin of the Rajas of Chittagong Hill Tracts and their Relations with the Mughals and the East India Company in the eighteenth century" in *Journal of the Pakistan Historical Society,* January, 1971, pp. 51-60

৩০ Francis Buchanan, পৃ. ১০৬

৩১ To- The Hon'ble Warren Hastings Esqr, Governor-General & Council of the General Department at Fort Willam, Dated Islamabad The 10th April, 1777. *Bangladesh Dist. Records*. পৃ. ২৩৮-২৩৯

৩২ Letter from James Iwin, Collector of Chittagong to Calcutta Revenue Committee dated 29 March, 1784, Calcutta Revenue Committees Consultations 6 May, 1784, P/68/32, India Office Records. Cited in Anandaroop Sen, "Early Years of East Indica Company Rule in Chittagong: Violence, waste and settlement 1760-1790," *The Indian Economic and Social History Review,* Vol. 55 (2), 2018, pp. 147-181

৩৩ H. J. S. Cotton, *Memomrandam of Revenue History*, পৃ. ১৮৯

৩৪ Sirajul Islam (ed.), "Protest Movements and Insurgencies in the eighteenth and nineteenth centuries" in: *History of Bangladesh 1704-1971* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2018), পৃ. ১১৭-১৪৪

৩৫ সিরাজুল ইসলাম, "পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ", পৃ. ৩৭-৪০

৩৬ Alexander Mackenzie, *The North-East Frontier* (Delhi: Mittal Publications, Reprinted in 1979), পৃ. ৩৩২

৩৭ সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলিকাতা: বুক ওয়ার্ল্ড, অষ্টম সংস্করণ, ২০০০), পৃ. ৬৭-৭১

৩৮ *Selections from the Records of the Bengal Government N. XI Calcutta, 1853,* পৃ. ৭৯

৩৯ Henry Rickets, ''Report on the Forays of the wild tirbes of Chittagong Frontier.'', পৃ. ৭৮-১০০

৪০ Ibid*, &* Alexander Mackenzie, পৃ. ৩৩২

৪১ R H S Hutchinson, *Eastern Bengal District Gazetteer: Chittagong Hill Tracts* (Delhi: Vivek Publishing Company, 1978, 1st Pub. 1909), পৃ. ২৪

৪২ *Francis Buchanan*, পৃ. ৩৪

৪৩ *ঐ*, পৃ. ১০৭, ১২০

৪৪ Henry Rickets, *প্রাগুক্ত।*

৪৫ Sir Roper Lethbridge (ed.), *The Golden Book of India: A Genealogical and Biographical Dictionary of the Ruling Princes, Chiefs, Nobles and other personages Titled or Decorated of the Indian Empire* (London & New York: Mackmillan, 1893), পৃ. ৩৮৯

৪৬ *Francis Buchanan*, পৃ. ২৮

৪৭ ঐ, পৃ. ৮৭

৪৮ Alamgir Md. Serajuddin, *The Revenue Administration of the East India Company,* পৃ. ১২০

৪৯ *Francis Buchanan*, পৃ. ৭৬

৫০ In consequence of this we gave public notice that whoever would procure inhabitants from other countries, and with them undertake the clearing and cultivating these lands, or any part, should enjoy the same free of rent for five years. Letter Date on. 16th February, 1761. H. J. S. Cotton, *op. cit*., পৃ. ৯

৫১ Alamgir Md. Serajuddin*, op., cit.,* পৃ. ১২৬-১২৭

৫২ John MacRae, ''Account of the Kookies or Lunctas.''*Asiatic Researches*, Vol. 7 (1801), pp.183- 98, cited by Lorenz G Loffler, "A Note on the History of the Marma Chiefs of Banderban'' in *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Vol. 13(2), 1968, pp. 189- 201.

৫৩ Henry Rickets, *Report*, পৃ. ৮০

৫৪ *ঐ*, পৃ. ৮০

৫৫ Govt. of Bengal. *Selections from the correspondence on the Revenue administration of the Chittagong Hill Tracts* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1887), পৃ. ২

৫৬ Wolfgang Mey (ed.), *J. P. Mills and The Chittagong Hill Tracts, 1926/27* p. 64. Mills wrote: Antropology rarely finds a place in Government files but it sometimes provides the key to a problem nevertheles. It certainly shows beyond a shadow of doubt what is the primitive basis of the Chieftainship we find here. The whole material culture of the tribes of the Chittagong Hill Tracts, under a superficial layer of Bengali and Buddhist culture, is purely and typically Indonesian. They have the typical Indonesian tension-loom, the typical fire-tong, the typical fish-trap lined with cane-thorns, houses, types of hearths, traps, method of cultivation and so on.

৫৭ Capt. T. H. Lewin, *Wild Races of South-Eastern India* (Mizoram: Firma KLM Pvt. Ltd., 1978, First Publised in London: W. H Allen and Co., 1870), পৃ. ১০৭

৫৮ Willem Van Schendel, *op.cit.,* p. xiv

৫৯ Willem van Schendel (ed.), *Francis Buchanan,* পৃ. ৩৩-৩৪

৬০ Capt. T. H. Lewin, *Wild Races,* পৃ. ৫৪

৬১ *প্রাগুক্ত*

৬২ ভক্ষগাং মে, *পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌম সমাজ : একটি আর্থ-সামাজিক ইতিহাস*, অনু., স্বপ্না ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) (কলিকাতা: ফার্মা কে এলএম প্রা. লি. ১৯৯৬), পৃ. ১৭।

৬৩ After the death of Krishno Manikya, quarrels broke out over succession. There were mainly two claimants to the throne—Rajdhar Manikya, the nephew of Krishna Manikya and Durgamoni, the son of Lakshman Manikya. ... The dispure between Rajdhar Manikya and Durgamoni Thakur was finally settled by Warren Hastings in 1785, who declared Rajdhar the King and Durgamoni the Yubaraj respectively. After the death of Rajdhar Manikya in 1804, the quarrels again broke out on the same issue. The succession of Ramganga Manikya, the son of Rajdhar Manikya, was challenged by Durgamoni. – see. Jagadis Gan-Chaudhuri (ed.), *Tripura: The Land and its people* (Delhi: Leeladevi Publications, 1980), pp. 33-34. A five-year interregnum followed his death during which anarchy prevailed in the state, with various contenders for the throne inviting the Kukis

for their own ends. Ultimately in A.D. 1808 the English recognized Durga Manikya (A.D. 1809-13) and invested him as raja. Since that date every raja received investiture from the English.Omesh Saigal, *Tripura: Its History and People* (Dehli: Concept Publishing Company, 1978), পৃ. ৩৯

৬৪ Willem van Schendel (ed.), *Francis Buchanan,* পৃ. ১০১

৬৫ ঐ, পৃ. ১১৫

৬৬ ঐ, পৃ. ১০৭

৬৭ Letter No. 2082. To the Secretary to the Government of India, Judicial Department Dated 1st July 1823 from Secretary to the Board of Revenue. *List of Correspondence regarding the Chakma Raj of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong,* Records preserved in Tribal Cultural Institute, Rangamati. *List of Correspondence,* পৃ. ১৯

৬৮ Govt. of Bengal, Resolution, Political, Forth William, the 20th November, 1869, *List of Correspondence,* পৃ. ২২

৬৯ *List of Correspondence*, পৃ. ১৯

৭০ Govt. of Bengal. *Op.cit.*

৭১ Letter no. 844 To J Pattle, W. Paton, and W. Trower, Esqrs., Members of the Board of Revenue, in the Lower Provinces from Holt Mackenzie, Secretary to the Government, Fort William, The 4th September, 1823

৭২ জে. ই. হার্ভে ১৮৩১ সালে চট্টগ্রামের কালেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৩৪ সালে ছিলেন নবগঠিত চট্টগ্রাম ডিভিশনের অস্থায়ী কমিশনার আর ১৮৩৭ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। হেনরি কটনের মতে, তাঁর নীতি ছিল বড্ড একগুঁয়ে। তাঁর ভাষায়, It was policy of Mr. Harvey to give a "strict, harsh, and often overstrained construction" to all forms of procedure that might be interpreted in favour of Government. পৃ. ১১৮

৭৩ Letter No. 832. From Commissioner of 16th Division and Sudder Board to Collector of Chittagong. Commissioner's Office, Chittagong. The 26th August, 1842

৭৪ ১৭৯০ সালে ২৮ আগস্ট কোর্ট অব ওয়ার্ডস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ সালের রেগুলেশনে স্বীকৃত হয়। এটি নাবালক, স্ত্রীলোক, অক্ষম জমিদারের জমিদারি সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের দায়িত্ব ছিল রিজেন্ট বা অভিভাবক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্তরা যাতে যোগ্যতা, পরিশ্রমশীলতা ও বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করে তা তদারকি করা। পাশাপাশি ঐসকল নাবালক উত্তরাধিকারীরা দায়িত্বপ্রাপ্তদের হীনস্বার্থে নিরক্ষর ও বিলাস ব্যসনে আসক্ত হয়ে অধঃপথে না যায় এবং তাদের মর্যাদা ও জীবনযাত্রার সাথে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে তার যথাযথ ব্যবস্থা করা ছিল কোর্ট অব ওয়ার্ডস প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। - H. J. S. Cotton, Memorandum, পৃ. ১৯৯

৭৫ সতীশ চন্দ্র ঘোষ, চাকমা জাতি (কলকাতা: অরুণা প্রকাশন, ২০১০, ১ম প্রকাশ, ১৯১০), পৃ. ৬৭

৭৬ W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* Vol. 6, পৃ. ৯২

৭৭ *List of Correspondence*, পৃ. ২৩

৭৮ Instead of Mr. Havey's policy of attempting to overcome evasion by stratagem, of demarcating to the quick so as to detect fraud and exact the full right of government, Sir Henry Ricketts adopted the policy of patience with firmness, of studiously open frankness, and of conciliatory adjustments. It was not possible for him to redress all the grievances occasioned in Mr. Harvey's time, but, as far as was possible, he did so, considering it his duty to benefit the people as well as the exchequer. Cotton, *op. cit*., পৃ. ১২২

৭৯ Letter no. 832. From the Commissioner of 16th division and Sudder Board To the Collector of Chittagong, Dated 26 the August 1842 *List of Correspondences,* পৃ. ১২

৮০ From The Secretary to the Board of Revenue, L. P To The Commissioner of Revenue for the Division of Chittagong, Fort William, 7 March, 1855) *List of Correspondences*, পৃ. ১৩

৮১ Government of Bengal, Revenue Department, *Selections from the Correspondence on the Revenue Administration of the Chittagong Hill Tracts 1862-1927(Calcutta: Bengal Government Press*, 1929), পৃ. ১৯-২০

৮২ Willem van Schendel, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

৮৩ R. H. S. Hutchinson, *An Account*, পৃ. ৯৪

৮৪ শ্রীকামিনী মোহন দেওয়ান, *পার্ব্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী* (রাঙামাটি: দেওয়ান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৭০), পৃ. ১৮-২২

৮৫ Subir Bhaumik, *Insurgent Crossfire North-East India* (New Delhi: Lancer Publishers Pvt. Ltd, 1996), পৃ. ৫৭

৮৬ Omesh Saigal, *Tripura,* পৃ. ১০৮

৮৭ শ্রীকামিনী মোহন দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৮৮ তাঁর তিনজন স্ত্রী, এদের গর্ভে জন্ম নেয় তাঁর ছয়পুত্র ও ছয় কন্যা; তাঁর সকল মেয়েই বিবাহিত, তিনপুত্রও বিবাহিত। তাঁর আছে প্রায় বিশ জন হিন্দু ভৃত্য, তার অধিক মুসলমান আছে। তাঁর দিওয়ান বা মন্ত্রীও ঐ ধর্মের। তাঁর বাবুর্চি বা কেয়ারটেকার হল রাজবংশী। বিবাহিত তিনপুত্র এবং অবিবাহিত সকলে একই বাসায় বাস করে। তাঁর বিশাল পরিবারে আরও আছে মারমা দাসদাসী। পৃ. ৮৯

৮৯ Francis Buchanan, পৃ. ৯৩

৯০ ভক্ষগাং মে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

৯১ চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট ই. এইচ. লুসিংটন এসব হামলার তালিকা প্রণয়ন করেছেন যা হেনরি রিকেটসের রিপোর্টে সংযুক্ত আছে , পৃ. ৯৩-৯৪

৯২ Hutchinson, *An Account*, পৃ. ১১০

৯৩ *Selections,* 1929, পৃ. ৬৪

৯৪ Henry Rickets, *Report*, পৃ. ৮১

৯৫ W. W. Hunter, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৬

৯৬ ভক্ষগাং মে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৯৭ Henry Rickets, ''Report on the Forays of the wild tirbes of Chittagong Frontier in 1847'', পৃ. ৮১-৮২

৯৮ Lorence G Loffler, ''A Note on the History of the Marma Chiefs of Banderban'' in: *Journal of Asiatic Society of Pakistan*, Vol XIII, No. 2, 1968, পৃ. ১৮৯-২০১

৯৯ Henry Rickets, *op. cit*., পৃ. ৮৬

১০০ Henry Rickets, *op. cit*., পৃ. ৮৮

১০১ ঐ, পৃ. ৯৬

১০২ ঐ, পৃ. ৯৭

১০৩ Letter no. 421. Date, Chittagong, 12 Nov. 1868. From- Lord H. Ulick Brown, Officiating Commissioner of Chittagong, To- The Secretary to the Govt. of Bengal, Political Department. *Selections* (1887), পৃ. ২

১০৪ *Joint Reply of the Three Chiefs*. পৃ. ৩

১০৫ Francis Buchanan, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

১০৬ H. J. S. Cotton, *Op. cit*., Appendix –Y, পৃ. ২২৭

১০৭ Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts Gazetteer*, পৃ. ১৭

১০৮ *The Golden Book of India: A Genealogical and Biographical Dictionary of the Ruling Princes, Chiefs, Nobles and other Personages, Titled or Decorated of the Indian Empire* (London: Macmillan and Co. And New York, 1893), পৃ. ৩৮৯

১০৯ True Copy, *The Calcutta Gazette*, May 14, 1936, *Family History of the Mong Raja*, পৃ. ৪। রাজশাহীর হেরিটেজ আর্কাইভসে এক কপি সংরক্ষিত আছে।

১১০ মৌলভী হামিদুল্লাহ্ খান বাহাদুর, *আহাদিসুল খাওয়ানিন*, অনু.খালেদ মাসুকে রসুল (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ.৭৬

১১১ *Joint Reply of the Three Chiefs*, পৃ. ২১

১১২ *Selections (*1929), পৃ. ৩২২

১১৩ R. H.S Hutchinson, *An Account*, পৃ. ২৪

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, আটত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৭/ডিসেম্বর ২০২০

ঋত্বিক ঘটক : উন্মূল জীবনের সেলুলয়েড-রূপকার

অনন্ত মাহফুজ*

সারসংক্ষেপ

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবাদপুরুষ ঋত্বিক ঘটক দেশভাগ এবং দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে মানুষের মানসিক ও রাজনৈতিক সংকট তাঁর চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন। ঋত্বিক ঘটক বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সাতচল্লিশের রাজনৈতিক পট পাল্টে যাওয়ায় ঋত্বিকের পরিবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়। নিজ আবাস ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার কষ্ট তাকে সারাজীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। বিচ্ছিন্নতার এই বোদনা এবং ভারত ও তৎকালীন পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের মাতৃভূমি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার কষ্টগুলো তিনি নিজের জীবনের ভিতর দিয়ে অনুভব করেছেন। শুধু বেদনাবোধ নয়, এই বিভাজনের সুদূরপ্রসারী প্রভাবকেও তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন ঋত্বিক। তার নির্মিত *বাড়ি থেকে পালিয়ে*, *মেঘে ঢাকা তারা*, *কোমল গান্ধার*, *সুবর্ণরেখা*, *যুক্তি তক্কো গপ্পো* ইত্যাদি সাতচল্লিশের দেশভাগ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র। আর কোনো চলচ্চিত্রকার এই একটি বিষয়কে উপজীব্য করে দীর্ঘ সময় ধরে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেননি। দেশভাগের কারণে শেকড়হীন মানুষের দুর্ভোগ, মানবিক ও মানসিক বিপর্যয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের চিত্র অসাধারণ দক্ষতার সাথে সেলুলয়েডে তুলে ধরেছেন ঋত্বিক ঘটক।

"ঋত্বিক ঘটকের কাহিনিধর্মী পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের অধিকাংশ দেশভাগ-দেশত্যাগ পরবর্তী পশ্চিম বাংলার সমসাময়িক জীবনপ্রবাহ ও সমাজবাস্তবতা অবলম্বন করে নির্মিত। তার কাছে চলচ্চিত্রকলা দেশভাগ সম্পর্কে তার নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ, দেশভাগ তথা বাংলা ভাগোত্তর সমাজবাস্তবতা তুলে ধরা, উপনিবেশ-উত্তর সমাজবাস্তবতায় বিভিন্ন শ্রেণি ও বাস্তুত্যাগী মানুষের মনোজগৎ চিত্রিত করার মাধ্যম বলে বিবেচিত হয়েছিল।"[১]

ঋত্বিক ঘটকের বেশির ভাগ চলচ্চিত্রে বাস্তুহারা মানুষের অবর্ণনীয় মানবিক ও মানসিক যন্ত্রণা, দেশভাগ, পরবর্তী উন্মূল মানুষের মানবিক জীবনের বিপর্যয় ও টিকে থাকার সংগ্রাম চিত্রায়িত হয়েছে। এক ভাষা-সংস্কৃতির ভূখণ্ড ভাগ হয়ে রাজনৈতিকভাবে দুটি দেশে পরিণত হওয়া এ অঞ্চলের মানুষের ভিতর গভীর বেদনার জন্ম দেয়। স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে উপমহাদেশ বিভাজন ঠেকানোর রাজনৈতিক সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধর্মকেন্দ্রিক দুটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জায়গায় স্থানান্তর মানুষকে বাস্তুহীন করে।

ব্যক্তি ঋত্বিক ঘটককেও নিজের জন্মস্থান ফেলে চলে যেতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। অযৌক্তিক দেশভাগের কারণে লক্ষ মানুষের সার্বিক যন্ত্রণা তিনি নিজে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। উন্মূল মানুষের জীবনের ছবি তিনি তুলে এনেছেন তার চলচ্চিত্রে। এ কারণে বাংলা চলচ্চিত্রের

* অনন্ত মাহফুজ (মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান), (সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি), উপ-পরিচালক, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

ইতিহাসে ঋত্বিক ঘটক বাস্তুহীন জীবনের এক অসাধারণ রূপকার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। ঋত্বিক ছিলেন যুগসচেতন চলচ্চিত্রকার, গল্পকার, নাট্যকার এবং অভিনেতা। ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর ঢাকার ঋষিকেশ দাশ লেনে ঋত্বিক ঘটকের জন্ম। ইন্দুবালা দেবী ও সুরেশ চন্দ্র ঘটক দম্পতির ১১তম সন্তান। ঋত্বিক ঘটকের স্কুল জীবন শুরু হয় ময়মনসিংহের মিশন স্কুলে। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন ঋত্বিক। তার পিতা সুরেশ চন্দ্র ঘটক ছিলেন ঢাকার ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সরকারি চাকরির সুবাদে তারা ঘুরেছেন দেশের নানা প্রান্তে। চাকরি থেকে অবসরের পর রাজশাহীতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাড়ি করেন সুরেশ চন্দ্র ঘটক। ঋত্বিক ঘটকের জীবনের একটা বড়ো সময় কেটেছে রাজশাহী শহরে। তিনি রাজশাহীর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে তিনি বহরমপুরে বড়ো ভাই মনীষ ঘটকের কাছে চলে যান। সেখানে তিনি কৃষ্ণ নারায়ণ কলেজে পড়াশুনা করেন। ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় ঘটক পরিবারকে জন্মস্থান ছেড়ে চলে যেতে হয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। জন্মস্থান, শৈশব আর কৈশোরের মাটি আর মানুষের স্পর্শ ত্যাগ করে তারা চলে যান অন্য স্থানে। এই বেদনাবোধ তাকে সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে।

নাটকের জগৎ থেকে ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্রে পা রাখেন নিমাই ঘোষের *ছিন্নমূল* (১৯৫১) সিনেমার মধ্য দিয়ে। এই ছবিতে তিনি একই সাথে অভিনয় এবং সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর দুই বছর পর তার একক পরিচালনায় মুক্তি পায় *নাগরিক*। দেশভাগের ট্রমা তাকে এই বিষয়টির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তির অপার ক্ষতির কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। নিজের পরিবারের দেশত্যাগ এবং নিজের জন্মস্থান ছেড়ে যাওয়া ঋত্বিককে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। অযৌক্তিকভাবে মাতৃভূমির বিভাজনও তার মনে গভীর রেখাপাত করে। লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস্তুত্যাগ, সহায়সম্বল হারিয়ে উদ্বাস্তু জীবনযাপন, নতুন ঠিকানায় নতুন করে কাজের খোঁজ, স্থিতু হবার সংগ্রাম ঋত্বিক প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন দেশভাগের কারণে উন্মুল ও পরিচয়হীন মানুষের মানবিক বিপর্যয়। হাজার বছরে গড়ে ওঠা ভাষা-সংস্কৃতি, সহাবস্থান ও ভ্রাতৃত্ববোধ কেবল ধর্মবিশ্বাসের কারণে বিনষ্ট হতে পারে, এটা তিনি কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারেননি। ধর্মের সুবিধাটা যে স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদ, এলিট ব্যবসায়ী এবং তথাকথিত ভদ্রলোকরা নিয়েছিলেন সে বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ নেই। জয়া চ্যাটার্জী লিখেছেন:

> হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গার ফলে ১৯৪৭ সালে বাঙলা আবার ভাগ হল। কিন্তু এ সময় প্রায় কারও কণ্ঠেই প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হল না, বরং, দ্বিতীয়বার বাঙলা ভাগ নিশ্চিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত হল–যার লক্ষ্য ছিল ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশকে ভাগ করা। এই আন্দোলনে বাঙালি সমাজের সেই শ্রেণীর লোকেরাই নেতৃত্ব দেয়, যারা বাঙলার প্রথম বিভাগের সময় থেকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে আসছিল, যাদের পরিচিতি ছিল তথাকথিত ভদ্রলোক বা 'সম্মানিত লোক'।[২]

ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা থেকে দ্বি-জাতি তত্ত্বের উদ্ভব। জাতি এবং ধর্ম দুটোকে গুলিয়ে ফেলার খেসারত দিতে হয়েছে এ জনপদের মানুষকে। হিন্দু এবং মুসলমান দুই জাতি–এ রকম উদ্ভট যুক্তি দিয়ে ভাগ হয়ে যায় এমন একটি অঞ্চল যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ বাস করে। এদের নিজেদের আছে হাজার বছরের পুরনো নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ধর্মীয় পার্থক্য বাদ

দিলেও ভাষা এবং সংস্কৃতির অনেক উপাদানে অভিন্নতা আছে। আছে বহুকাল পাশাপাশি বাস ও সহমর্মিতার দীর্ঘ ইতিহাস। উপমহাদেশের অধিকাংশ হিন্দু আর মুসলমান। কিন্তু বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টানও তো আছে। এছাড়া আছে শিখ ধর্মাবলম্বীরা। অথচ উপমহাদেশ ভাগের ক্ষেত্রে মাথায় রাখা হয় কেবল হিন্দু আর মুসলমানদের! মূলত দেশভাগের পিছনে ছিল রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও ধর্মীয় এলিটদের সুবিধাবাদ। এসব বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋত্বিক তাঁর চলচ্চিত্রে তুলে এনেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রের বিষয় সম্পর্কে লিখেছেন, "বঙ্গভঙ্গটা, নাটক বলুন, ফিল্ম বলুন, চিন্তা বলুন, ঋত্বিকের সব কিছুর মধ্যে একটা বড়ো ভূমিকা নিত। তার মন ওখানেই নোঙর বেঁধেছিল। এবং এটা একটা তার obsession-এর মতো দাঁড়িয়েছিল।"[৩]

বাংলা ভাগ ও লক্ষ লক্ষ মানুয়ের স্থানান্তর, কাছের মানুষগুলো হঠাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাগরিক হয়ে যাওয়া এবং এই ভাগ ও স্থানান্তরের ফলে মানসিক, মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাতের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের বিষয়টি ঋত্বিক খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি 'বাংলাভাগের গভীর ফাটল থেকে উঠে আসা এক চারণ চলচ্চিত্রকার'।[৪] তাঁর পরিচালিত ৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে ৬টি চলচ্চিত্রের বিষয় প্রত্যক্ষভাবে বাংলা বিভাজন এবং এর ফলে উন্মুল মানুষের মানবিক ও মানসিক সংকট, শেকড়হীন মানুষের স্থায়ী হবার সংগ্রাম এবং অস্তিত্বহীনতাবোধ। *অযান্ত্রিক* ও *তিতাস একটি নদীর নাম* বাদ দিলে ঋত্বিক ঘটকের প্রথম নির্মিত ছবি *নাগরিক* থেকে *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো* পর্যন্ত সবগুলো চলচ্চিত্রের বিষয় বাস্তুহীন মানুষ এবং দেশভাগ-পরবর্তী সংকট।

দুই.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত উপমহাদেশ ভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের নগর কোলকাতার উদ্বাস্তু মানুষের জীবন ও টিকে থাকার সংগ্রাম এবং এর সাথে মানবিক টানাপড়েন নিয়ে ঋত্বিক নির্মাণ করেন তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র *নাগরিক*[৫]। ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্র রামু বেকার, সর্বদা চাকরি খোঁজার চেষ্টারত। সে ক্রমাগত চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে যায়, কিন্তু চাকরি হয় না। সে আশাও ছাড়ে না। রামুর সঙ্গে তার মা, বাবা, ছোটো ভাই-বোনকে ঘিরে আবর্তিত হয় *নাগরিক*-এর কাহিনি। রামুর বাবা সুরেশ বাগচীর শিক্ষকতা থেকে অবসর নেওয়ার পর শ্যামপুকুরের সুপরিসর বাড়িতে তাদের আর থাকা সম্ভব হয় না। ফলে মধ্যবিত্ত এ পরিবারটিকে আশ্রয় নিতে হয় কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকার কম ভাড়ায় পাওয়া বাড়িতে। এখানেও বাড়িভাড়া বকেয়া পড়ে কারণ সুরেশ বাগচীর পেনশনের সামান্য টাকায় বেশ বড়ো একটি পরিবার চালানো কষ্টকর। এ কারণে রামুর মা একজন পেয়িংগেস্ট রাখার চিন্তা করে। সাগর চলে আসে রামুদের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকার জন্য। সাগরও বেকার, চাকরি খুঁজছে। সাগর চাকরি পেয়েও যায়। রামুর জায়গাটি কিছুটা পূরণের চেষ্টা হয় সাগরকে দিয়ে। সাগর অনুরক্ত হয়ে পড়ে রামুর বোন সীতার প্রতি।

চিত্র-১ : *নাগরিক* চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

রামুর স্বপ্ন ঝুলে থাকে মলিন দেয়ালে টানানো একটি ক্যালেন্ডারে। ক্যালেন্ডারটি রামুর জন্য আশার প্রতীক। রামুর প্রেমিকা উমাকেও সে ক্যালেন্ডার দেখায়, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায়। সংসারের অনটন ক্রমাগত বেড়ে চলে। রামু আর উমার সম্পর্ক ভেঙে যায়, শেফালী প্রলোভন আর অভাবে পতিতাবৃত্তি বেছে নেয়। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে এ বাড়িটিও ছাড়তে হয় রামুদের। বস্তিতে গিয়ে উঠতে হয়। সীতা বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে থাকতে পারবে না বলে সাগরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। সাগর তাকে ফিরিয়ে দেয়। রামুর আমন্ত্রণে সাগর, সীতা, উমা সবাই বস্তিতে থাকতে সম্মত হয়।

হয়তো রামুর আহবানে সবাই মিলে বস্তিতে থাকার সিদ্ধান্ত ঋত্বিকের নিজস্ব বিশ্বাস এবং যৌথ সমাজব্যবস্থার রূপক। রামুর কমিউনিস্ট বন্ধু সুশান্ত তাকে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার আহবান জানায়। শ্রমিকদের মিছিল রামুকে উদ্বেলিত এবং সাহসী করে। সে বুঝে যায়, সংগ্রামই অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ। রামু সীতাকে বলে, "... সবাই মিলে চিৎকার করে বলে উঠি, আর আমরা মরব না।" রামুর এই প্রত্যয় দর্শকদের আশাবাদী করে। সাজেদুল আউয়াল এই চলচ্চিত্র বিষয়ে লিখেছেন:

> ১৯৫২ সালের পশ্চিম বাংলার সমাজবাস্তবতা বহু কিছুর যোগফল: ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কা, পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), দেশভাগ (১৯৪৭), উদ্বাস্তুদের আগমন, অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পশ্চিম বাংলার স্থায়ী জনগণের শ্রেণিগত অবস্থানের নিম্নগতি–'নাগরিক'-এর সদ্য অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-শিক্ষকের পরিবারের জীবনযন্ত্রণার মাধ্যমে ঋত্বিক ঘটক সবকিছুকে তুলে ধরেছেন।[৬]

তিন.

উপমহাদেশ বিভাজন, বিশেষ করে বাংলা বিভাজন শুধু ভূখণ্ড বিভাজন ছিল না। খুব চতুরতার আশ্রয় নিয়ে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মে বিশ্বাসীদের দুটি জাতিতে ভাগ করার মধ্য দিয়ে মূলত ভাগ করা হয়েছিল সমবেদনা, সহমর্মিতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সামাজিক ঐক্য এবং ধর্মীয় সহাবস্থানকে। তাই ভবিষ্যতের বহু সময় ধরে বাংলা বিভাজনের রেশ এ অঞ্চলে থেকে যাবে। ধর্মীয় সম্প্রীতি ভাগ করে সাম্প্রদায়িক যে চরিত্র এ অঞ্চলে প্রোথিত করা হয়েছে তার ফলে দেশ

ত্যাগ করার মতো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এখনো। জন্মস্থান বা দেশত্যাগের ঘটনা নিয়ে শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস অবলম্বনে ঋত্বিক নির্মাণ করেন *বাড়ি থেকে পালিয়ে* চলচ্চিত্রটি।[৭] ১৯৫৯ সালে ছবিটি মুক্তি পায়। *বাড়ি থেকে পালিয়ে* বাড়ি-পালানো এক কিশোরের গল্প। ঋত্বিক এ চলচ্চিত্রে বাড়ি-পালানো এক কিশোরের মনোজগতে লালিত স্বপ্নের বাসস্থান, কল্পনার এক জগৎ উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন, উন্মুক্ত করেছেন নিজের শৈশব আর কৈশোরের চিত্রও। চলচ্চিত্রের কিশোর কাঞ্চনের কাজলদিঘি গ্রাম ঋত্বিকের পদ্মাপাড়ের ভারেঙ্গা। শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস থেকে কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে ঋত্বিক বলেন: 'I tried to incorporate the pre-war Bengal described by Shivram Chakraborty in portrayal of a post-war Bengal in my film.'[৮]

বাবার শাসন থেকে বাঁচতে ট্রেনে চেপে কলকাতায় পালিয়ে আসে কাজলদিঘি গ্রামের কিশোর কাঞ্চন। কলকাতায় তার সঙ্গে দেখা হয় হরিদাশের সঙ্গে। হরিদাশ বেকার, রাস্তায় বুলবুল ভাজা বিক্রি করে। হরিদাশও পালিয়ে এসেছে কলকাতায়, মায়ের খোঁজে। হারিদাশের সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব হওয়ার পরও কাঞ্চন আবার পালায়। পার্কের পাহারাদার আর বাউলের গান শোনে কাঞ্চন। পরিচালক খুব হিসেব করে বিপরীতধর্মী অর্থবোধকতার দুটো গান ব্যবহার করেছেন। পাহারাদারের 'নতুন গাছে নতুন নতুন ফুল ফুটিয়েছে...' এবং বাউলের 'আমি অনেক ঘুরিয়া শেষে আইলামরে কইলকাতা...' আমাদের ভাবিত করে। দেশভাগকে ইতিবাচক বা ভাগ্য পরিবর্তনের উপায় হিসেবে দেখা মানুষদের একজন পাহারাদার। অন্যদিকে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর একজন বাউল।

চিত্র-২: *বাড়ি থেকে পালিয়ে* চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

কাঞ্চনের সঙ্গে পরিচয় হয় ভিক্ষুক কিশোর অভি এবং বৃদ্ধার। অভি খুঁজে বেড়ায় হারিয়ে ফেলা বাবা-মাকে। বৃদ্ধাও কলকাতার রাস্তায় খুঁজে বেড়ায় তার হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে। এদিকে মিনির মা মারা যাওয়ার পর মিনিকে নিয়ে তার বাবা কলকাতা ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। কলকাতা 'লড়াইয়ের' জায়গা। হরিদাশ কলকাতায় থেকে যায় আবার কোনো কাঞ্চনকে উদ্ধার করবে বলে। কাঞ্চন গ্রামে ফিরে যায়। বাবা যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, "বাড়ির চেয়ে ভালো ঐ জায়গা?",

তখন কাঞ্চন বলে, বাড়ির চেয়ে ভালো কিছু নেই। এ চলচ্চিত্রে বাড়ি একটি প্রতীকী বিষয় যা উপমহাদেশের পারিবারিক ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করে। আবার বাড়ি না থাকা বা গৃহহীনতার পশ্চাতের কারণগুলোও চিহ্নিত করে। এর কারণ যে মানবসৃষ্ট এবং সদিচ্ছা থাকলে তা যে এড়ানো যেত, সে-রকম বক্তব্যও ঋত্বিকের চলচ্চিত্র থেকে পাওয়া যায়। এ কারণে *বাড়ি থেকে পালিয়ে* শুধু বাড়ি পালানো এক শিশুর মাধ্যমে নগর কলকাতার যান্ত্রিক জীবন ও অন্তঃসারশূন্যতাকেই তুলে ধরা নয়, উন্মূল জীবনের গভীরে প্রোথিত বেদনাবোধেরও চলচ্চিত্রায়ণ।

চার.

ঋত্বিকের বহুল আলোচিত সিনেমা *মেঘে ঢাকা তারা* মুক্তি পায় ১৯৬০ সালে। এর এক বছর পর মুক্তি পায় *কোমল গান্ধার* (১৯৬১) এবং পরের বছর *সুবর্ণরেখা* (১৯৬২)। এই তিনটি চলচ্চিত্রকে ট্রিলজি বা ত্রয়ী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যার মাধ্যমে কলকাতার তৎকালীন অবস্থা এবং উদ্বাস্তু জীবনের রূঢ় বাস্তবতা চিত্রিত করা হয়েছে। সমালোচনা এবং বিশেষ করে *কোমল গান্ধার* এবং *সুবর্ণরেখা*'র ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কারণে এই দশকে আর কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণ ঋত্বিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই তিনটি চলচ্চিত্রের বিষয় ১৯৪৭ সালের দেশভাগ তথা বাংলা বিভাজন। বাড়ি বা গৃহ ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। গৃহ কিংবা গৃহহীনতা, গৃহহীন মানুষ এবং ভাসমানতার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অভিঘাত অনন্যসাধারণভাবে শিল্পীর চোখে তুলে এনেছেন ঋত্বিক ঘটক।

শক্তিপদ রাজগুরুর "চেনামুখ" নামক গল্প অবলম্বনে দেশভাগ এবং দেশভাগের পরবর্তী সময়ে উন্মূল মানুষের বর্ণনাতীত যন্ত্রণা ও টিকে থাকার সংগ্রাম নিয়ে ঋত্বিক ঘটকের আবেগময় উপস্থাপন *মেঘে ঢাকা তারা*[৯]। উপমহাদেশ বিভাজনের পর পঞ্চাশের দশকের পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা এক স্কুলমাস্টারের পরিবার ঠাঁই পায় কলকাতার উপকণ্ঠে বস্তির মতো এক জায়গায়। বাড়িঘর ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবার পর নতুন 'স্বদেশে' স্কুলমাস্টার চক্রবর্তী মশায় অনেক কষ্টে একটা স্কুলে চাকরি জুটিয়ে নিতেও সক্ষম হন। তার সামান্য উপার্জনে সংসার চালানো কঠিন হয় বলে মেজো কন্যা নীতাকে টিউশনি করতে হয়।

এর মাঝে সংসারের হিসাবনিকাশ একটু এলোমেলো হয়ে যায়। নীতার বাবা স্ট্রোক করে অচল হয়ে পড়লে পুরো সংসারের হাল নীতাকেই ধরতে হয়। বাধ্য হয়ে একটা পার্টটাইম চাকরি নিতে হয় তাকে। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা অফিস করতে করতে নীতা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়। নীতার প্রেমিক সনৎও নীতার চাকরি করা মেনে নিতে পারে না। শংকর বড়ো ছেলে। সংসারের হাল সে-ই তো ধরবে। কিন্তু নীতা বিষয়টিকে সনতের মতো করে দেখে না। নীতা উদ্বাস্তু সংসারকে টিকিয়ে রাখার প্রাণান্ত সংগ্রাম করতে থাকে। সনৎও বদলে যায়। সে হয়তো বাস্তবতাকেই দেখে। নীতা তো উমা। তাকে ভালবেসে পুজো দেওয়া যায়, স্ত্রী করা যায় না! তাই নীতার বোন গীতাকে বিয়ে করে সনৎ। সে ভালো মাইনের একটি চাকরিও জুটিয়ে নেয়। নীতার বড়ো ভাই শংকর সনৎ আর গীতার বিয়ে মেনে নিতে পারে না। বিয়ের রাতে শংকর প্রতিবাদ করে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে যায়। সবাই যার যার দায়িত্ব ছেড়ে পালালেও নীতা পালাতে পারে না।

চিত্র-৩ : *মেঘে ঢাকা তারা* চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে অনীল চ্যাটার্জী ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

সনতের সাথে গীতার বিয়ের পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে নীতা। গায়ক হয়ে টাকা ও নাম দুটোই বেশ কামিয়ে শংকর দিল্লি থেকে বাড়িতে আসে। কিন্তু নীতা তখন যক্ষ্মায় আক্রান্ত। টাকাপয়সা নিয়ে শংকরের বাড়ি ফেরা, মন্টুর সেরে ওঠা, গীতার ছেলে হওয়া কিছুটা হলেও এই পরিবারটিকে আশান্বিত করে। মা সবার উপার্জনের টাকায় দোতলা বাড়ির স্বপ্ন দেখেন। দোতলা বাড়ি নির্মাণও করা হয়। তবে কোথাও শিকড়হীনতার সূত্র থেকে যায়।

যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্য নীতাকে শিলং-এ একটি স্যানেটোরিয়ামে ভর্তি করায় শংকর। দ্বিতীয়বার নীতাকে দেখতে যাবার পর নতুন বাড়ি আর গীতার প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা ছেলের আলোচনার মাঝে নীতা চিৎকার করে বলে, "দাদা, আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম, আমি বাঁচতে চাই দাদা...আমার যে বাঁচার বড়ো শখ দাদা..."। শংকর শুধু প্রত্যুত্তরে বলে, "তুই কি পাগল হয়ে গেলি?"

শংকর বাড়ি ফিরছে। বংশীদার দোকানের সামনে এসে কী মনে করে থমকে দাঁড়ায় সে। বংশীদা নীতার কথা জিজ্ঞেস করে। শংকর উত্তরে কিছুই বলতে পারে না। বংশীদা তখন আপন মনে নীতার স্মৃতি মনে করে বকবক করে। এই বংশীদাই নীতাকে 'সিন্ধবাদ নাবিক' বলত! তারপর ক্যামেরা নতুন কাঁকর মেশানো পথের দিকে চলে যায়। একটা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে...নীতার মতো সাদামাটা ধরনের, হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে তার জুতোর একটি পাটি ছিঁড়ে যায়। মেয়েটা কিছুটা বিব্রতবোধ করে। তারপর জুতোজোড়া হাতে নিয়ে হাঁটতে থাকে। *মেঘে ঢাকা তারা* সিনেমায় কাহিনি শুরুর দিকে ঠিক একইভাবে নীতার জুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল। পরিচালক শুরুর ঘটনা দিয়ে ছবির কাহিনি শেষ করেন। শেষ দৃশ্যের এই প্রতীকী উপস্থাপনা আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, বাস্তুহীন নীতাদের জীবনের সংগ্রাম শেষ হয় না। এ প্রসঙ্গে সাজেদুল আউয়ালের পর্যালোচনা:

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশবিভাগ পশ্চিম বাংলার সমাজ-কাঠামোতে যে পরিবর্তন আনে তার প্রভাব সরাসরি এসে পড়ে পরিবার নামক সামাজিক সংগঠনটির ওপর। কলকাতা নগরে এবং আশেপাশের এলাকায় উদ্বাস্তু পরিবারগুলো জড়ো হয়েছিল এবং এদের উপর 'প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট'-এর প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আদি পরিবারগুলোতে এই প্রভাব কিছুটা পরোক্ষ ছিল।[১০]

বহুকালের চেনাজানা বাসভূম ছেড়ে অন্যের দেওয়া জমিতে কোনোরকমে মাথা ঠেকিয়ে রাখা এই পরিবারটিই যেন হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের প্রতীক হয়ে যায়। *মেঘে ঢাকা তারা* উদ্বাস্তু পরিবারের অসহায়ত্ব ও পঙ্গুত্বকে আরও তীব্রভাবে তুলে ধরে। এ প্রসঙ্গে মফিদুল হক লিখেছেন:

> জীবনের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করে চলা নীতা যখন যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে বাঁচবার আকুতিতে প্রবল হয়ে ওঠে, তার কঠিন পথচলার একমাত্র নির্ভর অগ্রজের হাত ধরে বলে, 'দাদা, আমি বাঁচতে চাই', তখন সেই আকুতি যেন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষের প্রবল জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে।[১১]

দেশভাগ এবং দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে ঘরহারা মানুষের মানবিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সংগ্রাম নিয়ে ১৯৬১ সালে ঋত্বিক ঘটক নির্মিত ট্রিলজির দ্বিতীয় চলচ্চিত্র *কোমল গান্ধার*[১২]। *কোমল গান্ধার* পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী এবং পূর্ববঙ্গ থেকে চলে যাওয়া উদ্বাস্তুদের নিয়ে গড়ে ওঠা নাটকের দলের গল্প। প্রতীকী এ গল্পের ভিতর দিয়ে পরিচালক বিভাজনের নেতিবাচক প্রভাব চিত্রায়িত করেছেন। ছবির গল্পের শুরু 'আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর/কলা তলায় বিয়া' এ রকম প্রতীকী এবং মর্মভেদী গান দিয়ে। ছবির নাটকের দল দুটোও প্রতীকী। নাটকের দলের মাঝে বিভাজন, দল ভাঙা এবং কারও কারও নাটকের দল ছেড়ে চলে যাওয়া বাংলা ভাগ এবং আত্মীয়-বিচ্ছেদের বিষয়গুলো তুলে ধরে।

চিত্র-৪ : *কোমল গান্ধার* চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে অবনীশ ব্যানার্জী ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

কোমল গান্ধার চলচ্চিত্রের প্রধান দুই চরিত্র ভৃগু ও অনসূয়া দুজনেই পূর্ব বাংলার। দেশভাগের কারণে দুজনেই পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু। বিভাজনের কারণে নতুন দেশে নতুন জায়গায় নতুনভাবে বাঁচবার সংগ্রামেও বিভাজন ও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারাও যে উদ্বাস্তুদের সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না– তা-ও ঋত্বিক তাঁর চলচ্চিত্রে তুলে এনেছেন।

ভৃগু নাটক নিয়ে মুর্শিদাবাদের লালগোলায় যায়। পদ্মার পাড় পর্যন্ত রেললাইন। এক সময়ে জমজমাট ঘাট এখন নিঃসঙ্গ, নিরাভরণ। মানুষ নেই, কোলাহল নেই। এপার থেকে ওপারে যাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। কিছুদিন আগেও এপার-ওপার করা নৌকাগুলো এখন আর নেই। ওপার এখন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান। ভৃগু আর অনসূয়া দাঁড়িয়ে আছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। এই নিস্তব্ধ পদ্মার পাড়ে দাঁড়িয়ে অনসূয়া যখন বলে 'ওপারে কোথাও আমার দেশের বাড়ি' তখন লক্ষ উদ্বাস্তুর সঙ্গে দর্শকের ভিতরেও হাহাকার বোধ হয়। নাটকের দলের ভাঙন, অনসূয়া আর ভৃগুর প্রেমের মধ্যে ফাটল এবং অনসূয়ার ভিতরকার দোটানা– সব মিলিয়ে কোমল গান্ধার প্রবলভাবে ভাঙনের চিত্র। এ প্রসঙ্গে ঋত্বিক বলেন, "এখানে আমার সমস্যা কাহিনির তিন স্তরে বিচরণ।

আমি অনসূয়ার দ্বিধাবিভক্ত মন, বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্ব এবং দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশের মর্মবেদনা, তিনটিকেই একত্রে টানতে চেয়েছি।"[১৩]

ভৃগু আর অনসূয়া উদ্বাস্তু হলেও ভৃগু 'নিরীক্ষা' এবং অনসূয়া 'দক্ষিণাপথ' নামক দুই নাটকের দলের সদস্য। দক্ষিণাপথ নাটকের দলের সঙ্গে নিরীক্ষার বিরোধ। ভৃগু এবং শান্তার মধ্যে বিরোধের অন্তর্নিহিত কারণটি বোধ হয় উদ্বাস্তু এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বসতিদের মধ্যেকারও। নিরীক্ষার দলপ্রধান ভৃগুর কিছুটা একনায়কসুলভ আচরণ দল ভাঙার কারণ হয়ে থাকতে পারে। ঋত্বিকের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাও এখানে খোঁজা যায়। গণনাট্য সংঘের ভাঙনের চিত্র এ চলচ্চিত্রে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন পরিচালক। ছবির চরিত্র অনসূয়া, গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে ভাঙন এবং দেশভাগ– এ রকম অনেকগুলো বিষয় নিয়ে একসাথে এ ছবিতে কাজ করেছেন ঋত্বিক। ছবিটির পরতে পরতে ভাঙন আর উদ্বাস্তু-উন্মূল জীবনের বঞ্চনার কথা। নিরীক্ষা ও দক্ষিণাপথের ভিতরকার দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে চলচ্চিত্রকার দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনের প্রয়োজনের দিকটাও তুলে ধরেছেন।

সুবর্ণরেখা[১৪] উন্মূল জীবনের নির্দয় বাস্তবতার চলচ্চিত্রায়ন। দেশভাগের কারণে পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়া কয়েকটি ভাঙা পরিবারকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্রের কাহিনি আবর্তিত। ঈশ্বর ও তার বোন সীতা, আদর্শবান স্কুলশিক্ষক হরপ্রসাদ ও তার পরিবার, বাগদিবউ আর তার ছেলে অভিরাম আরও অনেক পরিবারের সঙ্গে নবজীবন কলোনিতে জায়গা পায়। ঈশ্বর ও হরপ্রসাদ মিলে কলোনিতে একটি স্কুল স্থাপন করে। পূর্ব বঙ্গের বাস্তুহীন বাগদী বউ এবং তার ছেলে অভিরাম রিফিউজি ক্যাম্প থেকে আলাদা হয়ে যায়। জমির মালিকের লোকেরা শিশুসন্তান অভিরামকে একা ফেলে রেখে তার মাকে কোথায় নিয়ে যায়, মায়ের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অভি কিংবা দর্শক কেউ জানতে পারে না। ঈশ্বর অভির দায়িত্ব নেয়। অভির মায়ের বিষয়টি পত্রিকা অফিসে জানাতে যায় ঈশ্বর। এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করে, "উদ্বাস্তু? কে নয়!" এই অমোঘ সত্যই ঋত্বিকের অন্যান্য চলচ্চিত্রের মতো *সুবর্ণরেখা*রও মূল বিষয়।

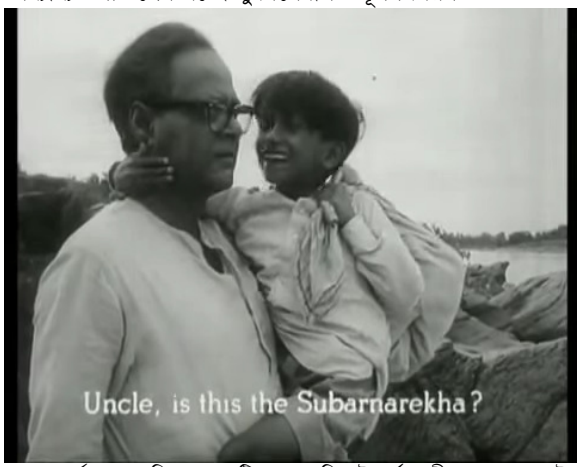

চিত্র-৫ : *সুবর্ণরেখা* চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে অভি ভট্টাচার্য ও শ্রীমান অশোক ভট্টাচার্য

ঈশ্বর তার ছোটো বোন সীতার জন্য নবজীবন রিফিউজি ক্যাম্প, বন্ধু হরপ্রসাদ এবং অন্য উদ্বাস্তুদের ছেড়ে রামবিলাসের সামান্য বেতনের চাকরি নিয়ে চলে যায় ছাতিমপুর, সুবর্ণরেখার তীরে যার ওপারে অসংখ্য ঘর, নিজেদের বাড়ি, প্রজাপতি। সময় গড়াতে থাকলে মনে হয় ঈশ্বর বোধ হয় একটা জায়গা পেল। কিন্তু সিনেমার শেষে দেখা যায় ঈশ্বর ঠিক শুরুর দৃশ্যের মতো সীতার ছেলেকে নিয়ে অজানা কোথাও পা বাড়ায়। আমরা জানি না পুনরায় উদ্বাস্তু দুই প্রজন্মের দুইজন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঈশ্বর সীতা ও অভিকে নিয়ে সুবর্ণরেখার তীরের গ্রাম ছাতিমপুর চলে গেলেও হরপ্রসাদ থেকে যায় নবজীবন কলোনিতে। হরপ্রসাদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের কলোনি ছেড়ে যাওয়া এক প্রকার পলায়ন। এই পলায়নের পশ্চাতের কারণ জানতে চায় হরপ্রসাদ। ঈশ্বর জানায়, সীতাকে একটি বাড়ি দিতে হবে। হরপ্রসাদ তাকে পলাতক হিসেবে আখ্যায়িত করে। একসময় স্কুলে শিক্ষকতা, ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাস-সংস্কৃত শেখানো এসব যেন কোনো অর্থ বহন করে না হরপ্রসাদের কাছে। সে-ও একদিন পরাজিত হয়। তার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। হরপ্রসাদ ছাতিমপুরে দেখা করতে যায় ঈশ্বরের সঙ্গে। সীতার স্বামী অভিরাম গাড়ি চালাতে গিয়ে মারা যায়। সংসার চালাতে সীতাকে বেছে নিতে হয় পতিতাবৃত্তি। আর একদিন, জীবনের সব অর্থবোধকতা হারিয়ে ঈশ্বর খদ্দের সেজে চলে যায় বোনের কাছে। পৃথিবীতে এই রূঢ় বাস্তবতার কী অর্থ থাকতে পারে? এ রকম অমানবিক সর্বতোভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাবার পর সীতার কাছেও জীবনের আর কোনো অর্থ থাকে না। সে আত্মহত্যা করে। খুনের অভিযোগে ঈশ্বর গ্রেফতার হয়। আদালতে নিজের বোনকে খুন করার দায় স্বীকার করে ঈশ্বর যদিও পরে প্রমাণিত হয় ঈশ্বর বোনের খুনী নয়। অভিরাম-সীতার পুত্র বিনুর আশ্রয় বলতে মামা, ঈশ্বর। জেল থেকে ফিরে বিনুকে নিয়ে ছাতিমপুর গেলে ঈশ্বর জানতে পারে তার আর চাকরি নেই। দেশভাগের পর পুঁজিবাদের প্রতীক রামেশ্বরের স্বার্থের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে কিছু সময়ের জন্য একটা জায়গা ঈশ্বর খুঁজে পায়। কিন্তু তা তো আর স্থায়ী হয় না। ভিটেমাটি হারিয়ে একবার যেমন অজানার উদ্দেশে পা বাড়াতে হয়েছিল, তেমনি আবার অজানার পথে পা বাড়ায় ঈশ্বর। ছাতিমপুর আসার সময় তার সঙ্গে দুই শিশু ছিল, সীতা আর অভি। একটি 'বাড়ি'ও ছিল। এখন আছে একজন, বিনু। সামনে সুবর্ণরেখা। তাদের যাবার জায়গা নেই। *সুবর্ণরেখা* নিয়ে ঋত্বিক *নিজের পায়ে নিজের পথে*[১৫] গ্রন্থে বলেছেন:

> 'সুবর্ণরেখা' is a very serious work. ওখানে খাটতে হয়েছে, হ্যাঁ মানসিকভাবে … a work behind. দৈহিকভাবে খাটার ব্যাপার নয়, মানসিকভাবে প্রচণ্ড খাটতে হয়েছে, এটাকে আমার দাঁড় করাতে হয়েছে। কদ্দুর দাঁড়িয়েছে সে আমি জানি না, কিন্তু মিঞা কথা হইত্যাছে যে খাটছি আমি।[১৬]

চলচ্চিত্রটির অন্যতম প্রধান ঈশ্বরের চরিত্র রূপদানকারী অভি ভট্টাচার্য বাংলাদেশের পাবনায় ঋত্বিকের গ্রামের মানুষ। অভি ঋত্বিকের চেয়ে বয়সে বড়ো হলেও রাজশাহী কলেজে পড়াশোনার সময় দুজনের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয়। অভি ভট্টাচার্য ভারতে তখন অনেকটা স্থিত এবং তার বাড়িতে বসেই *সুবর্ণরেখা* নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। ছবির মূল গল্পকার রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা কলকাতায় নিজের ফ্লাটের কিছু অংশ বিক্রি করে ছবি নির্মাণের টাকা জোগাড় করেন।[১৭] পরিচালক এবং অভিনেতা দুজনেই ওপার বাংলায় উদ্বাস্তু। এ কারণে ছবিতে তাদের ইমোশনাল ইনভল্বমেন্ট অনেক বেশি। ঋত্বিক বলেন:

> বাংলা ভাগটাকে আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারিনি। আজও পারি না। আর ঐ তিনটে ছবিতে আমি ও-কথাই বলতে চেয়েছি। ইচ্ছে না-থাকা সত্ত্বেও হয়ে গেল একটা trilogy: 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' আর 'সুবর্ণরেখা'। আমি 'মেঘে ঢাকা তারা' দিয়ে যখন আরম্ভ করলাম তখনও আমি রাজনৈতিক মিলনের কথা বলিনি, এখনও ভাবি না। কারণ ইতিহাসে যা হয়ে গেছে তা পালটানো ভীষণ মুশকিল। সেটা আমার কাজও নয়। সাংস্কৃতিক মিলনের পথে যে-বাধা, যে-ছেদ, যার মধ্যে রাজনীতি-অর্থনীতি সবই এসে পড়ে, সেটাই আমাকে প্রচণ্ড ব্যথা দিয়েছিল। আর এই সাংস্কৃতিক মিলনের কথাই 'কোমল গান্ধার'-এ পরিষ্কার বলা আছে, 'মেঘে ঢাকা তারা'র ভেতরকার কথাও তাই, 'সুবর্ণরেখা'তেও সেই একই কথা।[১৮]

পাঁচ.

ঋত্বিকের পরের চলচ্চিত্র *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো*[১৯]। সাতচল্লিশের দেশভাগের প্রায় দুই যুগ পরের পশ্চিমবঙ্গের সমাজ, রাজনীতি এবং আঞ্চলিক বাস্তবতার আলোকে এ চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন ঘটক। তার পঁচিশ বছরের দীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবনের শেষ ছবিও এটি। এ চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে বাঁধন সেনগুপ্তকে উদ্ধৃত করা যায়:

> প্রধানত 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' তে তাঁর চিন্তা ও ভাবনার মৌলিকত্বের চূড়ান্ত অনুশীলন ঘটানোর সক্রিয়তাই লক্ষ করা যায়। তাঁর ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছে ব্যক্তিজীবন তথা সমকালীন জীবনের নৈর্ব্যক্তিক বিবর্তনের অপ্রতিরুদ্ধ এক প্রক্রিয়া।[২০]

এটি ঋত্বিক ঘটকের সবচেয়ে আলোচিত, ভীষণভাবে রাজনৈতিক আত্মজৈবনিক ছবি। এক জাগ্রত বিপ্লবীর মতো এই ছবিতে ঋত্বিক নিজেকে এবং নিজের মতবাদ ও আদর্শকে বিশ্লেষণ করেছেন, কোথাও বা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।[২১] ঋত্বিকের এ চলচ্চিত্রটির মূল বক্তব্যও আশ্রয়। আশ্রয়হীন কিছু মানুষের আশ্রয় খোঁজার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রকার দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সমাজব্যবস্থায় উপমহাদেশ বিভাজনের বিরূপ প্রভাবটিই তুলে ধরেছেন। *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো* ব্যর্থ মাদকাসক্ত বুদ্ধিজীবী নীলকণ্ঠ বাগচী, তার সঙ্গে থাকা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা বেকার তরুণ নচিকেতা এবং বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে বাঁচা বঙ্গবালা ও তাদের সঙ্গে জুটে যাওয়া সংস্কৃতের শিক্ষক জগন্নাথ মাস্টারের আক্ষরিক অর্থে আশ্রয় খোঁজার এক ভ্রমণ। এ ভ্রমণ আত্মপোলব্ধির এবং ভীষণভাবে প্রতীকী। নীলকণ্ঠ বাগচীর স্ত্রী গীতা স্বামীকে 'পথে' ফিরিয়ে আনতে না পেরে তাদের একমাত্র পুত্র সত্যকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এর কিছু সময় পর এই শূন্য বাড়িতে ঢুকে পড়ে বঙ্গবালা। পরিচয় জানতে চাইলে সে জানায়, "নাম বঙ্গবালা... বাপরে কোতল করল...এই শহরে পথে পথে হাঁটি। আশ্রয়, কোথাও যাওনের জায়গা নাই।" দুর্গা চলে যাবার পর ভাড়া বাড়িটিও তাদের ছেড়ে দিতে হয়। বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে তিনজন। পার্কে রাত কাটানোর পর তাদের সঙ্গে জুটে যায় আরেক আশ্রয়হীন মানুষ, গ্রামের স্কুলশিক্ষক জগন্নাথ ভট্টাচার্য। তারপর চারজন মিলে কাঞ্চনপুরে দুর্গার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আশি মাইল পথ হেঁটে তারা কাঞ্চনপুর পৌঁছায়। সাঁওতাল গ্রামে ভূস্বামীর গুলিতে মারা যায় জগন্নাথ। শালবনে নকশাল বাড়ি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে মারা যায় নীলকণ্ঠ বাগচী। শালবনে রাত পার করার সময় নীলকণ্ঠ আর নকশালপন্থিদের মাঝে তর্ক হয়। আর তখন জঙ্গলে নচিকেতা ও বঙ্গবালার মিলনের শীৎকার শোনা যায়।

চিত্র-৬ : *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো* চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে শাঁওলী মিত্র ও ঋত্বিক ঘটক

ঋত্বিকের ভাষায়, এ চলচ্চিত্রটি একটি রাজনৈতিক ছবি। নিজের জীবনের অনেক ঘটনার ছোঁয়া আছে এ চলচ্চিত্রে। ঋত্বিক নিজে এ বিষয়ে বলেছেন:

> 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' রাজনৈতিক ছবি। ছবির নাম হচ্ছে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো', 'Arguments and a Story'। তোমাদের গল্প না হলে ভালো লাগে না, তাই একটা গপ্পো দিচ্ছি, আসলে এটা যুক্তি তর্ক, it is completely a political film… .[২২]

যুক্তি তক্কো আর গপ্পো চলচ্চিত্রে ঋত্বিকের নিজের জীবনের ছায়া দেখা যায়। ব্যক্তি জীবনে যে কথাগুলো তিনি বলতে চেয়েছেন, বাস্তবে তার বাস্তবায়ন তিনি দেখেননি। বাংলা বিভাগ তাকে ভীষণভাবে মর্মাহত করেছিল। সাতচল্লিশের স্বাধীনতাকে তিনি স্বাধীনতা হিসেবে মানতে চাননি। মাউন্টব্যাটনের কাছে নতি স্বীকার করে স্বাধীনতা নেওয়া এবং ইংরেজদের সাজেশন অনুযায়ী উপমহাদেশ বিভাজন কোনো অর্থ বহন করে না। এই স্বাধীনতা নতুন করে উপনিবেশ স্থাপনের দরজা খোলার প্রক্রিয়া যা এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সবদিক থেকে আশ্রয়হীন করে ফেলছে। ঋত্বিকের কথায়:

> এখন দেশের যা অবস্থা, যে অব্যবস্থা, সমস্তই হচ্ছে ঐ great betrayal সেই সাতচল্লিশের তথাকথিত 'স্বাধীনতা'-র রেজাল্ট। এটা আমি ছবিতে বলেছি। এখন আমরার কিসের মধ্য দিয়ে pass করছি? Neo-colonialism, absolutely neo-colonialism.[২৩]

নিজের জীবনের অনেক ঘটনা, অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক অমীমাংসিত বিষয় এ ছবিতে তিনি তুলে আনতে চেয়েছেন। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনের কথা তিনি বারবার বলেছেন। নচিকেতা আর বঙ্গবালার মিলনের ভিতর দিয়ে ঋত্বিক সেই মিলনের বিষয়টি বুঝিয়ে থাকতে পারেন। ঋত্বিক নিজে অনেক বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করলেও প্রধান চরিত্র নীলকণ্ঠ বাগচী 'কনফিউজড'[২৪] থাকে। এ কারণে *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো* 'শুধুই ব্যক্তিগত স্তরে আবদ্ধ থাকে না, আমাদের জীবন ও কালের ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত রূপক হয়ে ওঠে।'[২৫]

ছয়.

ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রের মূল ভাবনায় সাতচল্লিশের উপমহাদেশের অসম ও অযৌক্তিক বিভাজন এবং এই বিভাজনের কারণে এ অঞ্চলে তৈরি হওয়া চলমান সমস্যা। একটি বিষয় নিয়ে খুব কম চলচ্চিত্রকারই দীর্ঘ সময় ধরে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। বিভাজনের ফলে উন্মূল মানুষের দুঃখদুর্দশা এবং নতুন পরিবেশে টিকে থাকার সংগ্রাম শুধু নয়, ভবিষ্যতের সময়গুলোতে দেশভাগের গভীর প্রভাবের কথাও তিনি বলতে চেয়েছেন। নীতা, ভৃগু, অনসূয়া, সীতা, সীতার ছোটো ছেলে বিনু, অভিরাম এবং ঈশ্বর, নীলকণ্ঠ বাগচী, বঙ্গবালা, নচিকেতা– শেষ পর্যন্ত সবাই গৃহহীন, সবাইকে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাজেদুল আউয়াল "ঋত্বিক ঘটক বিরচিত 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' : বিষয় ও আঙ্গিক বিচার" নিবন্ধে লিখেছেন:

> কিন্তু চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের তাত্ত্বিক প্রকল্পে যে-কটি মৌল ভাবনা বারবার ফিরে এসেছে, তার মধ্যে 'ঘর' অন্যতম। এই ঘর খোঁজার পালা শুরু হয় তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'নাগরিক' থেকেই– তারপর যে সাতটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ঋত্বিক সৃষ্টি করেছেন, তার প্রত্যেকটিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'ঘর' খোঁজার প্রসঙ্গটি এসেছে।[২৬]

বাংলা ভাগ হওয়াটাকে ঋত্বিক কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তিনি এ বিষয়ে বলেন : 'আজকের সমস্ত অর্থনীতিটা যে চুরমার হয়ে গেছে তার basic factor ছিল ঐ বাংলা ভাগ'।[২৭] এ বিষয়টি চলচ্চিত্রে আনার জন্য তিনি দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুত হয়েছেন। *নিজের পায়ে নিজের পথে* সাক্ষাৎকার ভিত্তিক গ্রন্থে সিনেমা নিয়ে ঋত্বিক ঘটক বলেন:

> আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাব যে, it is not an imaginary story বা আমি আপনাকে সস্তা আনন্দ দিতে আসিনি। প্রতি মুহূর্তে আপনাকে hammer করে বোঝাব যে যা দেখছেন তা একটা কল্পিত ঘটনা, কিন্তু এর মধ্যে যেটা বোঝাতে চাইছি আমার সেই thesisটা বুঝুন, সেটা সম্পূর্ণ সত্যি। সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমি আপনাকে alienate করব প্রতি মুহূর্তে। যদি আপনি সচেতন হয়ে উঠেন, ছবি দেখে বাইরের সেই সামাজিক বাধা দুর্নীতি বদলের কাজে লিপ্ত হয়ে উঠেন, আমার প্রোটেস্টটাকে যদি আপনার মধ্যে চাপিয়ে দিতে পারি তবেই শিল্পী হিসেবে আমার সার্থকতা।[২৮]

শিল্পীর এই দায়বদ্ধতা ঋত্বিক ঘটককে ছিন্নমূল মানুষের অসহনীয় জীবন, বাঁচার সংগ্রাম এবং দেশভাগের ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ ক্ষতি চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে সহযোগিতা করেছে। বাস্তবতা বিবেচনায় তিনি দুই বাংলার ভৌগোলিক মিলনের স্বপ্ন ছেড়ে দিলেও সাংস্কৃতিক গভীর মিলনের আশা ছাড়েননি। বাংলা বিভাজনের কারণে ছিন্নমূল মানুষের বর্ণনাতীত দুঃখ-যন্ত্রণা সেলুলয়েডে তুলে আনার জন্য অমর হয়ে থাকবেন ঋত্বিক ঘটক।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সাজেদুল আউয়াল, *ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র : সমাজবাস্তবতা ও নির্মাণভাবনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৭

২. জয়া চ্যাটার্জি, *বাঙলা ভাগ হল*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১

৩. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, 'স্মৃতির ছিন্নপত্রে ঋত্বিক', *সেই ঋত্বিক*, সুব্রত রুদ্র (সম্পাদক), প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫, পৃ. ১০

৪. সাজেদুল আউয়াল, *ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র : সমাজবাস্তবতা ও নির্মাণভাবনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৯

৫. *নাগরিক*: রং: সাদাকালো; ৩৫ মিমি; কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: ঋত্বিক ঘটক; দৈর্ঘ্য: ১২৫ মিনিট; চিত্রগ্রহণ: রামানন্দ সেনগুপ্ত; সম্পাদনা: রমেশ যোশী; সংগীত: হরিপ্রসন্ন দাস; শব্দগ্রহণ: সত্যেন চ্যাটার্জী; শিল্প নির্দেশনা: ভূপেন মজুমদার; অভিনয়: প্রভা দেবী, শোভা সেন, কেতকী চ্যাটার্জী, গীতা সোম, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, কালী ব্যানার্জী, অজিত ব্যানার্জী, মমতাজ আহমেদ খান, কেষ্ট মুখার্জী, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ; প্রযোজনা: ফিল্ম গিল্ড, প্রমোদ সেনগুপ্ত, ভূপতি নন্দী, ঋত্বিক ঘটক; নির্মাণকাল: ১৯৫২-৫৩; মুক্তি: ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

৬. সাজেদুল আউয়াল, *ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র: সমাজবাস্তবতা ও নির্মাণভাবনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫০

৭. *বাড়ি থেকে পালিয়ে* : রং: সাদাকালো; ৩৫ মিমি; কাহিনি: শিবরাম চক্রবর্তী; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: ঋত্বিক ঘটক; দৈর্ঘ্য: ১২৪ মিনিট; চিত্রগ্রহণ: দীনেন গুপ্ত; সম্পাদনা: রমেশ যোশী; গীত রচনা ও আবহসংগীত: সলিল চৌধুরী; শব্দগ্রহণ: মৃণাল গুহঠাকুরতা ও সত্যেন চ্যাটার্জী; শিল্প নির্দেশনা: রবি চ্যাটার্জি; অভিনয়: কালী ব্যানার্জী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, পদ্মা দেবী, শ্রীমান পরমভট্টারক লাহিড়ী, কেষ্ট মুখার্জী, জহর রায়, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ; প্রযোজনা: এলবি ফিল্ম ইন্টারন্যাশনাল; নির্মাণ: ১৯৫৯; মুক্তি: ২৪ জুলাই, ১৯৫৯

৮. Banerjee, Haimanti. *Ritwik Kumar Ghatak*, National Film Archive of India, Pune, 1985, pp. 55-56.

৯. *মেঘে ঢাকা তারা* : রং : সাদাকালো; ৩৫ মিমি; কাহিনি : শক্তিপদ রাজগুরু; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ঋত্বিক ঘটক; দৈর্ঘ্য: ১২৬ মিনিট; চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত; সম্পাদনা: রমেশ যোশী; সংগীত: জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র; শব্দগ্রহণ : মৃণাল গুহঠাকুরতা ও সত্যেন চ্যাটার্জী, শিল্প নির্দেশনা : রবি চ্যাটার্জি; অভিনয় : সুপ্রিয়া চৌধুরী, অনিল ব্যানার্জি, গীতা দে, নিরঞ্জন রায়, জ্ঞানেশ মুখার্জী, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ; প্রযোজনা : চিত্রকল্প; নির্মাণ : ১৯৬০, মুক্তি : ১৪ এপ্রিল, ১৯৬০

১০. সাজেদুল আউয়াল, *ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র : সমাজবাস্তবতা ও নির্মাণভাবনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭৯

১১. মফিদুল হক, (২০০৯), *দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ৬৯

১২. *কোমল গান্ধার* : রং : সাদাকালো; ৩৫ মিমি; কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ঋত্বিক ঘটক; দৈর্ঘ্য : ১৩৩ মিনিট; চিত্রগ্রহণ : দিলীপরঞ্জন মুখার্জী; সম্পাদনা : রমেশ যোশী, আবহসংগীত : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র; গীত রচনা : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও সলিল চৌধুরী; শব্দগ্রহণ : মৃণাল গুহঠাকুরতা ও সুজিত সরকার; শিল্প নির্দেশনা : রবি চ্যাটার্জি, অভিনয় : সুপ্রিয়া চৌধুরী, চিত্রা মণ্ডল, গীতা দে, অবনীশ ব্যানার্জী, অনীল চ্যাটার্জী, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ; প্রযোজনা : চিত্রকল্প; নির্মাণ : ১৯৬১, মুক্তি : ৩১ মার্চ ১৯৬১

১৩. https://www.filmfree.org/2016/10/22/from-books/1252.php

১৪. *সুবর্ণরেখা* : রং : সাদাকালো; ৩৫ মিমি; মূল কাহিনি : রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ঋত্বিক ঘটক; দৈর্ঘ্য : ১৩৯ মিনিট; চিত্রগ্রহণ : দিলীপরঞ্জন মুখার্জী; সম্পাদনা : রমেশ যোশী; আবহসংগীত : ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ; শব্দগ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জী, শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প নির্দেশনা : রবি চ্যাটার্জি; অভিনয় : অভি ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, গীতা দে, ইন্দ্রানী চক্রবর্তী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, জহর রায়, পীতাম্বর,

শ্রীমান অশোক ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, মাধবী মুখার্জী প্রমুখ; প্রযোজনা : জে জে ফিল্মস কর্পোরেশন, নির্মাণ : ১৯৬২; মুক্তি : ১ অক্টোবর ১৯৬৫

১৫. *নিজের পায়ে নিজের পথে* গ্রন্থটি একটি কথা-কোলাজ। ঋত্বিক ঘটকের দেওয়া প্রায় পনেরোটি সাক্ষাৎকার থেকে বাছাই করে চুম্বক কথা নিয়ে কোলাজটি তৈরি করা হয়েছে। ঋত্বিকের নিজের বয়ানে অর্থাৎ ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভ টেকনিক ব্যবহার করে গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। বিন্যাস করেছেন সন্দীপন ভট্টাচার্য এবং প্রকাশ করেছে সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা, নভেম্বর ২০১০-এ, কলকাতা চলচ্চিত্রোৎসব উপলক্ষে। গ্রন্থটিকে ঋত্বিকের নিজের লেখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৬. ঋত্বিক কুমার ঘটক, *নিজের পায়ে নিজের পথে*, সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২২

১৭. অভি ভট্টাচার্য, 'সুবর্ণরেখার স্মৃতি', *সেই ঋত্বিক*, সুব্রত রুদ্র (সম্পাদক), প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃ. ৮৯

১৮. ঋত্বিক কুমার ঘটক, *নিজের পায়ে নিজের পথে*, সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২২

১৯. *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো* : রং : সাদাকালো; ৩৫ মিমি; কাহিনি, চিত্রনাট্য, আবহসংগীত ও পরিচালনা : ঋত্বিক ঘটক; দৈর্ঘ্য : ১২০ মিনিট; চিত্রগ্রহণ : বেবী ইসলাম; সম্পাদনা : অমলেশ সিকদার; শব্দগ্রহণ : জ্যোতি চ্যাটার্জী, শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প নির্দেশনা : রবি চ্যাটার্জি; অভিনয় : ঋত্বিক ঘটক, তৃপ্তি মিত্র, শাঁওলী মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সৌগত বর্মন, অনন্য রায়, শ্যামল ঘোষাল, ঋতবান ঘটক প্রমুখ; প্রযোজনা : ঋতচিত্র, সুরমা ঘটক; নির্মাণ : ১৯৭৪; মুক্তি : ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

২০. বাঁধন সেনগুপ্ত, *ঋত্বিক চলচ্চিত্র কথা*, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৮০

২১. https://bn.wikipedia.org/wiki/যুক্তি_তক্কো_আর_গপ্পো যুক্তি_তক্কো_আর_গপ্পো

২২. সুরমা ঘটক, *ঋত্বিক*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪০২, পৃ. ১৪৭-১৪৮

২৩. ঋত্বিক কুমার ঘটক, *নিজের পায়ে নিজের পথে*, সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২২

২৪. *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো* চলচ্চিত্রে নকশালপন্থিদের সঙ্গে তর্কের এক পর্যায়ে নীলকণ্ঠ বাগচীর সংলাপ : আজকে কোন সিদ্ধান্ত indian codition-কে অথবা বাংলার condition-কে সঠিক পথে নিয়ে যাবে, সেটা আমার জানা নেই। আমি confused, utterly confused, দিশেহারা হয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। হয়তো আমরা সবাই confused.

২৫. নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, "ঋত্বিক ঘটকের শেষ ছবি : যুক্তি-তক্কো-গপ্পো", *চলচ্চিত্রচর্চা*, সত্যজিৎ চৌধুরী (সম্পাদক), চিত্রভাষ, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৭২

২৬. সাজেদুল আউয়াল, 'ঋত্বিক ঘটক বিরচিত 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' : বিষয় ও আঙ্গিক বিচার', মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১০২

২৭. ঋত্বিক কুমার ঘটক, *নিজের পায়ে নিজের পথে*, সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২২

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, আটত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৭/ডিসেম্বর ২০২০

বাংলা ছোটগল্পে উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি: পরিপ্রেক্ষিত তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ

মাফরুহা সিফাত*

সারসংক্ষেপ

পুঁজিবাদী দেশগুলো সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসন-শোষণকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে উপনিবেশের বিস্তার ঘটিয়েছিল। উপনিবেশিত দেশগুলোর শোষিত মানুষদের উপনিবেশ-অতিক্রান্ত চিন্তা থেকেই পরবর্তীকালে উত্তর-উপনিবেশবাদের জন্ম। তবে তত্ত্বীয় আলোচনার পাশাপাশি সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গিজাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হওয়ারও বহুকাল পূর্ব থেকেই বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা থেকে। বাংলা সাহিত্যে এই ধারার প্রোজ্জ্বল প্রয়াস লক্ষ করা যায় গত শতকের চল্লিশের দশকে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্য-দর্শনে প্রতিফলিত উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রবণতার অনুসন্ধান করা। বাংলায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শঠতা, শোষণ, বর্বরতা ও বর্ণবাদিতার নিকৃষ্টতম উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের (১৩৫০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর) প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁদের অন্যতম চারটি ছোটগল্প– 'বিপদ', 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'হাড়' এবং 'নয়নচারা'। প্রবন্ধে গল্পগুলোর উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠে, ওই দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক চতুষ্টয়ের মানবতাবাদী দর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১

বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য বা তত্ত্ব আলোচনা বেগবান হলেও এর সূত্রপাত ঘটেছে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পর সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের হাত থেকে মুক্ত হয় ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার দেশগুলো। বিশেষত ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে বি-উপনিবেশায়ন (Decolonisation) প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। যদিও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী অন্যান্য শক্তি তথা ফরাসি, ইতালীয়, স্প্যানিশ, বেলজিয়ান, পর্তুগিজদের পতন শুরু হয়েছিল আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই। সুতরাং, যুগে যুগে উপনিবেশিত দেশগুলোর সাহিত্যিক, সাহিত্যতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদরা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যে অবস্থান নিয়েছিল, তাকে কোনো বিশেষ সময়ের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। ঔপনিবেশিক শাসন তথা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা, প্রতিরোধ চেতনা গড়ে তোলা ও উপনিবেশ গঠনের কুফলগুলোকে জোরালোভাবে তুলে ধরার মনোবৃত্তির মধ্যেই উত্তর-উপনিবেশবাদের মূলসুর প্রোথিত। 'Post-colonialism (or often post colonialism) deals with the effect of colonization on cultures and societies.'[১]। উত্তর-উপনিবেশবাদকে আরও ভালোভাবে বোঝা যায় এই ভাষ্যের মাধ্যমে–

> Postocolonialism is a significant field of literary studies that refers to the study of the literary, social and cultural heritage of colonial and imperial powers and focuses on the impact of hegemonic and exploitation of the people who were colonized…Postcolonial

* প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

literature mainly focuses on the outcomes of the interaction between European colonial powers and the people of the countries they colonized.[২]

১৯৭৮ সালে এডওয়ার্ড সাঈদের (১৯৩৫-২০০৩) *ওরিয়েন্টালিজম (Orientalism)* প্রকাশের পর সমালোচকগণ বেশ নড়েচড়ে বসেন উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানভাষ্যের নয়া দিগন্ত উন্মোচনে। সাঈদের *কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম (Culture and Imperialiam)* (১৯৯৩), ফ্রানৎস ফানোর (১৯২৫-১৯৬১) *ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক (Black Skin White Mask)* (১৯৫২) ও *দ্য রেচেড অব দ্য আর্থ (The Wretched of The Earth)* (১৯৬১), হোমি কে ভাবার (জ. ১৯৪৯) *দ্য লোকেশন অব কালচার (The Location of Culture)* (১৯৯৪), এইমে সিজারের (১৯১৩-২০০৮) *ডিসকোর্স অন কলোনিয়ালিজম (Discourse on Colonialism)* (১৯৫০) গ্রন্থগুলোকে উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবনার সূতিকাগার বলে চিহ্নিত করা হয় সাহিত্যের ইতিহাসে। এছাড়া গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের (জ. ১৯৪২) *ক্যান দ্য সাব অলটার্ন স্পিক? (Can the Subaltern Speak?)*, বনিতা প্যারীর *প্রবলেমস ইন কারেন্ট থিওরিজ অব পোস্ট কলোনিয়াল ডিসকোর্স (Problems in Current Theories of Post Colonial Discourse)* এবং বিল অ্যাশক্রফট (জ. ১৯৪৬), গ্যারেথ গ্রিফিথ (জ. ১৯৪৩) ও হেলেন টিফিন (জ. ১৯৪৫) সম্পাদিত *দ্য এম্পায়ার রাইটস ব্যাক: থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস ইন পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচার (The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literature)* (১৯৮৯) সহ উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব সংবলিত অন্যান্য আলোচনা সমূহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচ্য। আবার এই বিষয়ক সুস্পষ্ট সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে আফ্রিকান লেখক চিনুয়া আচেবের (১৯৩০-২০০৩) *থিংস ফল অ্যাপার্ট (Things Fall Apart)* (১৯৫৮), আমাদের উপমহাদেশীয় লেখক সালমান রুশদীর (জ. ১৯৪৭) *মিডনাইট'স চিলড্রেন (Midnight's Children)* (১৯৮১) বা অরুন্ধতী রায়ের (জ. ১৯৬১) *দ্য গড অব স্মল থিংস (The God of Small Things)* (১৯৯৭) উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশের দশক থেকে লেখা শুরু হলেও এই ধারার সাহিত্যচর্চার গতি বেগবান হয়েছে সত্তরের দশকে। বর্তমানে যার শাখা-প্রশাখা নব্য উত্তর-উপনিবেশবাদকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত হচ্ছে।

'অনেকে মনে করেন, উপনিবেশগুলো স্বাধীন হওয়ার পর তার সমাজ ও সংস্কৃতিতে যেসব উপনিবেশী প্রভাব রয়ে গেছে, সেগুলো চিহ্নিত ও দূর করার মনোভঙ্গি ও কৌশলটাই হলো উত্তর উপনিবেশবাদ।'[৩] কিন্তু উপনিবেশগুলো স্বাধীন হওয়ার পূর্বে উত্তর-উপনিবেশবাদ চিন্তার চর্চা ছিল না, এ-কথা এই তত্ত্বের জোর কমিয়ে দেয়। কারণ এক শ্রেণির সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীর মধ্যে উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবনার সূচনা ঘটেছে বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তার হতে শুরু করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর উপনিবেশিত মানুষেরা আত্মসমীক্ষার অংশ হিসেবে নিজেদের বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্মে উপনিবেশ-বিরোধী বিপ্লব ও বিদ্রোহচেতনা গড়ে তুলেছেন ধীরে ধীরে। সমসাময়িক সাহিত্যগুলো তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাই অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে বলা যায়, গত শতকের সত্তরের দশক নয় বরং তারও পূর্ব থেকে উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলোর সাহিত্যিকদের রচিত বিভিন্ন সাহিত্য উপাদানগুলোকে অনেকাংশেই উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করা সম্ভব।

২

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর ভারতবর্ষের জনগণকে হীনবল করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের আমূল আখ্যান রচনা করেছিল। বলা যায়, 'উপনিবেশ নির্মাণ পুঁজিবাদী বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে রূপান্তর এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসন-শোষণ বিস্তৃত করার বাস্তব আকাঙ্ক্ষার ফল।'[৪] কারণ পাশ্চাত্যের প্রধানতম তৎপরতা ছিল সবসময় এবং সবদিক থেকেই প্রাচ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা–

> Imperial Europe became defined as the 'centre' in geography at least as metaphysical as physical. Everything that lay outside that centre was by definition at the periphery of culture, power and civilization. The colonial mission, to bring the margin into the sphere of influence of the enlightened centre, became the principal justification for the economic and political exploitation of colonialism … .[৫]

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ঔপনিবেশিক দেশগুলোর সঙ্গে শুরু থেকেই কেন্দ্র-প্রান্তীয় সম্পর্ক বজায় রাখত। তারা সর্বক্ষেত্রেই শোষিত দেশগুলোকে 'অপর' (The Other) বিবেচনা করত। মলয় রায়চৌধুরীর বর্ণনায় আমরা পাই, কীভাবে পাশ্চাত্যের মানুষেরা প্রাচ্যের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা পোষণ করে নিজেদের আত্মসচেতন, শাসন করার উপযুক্ত ও ক্ষমতাবান মানুষ মনে করত।[৬] তাদের এই সীমাহীন বাক্ষণত্বই যুগ্ম-বৈপরীত্যের (Binary Opposition) ধারণার জন্ম দেয়। তারা উপনিবেশিত মানুষগুলোর সঙ্গে শাসক-শাসিত, সাদা-কালো, ভালো-মন্দ, সভ্য-অসভ্য, জ্ঞানী-মূর্খ, সুন্দর-অসুন্দর বিভাজনের সূচনা করে। ফ্রানৎস ফানো বলেছিলেন, এই 'অপরতা'বোধের (Otherness) ধারণা উপনিবেশিতদের মধ্যে হীনম্মন্যতার জন্ম দেয়। ফলে তাদের ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করে।[৭] সাম্রাজ্যবাদীরা চারশ বছর ধরে আধিপত্য চালিয়ে এসেছে, পুরো পৃথিবীর রূপরেখা তারা তছনছ করে দিয়েছিল। ভারতবর্ষেও তারা শোষণের নীলনকশা প্রণয়ন করেছিল। টমাস মেকলের উক্তিটি এক্ষেত্রে না বললেই নয়:

> We must at present do our best to form a class of interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals, and in intellects.[৮]

Minutes on Indian Education (১৯৩৫)-এ ভারতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ে মেকলের করা এই উক্তিটিই প্রমাণ করে এই দেশের নিজস্ব চেহারায় তারা কত বীভৎস সাদা মুখোশ পরাতে চেয়েছিল। তারা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এত সজোরে প্রচার করতে শুরু করেছিল যে, পরাধীন মানুষদের মাঝে নিজেদের সত্তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। তবে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকেরা উপনিবেশ গঠনের শুরু থেকেই এই পূর্ব-পশ্চিমের তথাকথিত ধারণাকে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা উপনিবেশিত থাকার সময়টিকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করতে শুরু করেন। তাঁদের লেখার মাধ্যমে তাঁরা সমূলে উপনিবেশ-বিরোধী প্রতিরোধ চেতনাকে উজ্জীবিত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। উত্তর-উপনিবেশবাদ জীবন ও বিশ্বকে দেখার পাশ্চাত্যরীতিকে পরিহার করে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়নের মাধ্যম। এডওয়ার্ড সাঈদের *ওরিয়েন্টালিজম* প্রকাশের পর এই তত্ত্বটি প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পেয়েছে, এই কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আবার ঐতিহাসিক দিক বিবেচনায় 'কলোনিয়ালিজমে'র ইতি ঘটার পরেই যে, তার পূর্বে 'পোস্ট' শব্দ বসাটা অধিকতর যৌক্তিক,

সেটিও না বললেই নয়। তবে এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ান লেখকত্রয় বিল অ্যাশক্রফট, গ্যারেথ গ্রিফিথস, হেলেন টিফিনের জ্ঞানভাষ্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁদের মতে, উত্তর-উপনিবেশবাদের ব্যবহার্য কিছু কৌশল বিকশিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক কালেই। অনেক দেশে উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকে ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধের মনোভঙ্গি, যত দুর্বল ও বিচ্ছিন্নই হোক, এর অস্তিত্ব অস্বীকার করার নয়। কাজেই উত্তর-উপনিবেশবাদের প্ররোচক পরিস্থিতি এবং চর্চা ও লেখালেখির ইতিহাস বেশ পুরোনো। যদিও তখন এর কোনো নাম ছিল না।[৯] সুতরাং, একথা স্পষ্টই বলা চলে, তত্ত্ব হিসেবে উত্তর-উপনিবেশবাদ বিগত শতকের শেষ কয়েক দশক ধরে চর্চিত হতে থাকলেও, উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য ও শিল্পকর্মের সূচনা হয়েছে উপনিবেশ গঠনের পরপরই।

৩

ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিশেষত বাংলা অঞ্চলের সাহিত্যিকদের মধ্যে উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনা দেখা গিয়েছে ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তার লাভ করার পর থেকেই। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নব্য-উপনিবেশবাদের উপর্যুক্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর দেশে দেশে ক্রমে দেখা দেয় প্রবল প্রতিরোধ চেতনা। উপনিবেশীর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ-চেতনারই তাত্ত্বিক নাম post-colonialism বা উত্তর-উপনিবেশবাদ। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো উপনিবেশিতের ঐতিহ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংসের যেসব প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে, সেগুলো চিহ্নিত করা এবং নিজেদের আধিপত্যমুক্ত করার মানসে জ্ঞানচর্চার পথ নির্মাণ করা এবং সজ্ঞচেতনায় জাগ্রত হওয়ারই তাত্ত্বিক প্রণোদনা ও উপায় হল উত্তর-উপনিবেশবাদ।[১০]

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এবং কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) লেখায় শুরু থেকেই উপনিবেশ-বিরোধী চেতনা শনাক্ত করা সম্ভব। তবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় এর প্রকাশ তেমন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । বা কখনও তাঁদের মধ্যে সূক্ষ্ম স্ববিরোধিতাও যে দেখা যায়নি তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করলেও মুসলমানদের কাছ থেকে ভারতের শাসনভার ছিনিয়ে নেওয়ার প্রশংসা করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত *মেঘনাদবধ কাব্যে* (১৮৬১) রাবণকে আর্যদের তথা রামের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে কৌশলে উপনিবেশ গঠনের বিরুদ্ধচারণ করলেও ঔপনিবেশিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চায় নিজের প্রবল আগ্রহ ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম প্রকৃষ্টভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর লেখার মাধ্যমে। গভীরভাবে দেখলে তাঁকে আধুনিক প্রাচ্য তত্ত্বের উদগাতা বললেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজ শাসনের কুফল সম্পর্কে তিনি সারাজীবন সজাগ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

> ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একটি বাদশা ছিল। তাহার পরে একটি কোম্পানি বসিয়াছিল...এখন ইংরেজ জাত জানে ভারতবর্ষ তাদের সকলেরই। একটা পরিবার মাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজ জাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।...মোট কথা একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্যদেশকে শাসন করিতেছে, ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই।... [১১]

ঔপনিবেশিক আধিপত্যকামী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বিপ্লব সূচনার ইঙ্গিত হিসেবে তিনি লিখেছিলেন *মেঘ ও রৌদ্র* গল্প, *গোরা* (১৯১০) ও *চার অধ্যায়* (১৯৩৫) উপন্যাস, *সভ্যতার সংকট* প্রবন্ধসহ নানান রচনা।

কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী চেতনার শেকড়ে প্রাণ সঞ্চার করেছে উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা। উপনিবেশের জাঁতাকলে পিষ্ট ভারতবাসী যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) ক্ষয়ক্ষতিতে বিপর্যস্ত, তখন নজরুলই সর্বপ্রথম গর্জে উঠেছিলেন:

> স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশ বিদেশিদের অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সম্পূর্ণ থাকবে ভারতের হাতে। তাতে কোনো বিদেশী মোড়লীর অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ দেশে মোড়লী করে এ দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগর পাড়ে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবে না। তাদের সবটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু দূর করতে হবে।[১২]

অগ্নিবীণা (১৯২২) কাব্যেও কাজী নজরুল ইসলামের এই প্রতিরোধ চেতনার তীব্র প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। ফ্রানৎস ফানো বলেছিলেন, ভূমিপুত্র ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মাধ্যমে প্রথমে নিজ ভূমির দাবি প্রতিষ্ঠা করে।[১৩] গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের প্রশ্নের উত্তর[১৪] পাওয়া যায় নজরুলের *বারাঙ্গনা*, *নারী* কবিতায়; *পদ্মগোখরো*, *ব্যথার দান* ও *রাক্ষুসী* গল্পে, *কুহেলিকা* (১৯৩১) উপন্যাসে। এসব রচনায় আমরা নিম্নবর্গের মধ্যে কথা বলার প্রবণতাকে শনাক্ত করতে পারি। সুতরাং, তাঁর এই বিদ্রোহী চেতনাকে খুব সহজেই উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তার সমান্তরালে দাঁড় করানো যায়।

৪

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই পুরো বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতা ও চূড়ান্তভাবে অবক্ষয়িত মূল্যবোধের বেদনায় জর্জরিত হয়। বৈশ্বিক সেই তরঙ্গবিক্ষোভের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে ভারতবর্ষেও। ঐ সময়ে পুরো বিশ্বের পাশাপাশি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হলেও ১৯১৭ সালে সংঘটিত রুশ বিপ্লব তাদের চেতনালোকে নতুন অনুরণন সৃষ্টি করে। এছাড়া ১৯১৯ সালে রাওলাট আইন ও তার প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত নৃশংস জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ভারতবর্ষের জনগণকে নতুনভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এরই ফলে ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধী এই সহিংসতা পরিহারের সিদ্ধান্ত নিলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী মানুষের মধ্যেও স্পষ্ট দুটি বিভাজন তৈরি হয়। যার একটি ভাগ গান্ধীকে সমর্থন দিলেও, আরেকভাগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়। কংগ্রেস (১৮৮৫) ও মুসলিম লীগের (১৯০৬) পাশাপাশি তৃতীয় শক্তি হিসেবে ভারতের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টির (১৯২৫) সৃষ্টি হয়। বৈশ্বিক ও স্বাদেশিক কাঠামোর এই বিপুল পরিবর্তনের সমান্তরালে বাংলা সাহিত্যেও নতুন যুগের সূচনা ঘটে। বিচ্ছিন্ন বিশ ও উত্তাল তিরিশের পর বাংলা সাহিত্যে চল্লিশের দশক আসে সরাসরি বৈপ্লবিক বার্তা বহন করে। একদিকে সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯১৯-২০০৩) কবিতায় আসন্ন বিপ্লবের ঝনঝনানি; অপরদিকে কথাসাহিত্যে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) নান্দনিক যুগধর্মী সৃজনক্রিয়া। আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এই সমস্ত লেখকের তৎকালীন সাহিত্যকর্মের মাঝে একই ধারার ভাবগত সাযুজ্য বিদ্যমান। আর তা হলো, আত্ম-অনুসন্ধান, প্রকৃতিচেতনা, অস্তিত্ববাদ, ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণ, মানবমুক্তি তথা সামষ্টিক কল্যাণকামী জীবনদর্শন। প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু, চরিত্র-চিত্রায়ণ বা আঙ্গিকগত বিন্যাসে শিল্পভাষ্যের বিচিত্রমুখী ভিন্নতা থাকলেও, তাঁদের চিন্তাধারা পরিবেষ্টিত হয়েছে স্বদেশ-সমাজ-স্বাধীনতা-সাম্যবাদকে ঘিরে। আর তাঁদের ভাব-পরিমণ্ডলের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা। ঐ সময়ের সাহিত্যিকদের মধ্যে কারও কারও এই ধরনের প্রবণতাকে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন, মার্কসবাদ ও উত্তর-উপনিবেশবাদ প্রায় একই শ্রেণিভুক্ত হলেও তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণে এদের পরিণতি এক নয়। মার্কসবাদ অনেকটাই সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণসাপেক্ষ । কিন্তু উত্তর-উপনিবেশবাদী দর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্মসমীক্ষা, এমনটিই মনে করেন গ্রামসি।[১৫]

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এসে সাহিত্যে উপনিবেশবাদ-বিরোধী চেতনার প্রকাশ প্রকৃষ্টরূপে লক্ষণীয় হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯৩৯-১৯৪৫) সংঘটিত অমানবিক কিছু ঘটনার মাধ্যমে। এই বিশ্বযুদ্ধ ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যুর মিছিল কিংবা ধ্বংসলীলা সবদিক থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে হার মানায়। ভারতবাসীর ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই দুই বিশ্বযুদ্ধ। তৎকালীন বিশ্বের ক্ষমতাধর কোনো শক্তি না হয়েও, কোনো শক্তির উপাসক না হয়েও এবং সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও তারা যুদ্ধের এই বীভৎসতা থেকে নিস্তার পায়নি। ভারতবর্ষ কয়েকশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের পদতলে পিষ্ট তো হয়েছেই, উপরন্তু কেবল আরোপিত উপনিবেশ-জালে জড়াতে হয়েছিল বলেই তাদের দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ছিল মারাত্মক। একদিকে জার্মান, জাপান ও ইতালি এবং অন্যদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসলীলা চালাচ্ছিল। এরমধ্যে ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মান সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে। ফলে যুদ্ধের নকশা পাল্টে যায়, কোটি কোটি লোকের প্রাণহানি ঘটে। সমাজতন্ত্রীরা তখন একে ফ্যাসিবাদবিরোধিতা বলে সংজ্ঞায়ন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষে আঁচড় কাটলেও আঘাত হানতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিদারুণ আঘাতপ্রাপ্ত হয় ভারতবাসী। এই আঘাত কেবল মনোজাগতিক ছিল না, বরং এতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল ভারতবর্ষ, বিশেষত বাংলা অঞ্চল। তা যতটা না যুদ্ধের অভিঘাতে, তার চাইতেও বেশি ব্রিটিশ শাসকদের চক্রান্তে। ঐ সময়ের সাহিত্যিকরা এই চক্রান্তকে উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখেছিলেন।

বিশেষত যুদ্ধ চলাকালীন অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে (১৩৫০ বঙ্গাব্দে) শুরু হওয়া দুর্ভিক্ষ যে মানবসৃষ্ট ছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই ঐ সময়ের বেশ কিছু রচনায়।[১৬] পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায়ের উপন্যাস *অশনি সংকেত* (১৯৫৯), ছোটগল্প *চাউল*, *বিপদ*, *ভীড়*; গোপাল হালদারের (১৯০২-১৯৯৩) উপন্যাসত্রয়ী– *পঞ্চাশের পথ*, *ঊনপঞ্চাশী* ও *তেরশ' পঞ্চাশ* (১৯৪৫); তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস *মন্বন্তর* (১৯৪৪), ছোটগল্প *বোবাকান্না*, *পৌষলক্ষ্মী*, *তিনশূন্য*; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস *চিন্তামণি* (১৯৪৫), ছোটগল্প

আজ কাল পরশুর গল্প, *গোপাল শাসমল*, *সাড়ে সাত সের চাল*, *কে বাঁচায় কে বাঁচে*, *প্রাণের গুদাম*, *ধান*, *নমুনা*, *তারপর?*, *নেড়ী*, *প্রাণ*, *গলায় দড়ির কেন*, *কানাই তাঁতী*, *ছিনিয়ে খায়নি কেন*; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬) ছোটগল্প *কালনাগ*, *হাড়*, *বাঁশবাজি*, *কাক ও বস্ত্র*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০) ছোটগল্প *কালোজল*, *হাড়*, *পুষ্করা*, *দুঃশাসন*, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৮৭) ছোটগল্প *বীরুর প্রশ্ন*; নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫) ছোটগল্প *মদনভস্ম*, *আবরণ*; সোমনাথ লাহিড়ীর (১৯০১-১৯৮৪) ছোটগল্প *১৯৪৩* এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (১৯২২-১৯৭১) *নয়নচারা* ও *মৃত্যুযাত্রা*।

৫

১৭৬৯-৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চল প্রথম ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রত্যক্ষ করে। তৎকালীন বাংলার দেড় কোটি জনগণের এক তৃতীয়াংশের প্রাণহানি ঘটে এই দুর্ভিক্ষে। পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) কয়েকবছর পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি গ্রহণ করে (১৭৬৫) এবং খাজনা আদায়ের নামে নির্বিচারে লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই এই দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ ফটকাবাজারি ও মুনাফা লুটেরাদের চক্রান্ত এবং তীব্রতর ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এই দুর্ভিক্ষে যখন বাংলার বুকে বিপর্যয় নেমে আসে, তখন বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়। আবার প্রায় দুশো বছরের শাসন-শোষণের পর ঔপনিবেশিক শাসকচক্র যখন বুঝতে পেরেছিল ভারতবর্ষের মুক্তিকামী জনগণের প্রবল আন্দোলনের মুখে তাদের কুশাসন শেষ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন তারা সুচতুর কৌশলে ১৯৪৩ সালে বাংলার জনগণকে আরেকটা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষমুখে নিক্ষেপ করেছিল।

ফানো, সাঈদ, ভাবাসহ সকল উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকই তাদের বিভিন্ন ডিসকোর্সে নানাভাবে এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক শাসকেরা বিভিন্নভাবে উপনিবেশিত জনগণের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। এই প্রসঙ্গে আমরা যদি ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষকে ব্যবচ্ছেদ করতে বসি, তবে এটা প্রমাণিত হবে যে, ব্রিটিশ শাসকেরা এই দুর্ভিক্ষকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত *Famine Commission*-এর রিপোর্ট অনুযায়ী উডহেডের বক্তব্য ছিল: 'Shortage in the supply of rice in 1943 was one of the basic causes of famine.'[১৭] কিন্তু পরবর্তীকালে এই দায়সারা বক্তব্য ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিল। অস্ট্রেলিয়ান বায়োকেমিস্ট ড. গিডেন পলিয়া এই দুর্ভিক্ষকে বলেছেন, 'a man made holocaust'।[১৮] ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম *দ্য গার্ডিয়ানকে* দেওয়া সাক্ষাৎকারে, গান্ধীনগরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক ও গবেষক বিমল মিশ্র *জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার* সাময়িকীর একটি গবেষণার উল্লেখ করে বলেছেন, ব্রিটিশরা যে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পেছনে খাদ্য সংকটের পাশাপাশি খরাকে দায়ী করে, তা সঠিক নয়। বিমল মিশ্রের মতে, ঐ সালে গড়পড়তা বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিক ছিল। এই প্রতিবেদনে দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে ব্রিটিশ সরকারের নীতিগত ব্যর্থতার কথা। আবার ভারতের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেনের (১৯৮১) মতে, দুর্ভিক্ষের সময় বাংলা অঞ্চলে পর্যাপ্ত খাদ্যেরই জোগান ছিল। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি আর ফটকা ক্রেতা ও মজুতদারদের কারণে তা সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল।[১৯] 'চার্চিলস এম্পায়ার' বইয়ের লেখক রিচার্ড টয়ীও এই দুর্ভিক্ষকে চার্চিলের প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[২০]

প্রশ্ন হচ্ছে, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল ব্যাপারটিকে কীভাবে দেখেছেন? এর সমাধান পাওয়া যায় মধুশ্রী মুখার্জীর *চার্চিলস সিক্রেট ওয়্যার: দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার অ্যান্ড দ্য র‍্যাভেজিং অফ ইন্ডিয়া ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ওয়্যার II (Churchill's Secret War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II)* গ্রন্থে। সহযোগীদের নিয়ে সাত বছর ধরে গবেষণার পর প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষকে চার্চিলের গোপন যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২১] এই যুদ্ধ ছিল ভারতীয় বাঙালিদের বিরুদ্ধে। আর এই যুদ্ধের প্রধান কারণ তীব্রতম বর্ণবাদিতা। এই বর্ণবিদ্বেষকে স্বাভাবিকভাবেই উত্তর-উপনিবেশি চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব। কারণ এই তত্ত্বের প্রধানতম তাত্ত্বিকরা বারবারই বলেছেন 'অপরতা'ভেদের কথা।

১৯৪২ সালে জাপান যখন বার্মা দখল করে নেয়, ভারতে বার্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আর তাদের মদদপুষ্ট মুনাফালোভী কালোবাজারিরা সাধারণ জনগণকে বলে যে, এবার জাপান ভারত দখল করবে, ফলে ভবিষ্যৎ বিপর্যয় রোধে ও সৈন্যবাহিনীকে পর্যাপ্ত খাদ্যের জোগান দিতে খাদ্য মজুত করে রাখতে হবে। উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বকথা অনুযায়ী, দীর্ঘদিন উপনিবেশিত থাকার ফলে সাধারণ মানুষেরা একসময় নিজেদের অস্তিত্ব ও বিবেচনাবোধ হারিয়ে হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হয়, তখন এমনকি তাদের স্বাভাবিক বিবেচনা বোধটুকুও হারিয়ে যায়। বাংলা অঞ্চলের মানুষের তখন সেই দশা উপস্থিত হয়েছিল। এছাড়া জাতিবিদ্বেষী চার্চিলের নিষ্ঠুর অভিসন্ধির ফলে অন্য কোনো দেশের খাদ্য-সাহায্য গ্রহণও তখন সম্ভব হয়নি। ফলে এই দুর্ভিক্ষে প্রায় তিরিশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

৬

উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ঔপনিবেশিক শক্তির মুখোশ উন্মোচন করা। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলার মানুষ ও সমগ্র বাংলা অঞ্চলের দুর্দশা তাই ঐ সময়ের সাহিত্যিকদের চোখ এড়ায়নি। তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো বটেই, এই দুর্ভিক্ষের পেছনের কারণগুলো সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। এই দুর্বিষহ সময়কে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে রচিত তাঁদের সাহিত্যকর্মগুলোতে আমরা আসলে পক্ষান্তরে প্রতিরোধ চেতনাকেই প্রোথিত থাকতে দেখি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিপদ', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশুর গল্প', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়' এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'নয়নচারা' গল্পগুলোর আখ্যান কীভাবে গড়ে উঠেছে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের নিরিখে, সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা তার স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করব।

৬.১

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে যে রচনাগুলো লিখেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'বিপদ' গল্প। তবে দুর্ভিক্ষে মানুষের করুণ মৃত্যুর চিত্র নয় বরং তিনি তুলে ধরেছেন ঐ নির্মম পরিবেশে মানুষের বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টাকে। এই গল্পে আমরা দুটি চরিত্রকে মুখোমুখি দাঁড়াতে দেখি। একজন হলো এই গল্পের কথক যিনি 'গ্রামের মাতব্বর, পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারি' তথা কেন্দ্রে অবস্থিত সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী ব্রাহ্মণ পুরুষ। আর অন্যজন এক অল্পবয়সী নিম্নবিত্ত নারী হাজু, দুর্ভিক্ষতাড়িত হয়ে যে বাধ্য হয় বারবনিতা হতে। গল্পকথক ঐ গ্রামীণ

ব্রাহ্মণ, যাকে হাজু জ্যাঠামশাই বলে ডাকতো; কোনো এক সময় ভ্রান্তিবশত সে হাজুর পতিতালয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু সামাজিক সংস্কারের কারণে প্রথমে খাদ্যগ্রহণ করতে এবং বসতে দ্বিধান্বিত হলেও, পরবর্তীকালে দৃঢ়চেতা হাজুর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সে কুসংস্কার ত্যাগ করে মানবিক শক্তিতে জাগ্রত হয়।

এই গল্পের উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠকালে এই তত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে, যেখানে লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণের পরিচয় দিয়েছেন। কেন্দ্র ও প্রান্তের ব্যবধান মিলিয়ে দিয়ে জ্যাঠামশাই ও হাজুকে একই বিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছেন। আমরা এখানে সরাসরি দুর্ভিক্ষের চিত্র তেমন দেখতে পাই না। শুধু একজায়গায় গল্পকথকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, 'আকালের' সময় ধান-চাল পাওয়া যেতো না বাজারে, এমনকি মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে এর প্রভাবে মানুষের প্রচ্ছন্ন ক্ষয়ক্ষতির চিত্র পাই গল্পকথকের বর্ণনায়: 'পঞ্চাশের মন্বন্তর চলিয়া গেল। পথের পাশে এখানে ওখানে আজও দু-একটা কঙ্কাল দেখা যায়।'[২২] আর এই দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে যারা বেঁচে গিয়েছিল, তাদের অধিকাংশকেই পথে নামতে হয়েছিল জীবিকার প্রয়োজনে। অধিকাংশ নারীকেই বেছে নিতে হয়েছিল পতিতাবৃত্তি। বিশেষ করে হাজুর মতো নিম্নবিত্ত নারীরা দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে কোনোমতে বেঁচে থাকার আশায় বাধ্য হয়েছিল বারবনিতায় পরিণত হতে।

গল্পের প্রায় শুরুতেই হাজুকে আমরা দেখি মলিন বস্ত্র পরিহিতা অবস্থায় গল্পকথকের বাড়িতে এসে দাঁড়ায়, কোলে ছোট ছেলেকে নিয়ে। তার উদ্দেশ্য ছিল কাজের বিনিময়ে খাদ্য-সাহায্যের অনুরোধ জানানো। কারণ গল্পকথক ছিল হাজুর বাবার বাল্যবন্ধু এবং গ্রামের অন্যতম সমাজপতি। এছাড়াও জানা যায়, হাজু তার নানামুখী অসহায়ত্বের কারণে ঐ সময় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হচ্ছিল। সমাজের আরেক অবস্থাপন্ন গৃহস্থ রায়দের বাড়িতে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হাজুর তরমুজ খাওয়াকে গল্পকথক যেভাবে 'হাউমাউ করে খাওয়া' আখ্যা দিয়েছেন এবং তার পায়ের কাছে ভিক্ষা করে পাওয়া স্তূপীকৃত চালসহ নানা খাদ্যদ্রব্যের যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, তারমধ্যে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বকথায় আলোচিত 'অপরতা' ভেদজনিত একটি অনিচ্ছাকৃত হীনদৃষ্টির অকাট্য প্রমাণ মেলে। সুতরাং, গল্পের প্রথম থেকেই লেখকের কৌশলী বর্ণনায় আমরা দুটি সামাজিক শ্রেণির মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা দেখতে পাই। আমরা জানি, উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানভাষ্য নিম্নবর্গের মানুষদের সমাজের কেন্দ্রে প্রতিস্থাপনের রূপরেখা নির্মাণে বিশেষভাবে তৎপর। সেদিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যায় 'বিপদ' গল্পের শেষে হাজু যেভাবে জ্যাঠামশাইকে তার তৎকালীন সচ্ছল অবস্থা সম্পর্কে নানাভাবে জানান দেয়, সেটি নিঃসন্দেহে সমাজসচেতন লেখকের সুদৃঢ় পরিকল্পনার ইঙ্গিতবহ।

উত্তর-উপনিবেশবাদ নারী স্বাধীনতা, নারীর অধিকার ও মর্যাদার পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয় সবসময়ই। সমাজে নারীর অবস্থান সুনিশ্চিত করতে উত্তর-ঔপনিবেশিক ধারার লেখকগণ সবসময়ই সোচ্চার। এই গল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই বারবনিতা হাজুর মাঝে তার পেশাকে নিয়ে কোনো গ্লানিবোধ আমরা দেখি না। গল্পের শুরুতে আমরা যেই হাজুকে স্বামী পরিত্যক্তা অবস্থায় জীবিকার তাড়নায় ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখি, চৌর্যবৃত্তির অপবাদে জর্জরিত হতে দেখি; তাকেই গল্পের পরবর্তী অংশে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা অতিক্রম করে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে দেখা যায়: 'বা রে, ভুলে গেলেন? আমার বাবার নাম রামচরণ বৈরাগী।

আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি।'[২৩] জ্যাঠামশাই বা গল্পকথক 'রঙিন বস্ত্র পরিহিতা' হাজুর পেশা নিয়ে গর্ব করার বিষয়টিকে তাচ্ছিল্যভরে অবজ্ঞা করেছিল। তবে লেখকের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তিনি নিম্নবর্গের আর্থিক স্বাধীনতা এবং মুক্তির দিকটি দেখাতে চেয়েছেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায়, হাজুর সাড়ে সাত টাকা ভাড়ার সুসজ্জিত ঘরের আসবাবের বর্ণনায়। তক্তপোষের ওপর পরিপাটি বিছানা, ঘরের দেওয়ালে বিদেশি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি কেষ্টঠাকুরের ছবি, রেড়ির তেলের প্রদীপের আলোয় ঝকঝকে পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র, ডুগি-তবলা, হুঁকা এবং তামাকের পাত্র; এর সবকিছুই হাজুর পরিবর্তিত উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতীক। দুর্ভিক্ষ সংঘটনের প্রভাবকগুলোর মুখে চপেটাঘাত করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে প্রান্তীয় মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টাকে দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে তাঁর উত্তর-উপনিবেশী প্রতিরোধ-সচেতন মনের ইঙ্গিতবহ।

এছাড়া এই গল্পে তৎকালীন প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখকের একটি সুস্পষ্ট বিপরীতধর্মী অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানভাষ্য যে বিষয়গুলো নিয়ে সর্বোচ্চ আলোচনা করে, 'অপরতা'বোধের সমীকরণ নির্ণয় তার মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চলে কেবল ব্রিটিশ-বাঙালি 'অপরতা'ভেদ নয় বরং আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও বিরাজমান ছিল 'আমরা-ওরা' সম্পর্ক। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ভেদটা ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্রাহ্মণদের জাতপ্রথার বাড়াবাড়ির শিকার হতে হয়েছিল অব্রাহ্মণ তথা শূদ্র, মুসলমান, পতিতা প্রভৃতি শ্রেণির। উক্ত গল্পেও আমরা সেই 'অপরতা'বোধের চিত্র পাই হাজু এবং গল্পকথকের মাধ্যমে। কিন্তু লেখক এখানে সকল বৈষম্য অতিক্রম করে মানবিকতার জয়গান গেয়েছেন।

আমরা দেখতে পাই, হাজুর মাধ্যমে লেখক সমাজের তথাকথিত ভদ্রোচিত ব্যক্তিদের মধ্যে একাংশের অর্থলিপ্সা ও অমানবিকতার প্রতিবাদ করিয়েছেন। তাদের মুখোশ উন্মোচন করাতে চেয়েছেন বলেই হাজুর ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ববাদই গল্পের অন্যতম প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। হাজুর কাছে তার গ্রামের বিনোদ ঘোষসহ বিভিন্ন লোকজন নিয়মিত যাতায়াত করত, যাদের মাধ্যমে সে তার মায়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রায় বিশ-পঁচিশ টাকা পাঠালেও কোনো টাকাই তার কাছে পৌঁছাত না, গল্পের শেষে এই সত্যের নাটকীয় উন্মোচন কথিত সমাজপতিদের অর্থলিপ্সু মনোভাবকেই প্রকাশ করে। হাজুর কাছে তার গ্রামের লোকজনদের নিয়মিত যাতায়াতের কথা শুনে জ্যাঠামশায় বিব্রত হয়ে পড়েন এবং হাজুর মায়ের কাছে হাজুর দেওয়া পাঁচটি টাকা পৌঁছানোর ব্যাপারটিতে তাকে বেশ গোপনীয়তা অবলম্বন করতে দেখা যায়। তবে এই পুরো ঘটনাপ্রবাহে একটি বিষয় ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে আমাদের সামনে, আর তা হলো, লেখক কোনোভাবেই উপনিবেশবাদের প্রতিষ্ঠিত চিন্তা থেকে পতিতাবৃত্তিকে ঘৃণ্য পেশা হিসেবে দেখেননি। বরং এটাকে স্বাভাবিক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চিন্তার মধ্য দিয়ে, লেখকের উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এই গল্পে। ফলে গল্পকথক সমাজের কেন্দ্রে অবস্থিত একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত সমাজকথিত প্রান্তবাসী হাজুর অর্থনৈতিক মুক্তি ও সচ্ছলতাকে সাফল্য হিসেবে গণ্য করতে বাধ্য হয়–

> কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াচে। কাল যে পরের বাড়ী চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা পিরিচে– যার বাবাও কোনোদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া ছোট করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা আমার যোগাইল না।[২৪]

৬.২

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশুর গল্প'তেও আমরা দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী বর্ণনা পাই। এখানেও সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের মুখে বিত্তবানদের পরাজিত হতে দেখি। এই শ্রেণিসচেতনতা লেখকের উত্তর-ঔপনিবেশিক মননের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। শাসক ও শোষিতের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং শোষিতের আপাত বিজয়ের ইতিবৃত্ত আমাদের মানবিকতার জয়গান শোনায়। মানসুকিয়া গ্রামের মোড়ল ও চালের চোরাকারবারি ঘনশ্যাম দাস ঐ গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত চরিত্র রামপদর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী মুক্তাকে দুমুঠো খাবারের আশায় সম্ভ্রমের বিনিময়ে মর্মন্তুদ জীবনাচারে বাধ্য করে:

> খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা নেই। চাল গুড়িয়ে বার্লি-মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুরলে কী দিই। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, করি কী! তাতেই শেষ হল।'...দাসমশায় দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে-পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে? জানলে পরে রাজী হতাম, বাচ্চাটা তো বাঁচত। মরণ মোর হলই, সে-ও মরল। ... খোকন মরল, তোমার কোন পাত্তা নেই। দাসমশায় রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে। দিন গেলে এক মুঠো খেতে পাই নে। এক রাতে দু'টো মদ্দ এলে, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্যে। দিশে মিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে।[২৫]

মন্বন্তর-আক্রান্ত সমাজের বাস্তব চিত্র এই উক্তির মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়। মুক্তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম শোষণের বিরুদ্ধে হার না মানার দৃঢ় সংকল্পকে ব্যক্ত করে। এই গল্পে আমরা ঐ সময়ের সমাজের শাসক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে কিছু ব্যক্তির পরিচয় পাই, যাদের হাতে সমাজের মূল নিয়ন্ত্রণ ছিল। এরা পেশায় মূলত ফটকাবাজ সুদখোর মহাজন, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী কিংবা কালোবাজারি। এদের কাজ ছিল সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালানো। দুর্ভিক্ষের ফলে পুরো মানসুকিয়া গ্রামের মানুষদের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। গল্পে বলা হয়েছে, না খেয়ে রোগে ভুগে অনেক মানুষ মারা গেছে, কোনো কোনো বাড়ির দশজন নিরুদ্দেশ হওয়ার পর মাত্র দুজন ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে এসেছে, অসংখ্য মেয়ে-বৌ চালান হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় গ্রামের মানুষরা যখন অস্তিত্বের সংকটে ভুগছিল, তখনও একদল মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজে সমস্যা জিইয়ে রেখেছিল। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যালোচনা এটির প্রমাণ দেয় যে, শাসকগোষ্ঠী কখনোই সমাজের সমস্যা সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে ফেলে না। কারণ সেসব সংকটকে কেন্দ্র করেই তারা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থোদ্ধারে তৎপর থাকে সর্বদা। তাই মানসুকিয়া গ্রামের সাধারণ মানুষ যখন মহামারিতে আপনজন এবং নিজেদের প্রায় সর্বস্ব হারিয়ে আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় রত ছিল বলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় রামপদ আর তার স্ত্রী মুক্তার জীবনে নাক না গলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন সমাজপতিরা যেন প্রায় জোর করেই তাদের উসকে দিতে চাচ্ছিল ন্যায়-অন্যায়ের ভেদাভেদ নির্ণয়ে। যার প্রমাণ পাই, যখন দেখি মুক্তাকে তার স্বামী ঘরে তুলবে কিনা এই ব্যাপারে এরা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এভাবে:

> সমাজ তাকে শাসিয়েছে, বৌকে ঘরে নেওয়া চলবে না। নিলে বিপদ আছে। সমাজ মানে ঘনশ্যাম দাস, কানাই বিশ্বাস, নিধু নন্দী, লোচন কুমার, বিধু ঘোষ, মধু নন্দী– এরা কজন। ঘনশ্যাম এরকম সমাজপতি এ অঞ্চলের চাষাভুষোদের, অর্থাৎ চাষি গয়লা কামার কুমোর তেলি ঘরামি জেলে প্রভৃতির। সে-ই কাল ধমক দিয়ে বারণ করে দিয়েছে রামপদকে।[২৬]

আমাদের গ্রামীণ সমাজে কিছু মানুষের মধ্যে জোট বেঁধে ঘোঁট পাকাবার অবসর এবং তাগিদ একটি চিরায়ত প্রথার মতো ছিল। কিন্তু তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ সমাজের প্রচলিত অবকাঠামোকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। আহত, উৎপীড়িত ও সমাজ-পরিত্যক্ত মানুষগুলো ভাঙা মন ও দেহ নিয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তায় কেবল চেষ্টা করে যাচ্ছিল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। সাধারণ মানুষ যখন প্রকৃত সমাজসত্য অনুধাবনে সক্ষম হয়, শাসকগোষ্ঠীর স্বরূপ যখন উন্মোচিত হয়; তখন মানুষ অস্তিত্ববাদী হয়ে ওঠে। অস্তিত্ব-সচেতন মানুষদের মানবিক বোধের জাগরণ ঘটাতে সহায়তা করা উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার একটি সুনির্দিষ্ট দিক। এর আলোকে বিবেচনা করলে আমরা দেখি, কীভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শোষকদের বিরুদ্ধে ঐ সময় একটি সংঘবদ্ধ শক্তির মাথা তুলে দাঁড়ানোর রূপকল্পকে গল্পে চিত্রায়িত করেছেন। এই গল্পে আমরা তাদের প্রতিনিধি হিসেবে রামপদ, বনমালী, করালী, গিরিকে দেখতে পাই। মুক্তাকে এরা সংসারে ফিরিয়ে দেয়, দুর্গাকে সঠিক পথ বেছে নিতে সহায়তা করে, বনমালীর স্ত্রীকে এরা রক্ষা করতে চায়। এদের উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদে শোষকদের স্তিমিত হয়ে পড়তে দেখা যায়। এই গল্পেও আমরা 'বিপদ' গল্পের মতো নারীমুক্তির ধ্বনি শুনতে পাই। লেখকের বর্ণনায় দেখি, মুক্তা গ্রামে ফিরে আসার পর গ্রামের সাধারণ ভদ্র মানুষ থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষজন, চাষাভুষোদের কমবয়সী মেয়ে-বৌসহ সকলেই মুক্তার প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রথমে। তবে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বকথার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সমাজে নারীর সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করা, যেটি সম্পর্কে লেখক সবসময়ই সচেতন ছিলেন বলেই রামপদর গৃহে মুক্তাকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাই শোষক শ্রেণির সিদ্ধান্তের সরাসরি বিরোধিতা করে তিনি তাদের আয়োজিত বিচার-সভার অসারতা প্রমাণ করতে প্রতিরোধের ভাষা দিয়েছেন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের মুখে। আমরা দেখি, মুক্তাকে নিয়ে সভা বসলে অন্য সবার মত মাতব্বরের আশ্রিতা গিরিও প্রতিবাদ করে ওঠে:

> গিরি তড়াক করে ঘাড় উঁচু করে গলা চিরে ফেলে,'খেটে খায়নি তো কি? মোরা এক সাথে খেটে খেয়েছি। এক পাড়ায় দু'বাড়ী ঝি-গিরি করেছি, এক দোকানে মুড়ি ভেজেছি। কোন্ মুখপোড়া বলে খেটে খাইনি মোরা, শুনি তো একবার?'
>
> প্রায় সকলেই জানে একথা সত্য নয় গিরির। কয়েকজন স্বচক্ষে মুক্তাকে দেখেছে সদরে। কিন্তু কেউ কথা বলে না। কিছুকাল আগে গাঁয়ে লজ্জাবতী লতার মতো কাঁচা মেয়ে গিরির পরিবর্তনটা সকলকে আশ্চর্য করে দেয়।[২৭]

পুরো গল্পজুড়েই আমরা গিরির সরব উপস্থিতি দেখতে পাই। গল্পে গিরি সমাজচ্যুত মাতব্বরের আশ্রিতারূপে আবির্ভূত। দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাবের সুযোগ নিয়ে ঘনশ্যামের মতো লোকেরা নিজেদের অর্থলিপ্সা এবং ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে গিরি ও মুক্তার মতো অসংখ্য নারীদের দেহোপজীবী হতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর বিপক্ষে গিরির প্রবল প্রতিরোধ এবং সাহসী কণ্ঠস্বর মুক্তাকে যেভাবে সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হয়েছিল, তাতে বোঝা যায়, এই ভাষ্য লেখকের সমাজচিন্তার প্রতিধ্বনি।

এই গল্পের নামকরণের দিকে তাকালেই গল্পটি রচনার পেছনে লেখকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সমাজসচেতন লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন, দুর্ভিক্ষের পেছনের কারণগুলো কী কী ছিল। তাই তিনিও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দুর্ভিক্ষে প্রাণহানির করুণ গল্প লেখেননি। বরং আজকের দুর্ভিক্ষ আগামীকালের মানুষকে কতটা সচেতন করছে এবং পরশু তথা

ভবিষ্যতের মানুষ এখান থেকে কী শিক্ষা পাচ্ছে, সেটি বোঝাতে চেয়েছেন। গল্পটির ঘটনাপ্রবাহের শুরুতেই আমরা মানসুকিয়া গ্রামের রামপদকে তার ভাঙা ঘরের দাওয়ায় বসে যখন ভাত আর শোল মাছের ঝোল খেতে দেখি, তখন লেখকের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে জানি যে, তার ঘরের বেড়া, খুঁটি, মাচা, তক্তাসহ মাটির হাঁড়ি-কলসি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে বা খোয়া গেছে দুর্ভিক্ষের কশাঘাতে। লেখক যখন দেখালেন, খুঁটির অভাবে রামপদর ঘরের দাওয়ার চালাটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাত হয়ে; তখন এটি সহজেই অনুমেয়, এই প্রতীকধর্মী পরিচর্যা থেকে ঐ সময়ের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় নিম্নবিত্ত মানুষদের দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী দুরবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এই গল্পের পরিণতি যে কল্যাণকামী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর লেখকের এই কল্যাণকামী মনোভাব নিঃসন্দেহে নিপীড়িত মানুষদের পক্ষে তাঁর অবস্থান জানিয়ে দেয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা প্রসূত চিন্তা লেখকের অভ্যন্তরে ছিল বলেই তিনি এই গল্পে শাসকদের বিপরীতে শোষিতদের দাঁড় করিয়েছেন। রাষ্ট্রের উদাসীনতা ও গণবিচ্ছিন্নতার সমালোচনা করেছেন কৌশলে। দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী সমাজ সংস্কারে ও নারীদের অধিকার আদায়ে সমাজকর্মীদের উজ্জ্বল ভূমিকা দেখিয়েছেন, যারা সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় রত ছিল। এই মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ যে বাংলার মানুষকে দমিয়ে রাখতে পারবে না, বিপ্লব যে আসন্ন; গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ইঙ্গিত প্রকৃতপক্ষে শুভবোধেরই জাগরণধ্বনি।

৬.৩

তেতাল্লিশের মন্বন্তরে সমগ্র বাংলার গ্রামাঞ্চল উজাড় হয়েছিল। এক মুঠো ভাত বা এক বাটি ফ্যানের আশায় লাখ লাখ মানুষ উঠে এসেছিল শহরের বুকে। শহরে তাদের অধিকাংশেরই ঠাঁই হয়েছিল রাস্তায়। না খেতে পেরে ধুঁকতে ধুঁকতে এসব মানুষ মরে যেত, হয়ে উঠত কুকুর কিংবা শকুনের খাবার। আর যারা বেঁচে থাকত, তারা খাদ্যের অভাবে কুকুর-শেয়ালের সঙ্গে একই আবর্জনা-স্তূপ থেকে খাবার ভাগ করে খেত। এই মর্মপীড়াদায়ক দৃশ্যাবলি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজের চোখে দেখেছিলেন বলেই 'হাড়' গল্পে তৎকালে তাঁরই মতো এক যুবক চরিত্রের বর্ণনায় উত্তর-উপনিবেশবাদী মনোভঙ্গিতে উঠে এসেছে ধ্বংসপ্রাপ্ত মানবতা ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার বাস্তব রূপ। গল্পকথক এই যুবক, যার পরিচয় আমরা পাই প্রমথের ছেলে হিসেবে, প্রচলিত ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় পীড়িত হয়ে নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য চাকরির উমেদারিতে তার বাবার এক 'রায়বাহাদুর' বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উপনিবেশ-বিরোধী সংকল্প ধারণ করে, সে ঐ বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

গল্পের শুরুতেই লেখক 'রায়বাহাদুর' শব্দটির প্রতি জোরারোপ করেছেন কটূক্তির ভঙ্গিতে। এই কটূক্তি সমাজের উচ্চবিত্ত ও শাসকদের মদদপুষ্ট এক শ্রেণির তোষামোদকারী চরিত্রদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়, যাদের জীবন ছিল অসহ্য নির্মম পর্যায়ের বাড়াবাড়ি বিলাসিতায় পরিপূর্ণ। উত্তর-উপনিবেশবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্য প্রবর্তিত যুগ্ম-বৈপরীত্যের ধারণার বিরুদ্ধে অবস্থান করা। এই গল্পে আমরা বারবার গল্পকথকের সেই অবস্থান দেখতে পাই। সে রায়বাহাদুরের বাড়ির প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতেই তার উৎকৃষ্ট পর্যবেক্ষণে, দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে শাসক ও শোষিত এবং উচ্চবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্তের তুলনা করতে শুরু করে। রায়বাহাদুরের

রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়িটির সামনে পাহারারত অবস্থায় দুটো কুকুরের বর্ণনা পাওয়া যায় গল্পের শুরুতেই। এই কুকুর দুটোর গর্জন ও হিংস্রতার মাধ্যমে লেখক যেন প্রতীকধর্মী পরিচর্যায় এসব রায়বাহাদুর গোছের মানুষদের নিষ্ঠুরতার একটা আগাম পরিচয় দিয়ে দেন।

রায়বাহাদুরের বাড়ির সীমানা প্রাচীর, দুটি সামাজিক শ্রেণির মাঝে সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা টেনেছিল। যুবকের ভাষায়, যার একপাশে ছিল সুসজ্জিত বাগানের চমৎকার গ্র্যান্ডিফ্লোরার সুগন্ধ আর অন্যপাশে রাস্তায় মরতে বসা মনোহরপুকুর পার্কে বুভুক্ষু কলোনিতে আশ্রয় নেওয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের শরীরের প্রতীকী নোংরা দুর্গন্ধ। একদিকে রায়বাহাদুরের বসার ঘরে চা আর কেকের ভদ্রোচিত ভোজনলীলা চলছে, অন্যদিকে লঙ্গরখানায় দেওয়া খিচুড়ির ডেলা গোগ্রাসে গিলতে গিয়ে অসংখ্য অনাহারী দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গল্পটির পটভূমিকায় একটা ত্রিশঙ্কু সামাজিক দুরবস্থার সঙ্গে পরিচিত হই আমরা। যুবকের বর্ণনায় উঠে আসে, কীভাবে জাপানিদের আক্রমণের ভয়ে আকাশে চলছিল অ্যারোপ্লেনের পাহারা, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন মধ্যগগনে। এরই মধ্যে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ধুঁকছে দিনের পর দিন না খেতে পারা বুভুক্ষুর দল। যুবকের স্বগতোক্তি অনুযায়ী, পুরো দেশজুড়ে ক্ষুধা যেন মা-কালীর মতো রসনা মেলে দিয়েছিল তখন।

উইনস্টন চার্চিল বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের সম্পর্কে বলেছিল, 'ব্রিডিং লাইক র‍্যাবিটস'। আর গল্পে চার্চিলের সমগোত্রীয় রায়বাহাদুর দুর্ভিক্ষ-আক্রান্ত মানুষদের সম্পর্কে বলে: 'পার্কের এই ডেসটিচ্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমানো যায় না। বোধহয় খাবার-দাবার কিছু মিলেছে তাই এই চীৎকার। খেতে না পেলে চীৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই।'[২৮] এই রায়বাহাদুর ধরনের মানুষের আর্যত্ব বোধ প্রবল। নিজেদের সিদ্ধান্তকেই তারা শ্রেষ্ঠ মনে করে, বাকিদের তাচ্ছিল্য করতে বাধে না এদের। তাই তো চাকরির উমেদারিতে আসা এই যুবককে সে বলে:

> –তারপর, চাকরি পাচ্ছ না যুদ্ধের বাজারে? এম-এ পাশ করে কেরানীগিরির উমেদারী করছ? বী এ ম্যান ইয়াং ফ্রেন্ড, বেরিয়ে পড়ো অ্যাডভেঞ্চারে; চাকরি নাও অ্যাকটিভ সার্ভিসে, ভিড়ে পড়ো নেভিতে।[২৯]

সমাজের মূলধারা বিচ্ছিন্ন ইউটোপিয়ার জগতে বসবাসরত এইসব মানুষ উত্তর-উপনিবেশবাদীদের সমালোচনার মুখে পড়েছে বারবার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও তাই যুবকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের মানুষকে নিরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলেন । অ্যাসফল্টের চওড়া রাস্তা পরিবেষ্টিত, কালো মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো সিঁড়ি আর রঙিন কাঁচের জানালায় সিল্কের পর্দা বিশিষ্ট গৃহের অভ্যন্তরে কিমানো পরিহিত, হিরার আঙটি সজ্জিত রায়বাহাদুর যেভাবে তার বিলাসবহুল জীবনের আখ্যান রচনায় ব্যস্ত ছিল, সেসব দেখে যুবক শীতল নির্লিপ্ততায় প্রচণ্ড বিরক্তিবোধকেই উৎসারিত করছিল। 'হুলাহুলো ড্যান্স', 'ষ্টিভেনশন-ব্যালেন্টাইনের প্রবাল দ্বীপের দেশ', 'ফিলিপাইনের যাদুবিদ্যা'র গল্প কোনো কিছুই আকৃষ্ট করতে পারছিল না যুবককে। কারণ তার মন পড়েছিল পঁচিশ টাকার প্রাইভেট টিউশন বাঁচানোর তাগিদে। উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ব্রিটিশ শাসনের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্য দীর্ঘদিন অসংখ্য বাঙালিকে ব্যক্তিগত হীনম্মন্যতা এবং অস্তিত্বসংকটে ভুগিয়েছে। যার প্রমাণ গল্পের এই যুবক চরিত্রটি। শুধু একটা চাকরির আশায় উমেদারি করার জন্য সে রায়বাহাদুরের মতো অমানবিক একজন মানুষের মোসাহেবি করতে বাধ্য হয়েছিল।

তবে শেষপর্যন্ত যুবকের মধ্যে ধীরে ধীরে সংগঠিত বিপ্লব বিদ্রোহে রূপ নিয়েছিল রায়বাহাদুরের হাতে দেখা ইঞ্চি তিনেক লম্বা, চ্যাপটা আকৃতির একটি হাড়কে কেন্দ্র করে। রোডেশিয়ান স্বজাতীয় কোনো আদিমানবের চোয়ালের হাড়, যা রায়বাহাদুর মিন্ডানাও দ্বীপের কাটাবাটুর এক গ্রামের সর্দারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে। উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের মূল্যবোধ কত নিম্ন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, বাড়ির সামনে প্রতিমুহূর্তে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে; আর এই রায়বাহাদুর তাহিতি দ্বীপে বলি হওয়া, আগুনে পোড়া কুমারী মেয়ের হাড় নিয়ে গল্প ফেঁদে বসেছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানভাষ্য মানুষের এই মূল্যবোধহীনতা নিয়েও আলোচনা করে। উপনিবেশিত দেশগুলোর এক শ্রেণির শিক্ষিত মানুষ অর্থলোভে ও পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক মানসিকতায় জড়িয়ে বিবেকহীন অমানবিক সত্তায় পরিণত হয়। 'হাড়' গল্পে লেখক এই শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে রায়বাহাদুর চরিত্র সৃজন করলেও, পাশাপাশি ঐ সময়ের সমাজে শিক্ষিত আরেকটা শ্রেণি যে শাসকদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেছিল, তা বোঝাতেই যুবক চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সংঘটিত তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে বাঙালির বিদ্রোহী চেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানলের মতো। এই গল্পেও আমরা তার প্রভাব দেখি, যখন রায়বাহাদুরের বলা কুমারী মেয়েকে পোড়ানোর গল্পের মোহ কেটে গেলে হঠাৎ গল্পকথক উপলব্ধি করে তাহিতিতে নয় বরং মানুষ পুড়ছে কলকাতায়। রায়বাহাদুর সীমাহীন উৎসাহে তার হাড়টি সংগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছিল যেন সে কোনো রূপকথার গল্প বলছে। আর এদিকে যুবকের মানসপটেও চিত্রিত হয় এক ভয়ংকর রূপকথার আখ্যান। সে হিসেব মেলাতে থাকে যে, বাংলা থেকে কোন প্রেতের দল উঠে এল, যাদের মন্ত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মাঠভরা ফসল! সে বুঝতে পারে সারা পৃথিবী ক্ষুধায় উত্তাল হয়ে উঠলেও রায়বাহাদুরের বাগানের ফুলের গন্ধ, হিরার আঙটির উজ্জ্বলতা, নীল পর্দার রোশনাই কোনোটাই কমবে না। মনোহরপুকুর পার্ক থেকে অবিচ্ছিন্ন চিৎকার ভেসে আসলেও সেদিকে কর্ণপাত করবে না এই রায়বাহাদুরের দল। পলায়নপর এই মানুষগুলো নিজেদের চারপাশে সবসময়ই নৃশংসতার বৃত্ত রচনা করে। যেই বৃত্ত ভেদ করে কোনোদিনও তাদের মানবিক সত্তার জাগরণ ঘটে না। আর ঘটে না বলেই স্টিভেনশনের গল্পে বর্ণিত অতিনাটকীয় কাহিনি কিংবা লকলকে আগুনে কুমারী মেয়ের জীবন্ত পুড়ে যাওয়ার ঘটনা তাকে নৃশংস আনন্দ দেয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব আলোচনায় জানা যায়, শোষকগোষ্ঠীর বাস্তবতা-বিবর্জিত এসব নির্মম জীবনযাপনের কৌশল তাদের স্বার্থান্ধতা থেকে উদ্ভূত।

গল্পের শেষপর্যায়ে যুবকের মধ্যে তুমুল প্রতিবাদী চেতনা জেগে ওঠে। রায়বাহাদুর কুমারী মেয়ের হাড় সংগ্রহ করতে পারলেও সেই হাড় কাজে লাগিয়ে 'যাদুবিদ্যা' প্রয়োগের মন্ত্র শিখতে পারেনি বলে আফসোস করেছিল। এই নগ্ন বিলাসিতা যুবকের মধ্যে তীব্র ঘৃণাবোধের জন্ম দেয়, তার পঞ্চেন্দ্রিয়ে জেগে ওঠে বিপ্লবমন্ত্র। সে তার নাকে অমানুষিক গন্ধ পেতে শুরু করে; আগুনের গন্ধ ও পোড়া মানুষের গন্ধ। আর তার কানে এসে ধাক্কা দেয় দুর্ভিক্ষপীড়িত মৃতপ্রায় মানুষের গগনভেদী দানবীয় আর্তনাদ। তারপর রাস্তায় নেমে সে দেখতে পায়:

> সামনে ডাস্টবিন। পাশের অবগুণ্ঠিত ল্যাম্পপোস্ট থেকে একটা ছোট আলোকচক্র পড়েছে তার ওপর। তিন চার জন অমানুষিক মানুষ তার ভিতর হাত ডুবিয়ে খুঁজছে খাদ্য। একটু দূরেই একটা কঙ্কালসার কুকুরের ছায়ামূর্তি-

> নতুন প্রতিযোগীদের কাছে ভিড়বার ভরসা পাচ্ছে না। কাঠির মতো হাত-পা আর বেলুনের মতো পেট ওয়ালা একটা ছোট ছেলে দু'হাতে কী চুষছে প্রাণপণে। হাড়? হাঁ, হাড়ই তো।[৩০]

তখন দুই হাড়ের বৈপরীত্য চিন্তা করে, সে নিরন্ন বালকের হাতের হাড়টির প্রতীকে কলকাতার বুকে আসন্ন এক বিপ্লবের প্রত্যাশা করেছে। ছেলেটির হাতের হাড়টির সঙ্গে বলি দেওয়া কুমারী মেয়ের হাড়ের সাযুজ্য খুঁজে পায় যুবকটি। তাহিতির আকাশের রুধিরাক্ত মেঘ, আগুনঝড় এবং তাজা রক্তের বৃষ্টির সমান্তরালে সে প্রত্যাশা করে বাংলার আকাশেও কালো মেঘ কেটে গিয়ে বিদ্রোহের আগুন-লাল রং প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে। তাই যুবকের অনুচ্চারিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে আগাম বিপ্লবের বীজমন্ত্র: 'হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকী।'[৩১] এই যুবককে আমরা লেখকের প্রতিনিধি বলতেই পারি। লেখক নাটকীয় ভঙ্গিতে গল্পটি শেষ করলেও, যুবকের চিন্তায় প্রবল মানবিকতাবোধকে জাগ্রত করেছেন প্রকৃষ্টরূপেই। যেটি নিঃসন্দেহে লেখকের উত্তর-উপনিবেশি মনের পরিচায়ক।

৬.৪

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার ও ভিন্ন আঙ্গিকের গল্প সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'নয়নচারা'। তবে গল্পের প্রেক্ষাপটটি যথারীতি ওপরে আলোচিত অন্য গল্পগুলোর মতোই তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সাক্ষ্যবহ। গল্পে আমরা পাই প্রধান চরিত্র আমুকে, যার চোখ দিয়ে দেখা দুর্ভিক্ষের চিত্র লেখকের বয়ানে গল্পের আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। গল্পে আমুর নারী বা পুরুষ সত্তার চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছিল তার 'মানুষ' সত্তা। এখানে লৈঙ্গিক পরিচয়ের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে শ্রেণিগত পরিচয়। আমুর মধ্যে 'অপরতা'বোধজনিত হীনম্মন্যতা দেখা যায় গল্পের শুরুতে। উত্তর-উপনিবেশবাদ চর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক উপনিবেশিত মানুষদের এই পরাজিত সত্তার হাহাকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। উপনিবেশিতদের একাংশ দীর্ঘদিন নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হতে ধরেই নেয় যে তারা পরাধীন, মেনেই নেয় যে অন্য কেউ তাদের থেকে বেশি শক্তিশালী। এই গল্পে আমুও তাই দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে করতে একপর্যায়ে প্রায় পরাজিতই হতে গিয়েছিল–

> আমুর সমস্ত মন স্তব্ধ, এবং নুয়ে রয়েছে অনুতপ্ত অপরাধীর মতো। সে ক্ষমা চায়: শক্তিশালীর কাছে সে ক্ষমা চায়। যেহেতু শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সে-ন্যায়ের প্রতি অন্যায় করা গুরুতর পাপ। সে পাপ করেছে, এবং তাই সে ক্ষমা চায়: দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক।[৩২]

কিন্তু আমু শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করেনি। যদিও ভুতনির ভাই ভুতোর মৃত্যুর প্রসঙ্গে আমুর বিশ্লেষণে উঠে আসে যে, তৎকালীন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জীবন-মৃত্যুর পরিক্রমা ছিলো দু-রঙা দানায় গাঁথা মালার মতো সস্তা ও মূল্যহীন। তবুও গল্পের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে জানতে পারি, নানা অলিগলি ঘুরে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় আমু এসে পড়েছিল। অর্থাৎ গল্পে কথিত 'শক্তিশালী'দের তীব্র অমানবিক আচরণ এবং চূড়ান্ত অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও অবহেলা এড়িয়ে আমু এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল তার দুর্দমনীয় জীবনীশক্তিতে। দুর্ভিক্ষ আর ক্ষুধাকে ক্যানভাস করে লেখক এই গল্পে মূলত আত্মশক্তির উদ্বোধনের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

ঔপনিবেশিক শক্তি আর তাদের তোষামোদকারী শ্রেণি সবসময়ই নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। আমুর বয়ানে, লেখকের বিপ্লবী চেতনায় আমরা সেই শ্রেষ্ঠত্বের খোলসকে ভেঙে পড়তে দেখি বারবার।

আমু তার গ্রাম নয়নচারা থেকে শহরে আসে ভুতো ও ভুতনির সঙ্গে। রাস্তায় ঠাঁই নেয়। ক্ষুধার যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে স্বাভাবিকত্ব লোপ পায় তার। চেতন-অবচেতনের মাঝে দোদুল্যমান আমুর বেঁচে থাকার লড়াইকে লেখক চেতনাপ্রবাহরীতি (Stream of Conciousness) এবং পরাবাস্তবধর্মী (Surrealistic) পরিচর্যায় বর্ণনা করেছেন। তবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কৌশলে আমু চরিত্রের মাধ্যমে একজন উত্তর-ঔপনিবেশিক চৈতন্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান, যে খুঁজতে চায় নিজেকে, আপন ঠিকানাকে, সত্তাকে, অস্তিত্বকে। তাই শহরের প্রতিটি ভালো-মন্দ জিনিসকে আমু তুলনা করে তার গ্রামের সঙ্গে। কলকাতা মহানগরী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে সৃষ্টি হয়েছিল, অন্যদিকে নয়নচারার মতো অসংখ্য গ্রাম ছিল অবহেলিত, ঔপনিবেশিক শোষণে পিষ্ট। তাই এই গল্পে আমু চরিত্রের মাধ্যমে বারবার শহরের নিষ্ঠুরতার বিপরীতে গ্রামের মানবিকতার তুলনা, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লেখকের সচেতন প্রতিবাদী অবস্থানকেই চিহ্নিত করে। তাই শহরের প্রশস্ত রাস্তাকে আমু তার গ্রামের ময়ূরাক্ষী নদীর সঙ্গে তুলনা করে, দুর্ভিক্ষপীড়িত আশ্রয়হীন মানুষের শহরের ফুটপাথে শুয়ে থাকাকে সে ছড়ানো খড়ের সঙ্গে তুলনা করে। শহরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে আকাশের তারা দেখে যে তুলনা করে, তা দেখলেই ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হবে:

> সে ভরা চোখে তাকাল ওপরের পানে-তারার পানে, এবং অকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবল, ওই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখত? কিন্তু সে তারাগুলোর নিচে ছিল ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য, আর ময়ূরাক্ষী। আর এ-তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েছে শুধু হিংসাবিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা, অসহ্য বৈরিতা।[৩৩]

শহরের সুন্দরতম জিনিসকেও সে দুর্ভিক্ষের বীভৎসতার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে। ব্যাপারটিকে আপাত দৃষ্টিতে চৈতন্যপ্রবাহ মনে হলেও লেখকের ইঙ্গিত চোখ এড়ায় না। শহরের চর্চিত-সুন্দর মেয়ের শাড়ির পাড়ের টকটকে লাল রঙকে আমু নয়নচারা গ্রামের করিম মিঞার মুখ দিয়ে ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্তের সঙ্গে তুলনা করে। ঔপনিবেশিক শক্তির ব্রাহ্মণত্ব ভেঙেচুরে যায়, যুগ্ম-বৈপরীত্যজাত সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ লোপ পায়। এসবই কিন্তু লেখকের উত্তর-উপনিবেশবাদী চিন্তার ফল। আমুকে দিয়ে লেখক এমনকি শহুরে নারীর পরিপাটি চুলকেও গ্রামের মেয়ে ঝিরার মাথার চুলের সঙ্গে মেলান। গল্প শেষে যে নারী আমুকে ভাত খেতে দেয়, তাকেও আমু মনে করে তার গ্রাম নয়নচারার মেয়ে। অর্থাৎ যা কিছু ভালো, সবই আমুর নিজ গ্রামের। এই নিজস্বতাবোধও উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানভাষ্যের বিবেচ্য।

এখানে গ্রাম-শহরের পার্থক্য আসলে শাসক-শোষিতের পার্থক্য। দুর্ভিক্ষে সহায়-সম্বলহীন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মধ্যস্বত্বভোগী সুবিধালোভী আরেক শ্রেণির মানুষের পার্থক্য, যারা দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিব্যি খেয়ে পরে বেঁচে তো ছিলই, উপরন্তু বিলাসবহুল জীবনযাপনেও ব্যস্ত ছিল। আমু চরিত্রকে আশ্রয় করে সমাজ-সচেতন ওয়ালীউল্লাহ বারবার এই স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী অমানবিক মানুষগুলোর মুখোশ উন্মোচন করেছেন। আমুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর, তখন বিড়ি ফুঁকতে থাকা মানুষকে আমু তুলনা করেছে শয়তানের সঙ্গে। অস্তিত্ব-সংকট থেকে উদ্ভূত পরাবাস্তব পরিস্থিতিতে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত আমুর কাছে একটা দোকানে ঝুলতে থাকা কলার মতো একটি সাধারণ খাবারকেও হলুদরঙা স্বপ্নসম মনে হয়। পক্ষান্তরে ময়রার চোখের দৃষ্টিকে মিষ্টান্নের মতো ননীকোমল নয় বরং হিংস্র বলে আখ্যায়িত করে সে। অর্থাৎ আমুর ক্ষয়িত ও নিষ্পেষিত মানবিক সত্তায় তীব্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে ওঠে অস্তিত্বচেতনা। পাশাপাশি আমুর শ্রেণি সচেতনতার পরিচয় পাওয়া

যায় ময়রার দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে খাবারের আশায় থাকার সময়: 'ময়রার দোকানে আলো জ্বলে, কারা খেতে আসে, কারা খায়, আর পয়সা ঝনঝন করে: কিন্তু এধারে কাচ। কাচের এপাশে মাছি, আর পথ আর আমু।'[৩৪] শহরের মানুষের স্বার্থান্ধতায় ক্ষিপ্ত হয়ে, তাদের চোখে নকল চশমা পরা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে আমু। অর্থাৎ বলতে চেয়েছে তারা চোখ থাকতেও অন্ধ এবং তাদের আসল ও নকল চোখে কোনো তফাৎ নেই। নিজেকে মাছি এবং পথের সমান্তরালে দাঁড় করিয়ে আমু যেন নিজের শ্রেণিগত অবস্থানকেই সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। একটি দোকানের লোক তাকে ভুলবশত কুকুর ভেবে তাড়া করেছে, নিজেকে এই সান্ত্বনা দিলেও আমুর এই তুলনা শাসক ও শোষিতের অবস্থানগত পার্থক্যকে তুলে ধরে আমাদের সামনে। যা মূলত সমাজ নিরীক্ষণে লেখকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে।

আমু শহরের লোকদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করে তাদের কৃত্রিমতা, হিংস্রতা ও পাশবিকতার মুখোশ উন্মোচন করেছে। তার কাছে মনে হয়েছে গ্রামে মানুষ এত সহৃদয় যে, কুকুর সেখানে তুলনামূলক হিংস্র প্রাণী আর শহরে মানুষ এত নির্দয় ও নিষ্ঠুর যে, এখানে কুকুর অপেক্ষাকৃত কম পাশবিক। আবার দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার ও ক্রন্দনের বিপরীতে শাহরিক মানুষের বিলাসী কোলাহলকে আমু কুকুরের কামড়াকামড়ির সঙ্গে তুলনা করেছে। তার ভাষ্যমতে, তারা বাইরে মানুষের মতো দেখতে হলেও তাদের ভেতরটা একেবারেই কুকুরের মতো। এই গল্পে মাঝেমধ্যেই সে বিদ্রোহী ও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক শহুরে মানুষের সায়ন্তন ঘরাভিমুখ চাঞ্চল্যকে সে ব্যাখ্যা করেছে তীব্র শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে। শহুরে মানুষগুলোকে দৈত্যসম এবং তাদের গৃহগুলোকে অলৌকিক গুহার প্রতীকে চিত্রায়িত করে লেখক আমুর মাধ্যমে যা বলিয়ে নিয়েছিলেন গল্পে, তা তৎকালীন শাসক শ্রেণির ভোগলিপ্সু মানসিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লেখকের ক্ষুরধার প্রতিবাদেরই পরিচায়ক বটে।

> কোন-সে গুহায় ফিরে যাবার জন্যে তাদের এ-উগ্র ব্যস্ততা? সে-গুহা কি ক্ষুধার? এবং সে-গুহায় কি স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে মাংসের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তূপ? কত বৃহৎ সে-গুহা?[৩৫]

পুরো গল্পজুড়ে এভাবেই আমু চরিত্রটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উত্তর-উপনিবেশবাদী দর্শনের রূপরেখাকে ফুটিয়ে তোলে। গল্পে আমু সগর্বে নিজেকে মানুষ বলে দাবি করেছে: 'কিন্তু আমু মানুষ, ভেতরে-বাইরে মানুষ।'[৩৬] আমু ও তার সহযাত্রী ভুতো, ভুতনির নামে উপনিবেশিত নিম্নবর্গের ছাপ থাকা সত্ত্বেও, আমুর নিজেকে 'মানুষ' বলে দাবি করার এই সংকল্প লেখকের মনুষ্যত্ববোধকেই প্রকাশ করে।

৭

ঔপনিবেশিক আগ্রাসন ও আধিপত্যের অবসান ঘটানোর প্রচেষ্টায়, উপনিবেশিত সমাজের সামগ্রিক মুক্তি ও উন্নয়ন-প্রত্যাশী উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বকথা আজ পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। উপনিবেশজাত যুগ্ম-বৈপরীত্যসূচক ধারণা তথা 'অপরতা'ভেদের অবসান ঘটিয়ে আপন সত্তাকে খুঁজে নিয়ে সত্য ও কল্যাণের পথে এগিয়ে মানবতার জয় ঘোষণাই এই জ্ঞানভাষ্যের প্রধান উপজীব্য। যদিও বি-উপনিবেশিত সমাজে উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চা বিশ্বখ্যাত তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিগত শতকের ষাটের দশক থেকে। কিন্তু বাংলা ভাষার

সাহিত্যিকদের মধ্যে তারও অনেক বছর আগে থেকে, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশ গঠনের প্রায় শুরু থেকেই, এই উপনিবেশ-উত্তর মানসিকতা এবং তার প্রভাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যচর্চার ধারা কমবেশি মাত্রায় বিরাজমান ছিল। আর এই ধারা দুই মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, বিশেষত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রায় অন্তিম পর্যায়ে এসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মানবসৃষ্ট তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে কীভাবে গতিশীল হয়ে উঠেছিল, উপর্যুক্ত আলোচনায় সেটির অনুসন্ধানই করা হয়েছে। সাহিত্যিকরা বেশি মাত্রায় সমাজসচেতন ও ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হন। তাঁরা একই সঙ্গে হন বিপ্লবী ও কল্যাণকামী। তাই ঔপনিবেশিক আমলের বাংলা সাহিত্যের লেখকরাও উপনিবেশের করাল গ্রাসের ফলে উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে, প্রতিবাদী চেতনায় জারিত হয়ে, অসামান্য শিল্পকৌশলে উপনিবেশ-উত্তীর্ণ পথেরই সন্ধান দিয়েছেন সর্বদা। আলোচ্য গল্প চারটিতে আমরা যার প্রোজ্জ্বল প্রয়াস অনুধাবনে সক্ষম হই।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth and Tiffin, Helen, *Post-colonial studies: the key concepts*, Routledge, London, 2007, p. 168

২. Mushtaq, Hammad; Ahmad, Khurshid and Rafi, Muhammad, *Analysis of Postcolonialism Literature: A Bibliometric Study from 1900 to 2017, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries,* An International Online Open Accessed Peer Reviwed Sceintific Journal of Library and Information Science, 2018, DOI: 10.2139/ssrn.3464193, pp. 204-207 https://www.researchgate.net/publication/331477731

৩. ফয়েজ আলম, *উত্তর-উপনিবেশী মন, উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ*, ফকরুল চৌধুরী সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৫১

৪. সৈয়দ আজিজুল হক, *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৫০

৫. Ashcroft, Bill, পূর্বোক্ত, p. 36-37

৬. মলয় রায় চৌধুরী, *উত্তর-ঔপনিবেশিকতা, পোস্টকলোনিয়ালিজম: উত্তর-ঔপনিবেশিকতা*, সমীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, হাওয়া উনপঞ্চাশ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৫

৭. Fanon, Frantz, *Black skin, white masks*, Translated by Charles Lamm Markmann and Paul Gilroy, Pluto Press, London , 1986, p. 93

৮. Woodrow, Henry, *Macaulay's Minutes on Education in India: Written in the Years 1835, 1836, and 1837 and Now First Collected from Records in the Department of Public Instruction*, Unknown Binding, Kolkata, 1862, p. 115

৯. Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth and Tiffin, Helen, *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literature,* Taylor and Francis, Florence, 2004, p. 117

১০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও নজরুল সাহিত্য*, *সাহিত্য পত্রিকা*, বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ৫১, সংখ্যা ১, ২০১৩, পৃ. ১৩

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বহুরাজকতা", 'রাজা প্রজা', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১০, পৃ. ১০৩-১০৬

১২. কাজী নজরুল ইসলাম সর্বপ্রথম এই কথাটি উচ্চারণ করেন 'ধূমকেতু' পত্রিকার ১৩শ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩ অক্টোবর ১৯২২ তারিখে। বলা হয়ে থাকে, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তৎকালীন কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সরাসরি উচ্চারণ করেছিলেন এই বক্তব্যের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে এই লেখা 'ধূমকেতু'র পথ' নামক প্রবন্ধ হিসেবে *'রুদ্র-মঙ্গল'* (১৯২৭) প্রবন্ধ-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধে উক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে রহমান হাবিব সম্পাদিত *রুদ্র-মঙ্গল* গ্রন্থ থেকে, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৯

১৩. Fanon, Frantz, পূর্বোক্ত, p. 220

১৪. Spivak, Gayatri Chakravorty and Harasym, Sarah, *The Post-Colonial Critic*, Routledge, New York, 1990, p. 31
১৫. Gramci, Antonio, *Selection from the Prison Note-Books*, The Electric Book Company Limited, London, 1999, p. 57
১৬. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৭৮-২৮০
১৭. Government of British India, *Famine Inquiry Commission (Woodhead Commission) Final Report*, Report on Bengal, New Delhi, p. 103
১৮. Polya, Gideon Maxwell, *Jane Austen and the Black Whole of British History: colonial rapacity, holocaust denial and the crisis in biological sustainability*, G.M. Polya, Melbourne, 2008, p. 133
১৯. *The Guardian* সংবাদপত্রের ২৯ মার্চ, ২০১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত *Churchill's policies contributed to 1943 Bengal famine- study* নিবন্ধটিতে ড. বিমল মিশ্রর মূল বক্তব্যটি ছিল: 'This was a unique famine, caused by policy failure instead of any monsoon failure.' উক্ত নিবন্ধে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেনের ১৯৮১ সালের বক্তব্যটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল: 'there should still have been enough supplies to feed the region, and that the mass deaths came about as a combination of wartime inflation, speculative buying and panic hoarding, which together pushed the price of food out of the reach of poor Bengalis.'
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/29/winston-churchill-policies-contributed-to-1943-bengal-famine-study
২০. Toye, Richard, *Churchill's Empire: The world that made him and the world he made*, Henry Holt and Company, LLC, New York, 2010, pp. 301-302
২১. Mukerjee, Madhusree, *Churchill's Secret War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II*, Basic Books, New York, 2010, pp. 262-264
২২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, শুভম প্রকাশনা, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩৬৪
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৪
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫
২৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক গ্রন্থাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৬০
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৯
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭
২৮. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আশা দেবী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৭১
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৯
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৩
৩১. পূর্বোক্ত
৩২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *গল্পসমগ্র*, হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, প্রতীক, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৬
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, আটত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৭/ডিসেম্বর ২০২০

শওকত আলীর উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্ব

মোঃ আঙ্গুর হোসেন*

সারসংক্ষেপ

ষাটের দশকে বাংলাদেশের উপন্যাসে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য আনয়ন করেন জীবনশিল্পী শওকত আলী। বাঙালির অতীত ইতিহাস উপস্থাপনায় যেমন তিনি ঋদ্ধ ও প্রসিদ্ধ, অন্যদিকে নবগঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপকারও তিনি। বিশেষত, নাগরিক মধ্যবিত্তের নানা অসংগতি ও অসংলগ্নতার ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। সেই সাথে নাগরিক মধ্যবিত্তের মনোগভীরে অনুপ্রবেশ করে অন্বেষণ করেছেন তাদের বহুবিধ মনস্তাত্ত্বিক সংকট ও অন্তরঙ্গ জীবনের অকাট্য সত্যকে। মধ্যবিত্তমানসের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনোভাব, ইন্দ্রিয়জবাসনাপূর্ণ প্রণয়, দাম্পত্য-সংকট ও নরনারীর অবদমিত জীবনাকাঙ্ক্ষা কীরূপে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টি করে এবং সেই সাথে তাদের ব্যক্তিত্বহীনতা, মনোবিকলন, স্থূল ও বিকৃত রুচি অন্যের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে আলোচ্য প্রবন্ধে সে-বিষয়গুলো উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছি।

মেধা, মনন, পরিশীলিত-চিন্তা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যকে অনন্য স্থানে নিয়ে গেছেন শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮)। তাঁর লেখায় যেমন রয়েছে বিষয়ের অভিনবত্ব, তেমনি রয়েছে কাঠামোগত নতুন মাত্রা। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনকে দেখেছেন ভিন্ন ও নতুন দৃষ্টিতে। যেখানে তুলে এনেছেন সমকালীন সময় ও সময়ের অন্তরালে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনা। সেখানে তিনি বাদ দিতে পারেননি সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও। তাঁর উপন্যাসের একটা বড় অংশে আলোচিত হয়েছে বাংলা অঞ্চল তথা বাংলাদেশের রাজনীতি। তাঁর রচনায় যে রাজনীতি উঠে এসেছে, সেখানে রয়েছে অভিজ্ঞতানির্ভর বিষয়বিন্যাস। রাজনীতির পাশাপাশি তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে ইতিহাসের সত্য আবহ ও ঐতিহ্যের প্রতি প্রবল আন্তরিকতা। সমাজমনস্ক ও সমাজসচেতন জীবনশিল্পী শওকত আলী সমাজকে তাঁর লেখায় ধারণ করেছেন স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে। সমাজের অন্তবর্তী মানুষের জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তুলে এনেছেন মানুষের চলমান জীবনের বিচিত্র দিক। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ ভালোবাসা ও প্রবল আন্তরিকতা। মানবিক দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বলা যায়, "জীবনকে গভীরভাবে অনুধাবন, চরিত্রের মনোগভীরে প্রবেশের সক্ষমতা, তাদের পরমসূক্ষ্ম ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে উন্মোচন ও বিশ্লেষণের দক্ষতার মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এই ঔপন্যাসিক সামর্থ্য।"[১]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে মানুষের জীবনের ভয়াবহ বিপর্যয় ঔপন্যাসিকের নতুন চিন্তার দ্বার খুলে দেয়। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর রচিত সাতচল্লিশ-পরবর্তী বিভিন্ন উপন্যাসে।

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা।

পাশাপাশি তাঁর চিন্তায় ধরা পড়েছে নবগঠিত ষাটের দশকের নতুন রাষ্ট্রের নানা হালচাল। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সন্নিবেশে রচিত হয়েছে বেশ কয়েকটি উপন্যাস। পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন শক্তির দ্বারা সমকালীন গতানুগতিক ধারাকে উপেক্ষা করে রচনা করেছেন নবগঠিত নতুন বাংলাদেশের তথা বাঙালির জীবনের অন্তরালবর্তী বিচিত্র দিক। যে জীবনে স্থান পেয়েছে বাঙালির প্রদোষকাল থেকে আধুনিক কালের জীবন। বাঙালির দীর্ঘদিনের টিকে থাকার কঠোর সংগ্রাম, শাসক শ্রেণির শোষণনির্ভর সমাজে বেঁচে থাকার লড়াই ও তাদের জীবনের অন্তর্নিহিত নানা দিক ব্যাপ্ত পরিসরে স্থান পেয়েছে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। সাধারণ গ্রামীণ মানুষের দুঃখ-জর্জরিত জীবনের ইতিকথা উত্থাপনের পাশাপাশি প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সমন্বয়ে বিস্তৃত পরিসরে অঙ্কিত হয়েছে নাগরিক জীবন। "স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসে মূলত মধ্যবিত্ত মানসের বহুমুখী জটিলতার রূপায়ণ ঘটেছে। সমষ্টিবিচ্ছিন্ন যন্ত্রণা, আত্মরতি, রিরংসা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ট্রাজেডি এবং ব্যক্তিগত উপভোগচেতনার যোগফল হচ্ছে মধ্যবিত্ত জীবন।"[২] নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনের বিচিত্র দিক সুনিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। যেখানে ছিল লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রখর নির্মোহ দৃষ্টি ও প্রগাঢ় আন্তরিকতা। উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুখোশ উন্মোচন করা। আধুনিক জীবনের নেতিবাচক প্রভাব কীভাবে মানবমন ও সমাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তা দেখানো।

নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র উপস্থাপনে শুধু শওকত আলী একা অবদান রাখেননি। তাঁর আগে বা সমকালে বাংলাদেশের উপন্যাস অঙ্গনে এ শ্রেণির নানা স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। যাঁরা এই বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজিয়া খান, সৈয়দ শামসুল হক ও আলাউদ্দিন আল-আজাদ প্রমুখ। তাঁরা উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের নানা প্রসঙ্গ এনেছেন। তবে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের জটিল চিত্র, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, বিকৃত রুচি, অস্তিত্বের সংগ্রাম, মনস্তাত্ত্বিক সংকট, পারস্পরিক হৃদ্যতাজনিত সংকট, পারিবারিক জটিলতা, দাম্পত্য সংকটজনিত মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েন, ইন্দ্রিয়জবাসনাপূর্ণ বিকৃত রুচি, ব্যক্তির একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধ, ব্যক্তির বিনষ্টি ও মনোযন্ত্রণা, অর্থলিপ্সু লোভী মানসিকতা, আন্তরিকতা ও দায়িত্বহীনতার অভাব, পুঁজিবাদী মনোভাবের প্রতি আকর্ষণ, নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক মূল্যবোধহীনতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো শওকত আলীর নাগরিক মধ্যবিত্তনির্ভর উপন্যাসগুলোতে উঠে এসেছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সম্মিলনে। এ বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> ... উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। উঠতি নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মোন্নতিকামিতা, উচ্চাভিলাষ, স্বার্থপরতা, রুচি-বিকৃতি, তাদের কাম-ক্রোধ-হিংস্রতার কথা রয়েছে এসব উপন্যাসে। তাদের মূল্যবোধহীনতা, স্থূলতা, স্খলন ও বিনষ্টির চিত্র পাওয়া যায় এখানে। ব্যক্তির পরিবার সমাজ সত্তাবিচ্ছিন্নতা ও বিনাশের চিত্রও রয়েছে। সমকালীন অস্থির সময়ে উঠতি মধ্যবিত্তদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে আত্মকেন্দ্রিক ও বিভিন্ন জীবনের বেদনাময় প্রান্তও উন্মোচিত হয়েছে এসব উপন্যাসে।[৩]

শওকত আলীর উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব এসেছে *যাত্রা (১৯৭৬)*, *উত্তরের খেপ (১৯৯২)*, *অবশেষে প্রপাত (১৯৯৬)*, *দলিল (২০০০)*, *ঘরবাড়ি (২০০১)* ইত্যাদি উপন্যাসে। এছাড়া তাঁর নাগরিক মধ্যবিত্তনির্ভর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো– *পিঙ্গল আকাশ*

(১৯৬৩), *অপেক্ষা* (১৯৮৫), *গন্তব্যে অতঃপর* (১৯৮৭), *ভালোবাসা কারে কয়* (১৯৮৮), *যেতে চাই* (১৯৮৮), *বাসর ও মধুচন্দ্রিমা* (১৯৯০), *প্রেম কাহিনী* (১৯৯১), *পতন* (১৯৯২), *জননী ও জাতিকা* (২০০১), *তনয়ার স্বীকারোক্তি* (২০০১), *জোড় বিজোড়* (২০০১), *শেষ বিকেলের রোদ* (২০০১), *এক ডাইনীর গেন্ডুয়া খেলা* (২০০১), *স্থায়ী ঠিকানা* (২০০৫) প্রভৃতি। নাগরিক মধ্যবিত্তের অবয়বে রচিত এসব উপন্যাসে প্রধানত পাঁচটি বিষয় মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রথমত, নাগরিক মধ্যবিত্তের অসংযত ও অসংলগ্ন জীবন; দ্বিতীয়ত, মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষাজনিত অসংগতি ও পারিবারিক সংকট; তৃতীয়ত, নাগরিক মধ্যবিত্তের বিবাহবহির্ভূত প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের মনস্তাত্ত্বিক সংকট; চতুর্থত, আধুনিক নরনারীর সম্পর্ক ও প্রেমের অস্বাভাবিকতা; পঞ্চমত, মধ্যবিত্ত নাগরিকের লিবিডো ভাবনানির্ভর মানসিকতা।

২

মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চাওয়া ও না পাওয়ার দ্বন্দ্ব, শ্রেণি উত্তরণের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও সুবিধাবাদ। তবে শিক্ষা ও যুক্তিশীলতাকে ব্যবহার করে তারা উচ্চবিত্তের দিকে ক্রমশ ধাবিত হওয়ার চেষ্টায় রত। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের সাথে প্রতিতুলনায় স্বাভাবিকভাবেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির আচার-ব্যবহার, মানসিকতা ও চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সমাজের মধ্যবর্তী স্তরে এ-শ্রেণির অবস্থান। যদিও সমাজবিজ্ঞানীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে একটি শ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করেন না। তবুও অর্থের মানদণ্ডে ও সামাজিক স্তর-বিন্যাসে মধ্যম পর্যায়কে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলা হয়ে থাকে। ইউরোপে বিশেষ করে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যবিত্তের ধারণা কিছুটা আলাদা। ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে 'বুর্জোয়া' বলা হয়। ইংল্যান্ডে তারা 'মধ্যশ্রেণি' হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ সমাজের মধ্যস্তরে অবস্থান ছিল ইংল্যান্ডের এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির। সমাজের একদিকে ছিল সামন্তশ্রেণি ও যাজক সম্প্রদায়, অন্যদিকে ছিল শ্রমিক শ্রেণির অবস্থান। ইংল্যান্ডে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিরা মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থান করত। আর্থিক দিক থেকে বিত্তবান হলেও সামাজিক অবস্থানের কারণে তারা 'মধ্যশ্রেণি' হিসেবে পরিচিত ছিলো। একজন সমালোচক মধ্যবর্তী শ্রেণির পরিচয় চিহ্নিত করেছেন এভাবে–

> বিত্তবান পুঁজিপতি ও বিত্তহীন শ্রমজীবী, উভয় শ্রেণি মধ্যবর্তী রেখায় অস্তিত্বশীল একটি জনসম্প্রদায় মধ্যবর্তী শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত। তারা ধনীও নয়, দরিদ্র নয়, তারা পেশাজীবী, শ্রমজীবী নয়।[৪]

পেশা ও আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বিবেচনা করা হয়। সম্পদ সীমিত হওয়ার কারণে এমন ধরনের জীবিকা নির্বাহ করে তারা জীবন পরিচালনা করে। যেখানে তাদের শারীরিক শ্রম অপেক্ষা মানসিক শ্রমের প্রাধান্য থাকে। তাদের পরনির্ভরশীল জনগোষ্ঠীও বলা হয়। কারণ, তারা শারীরিক শ্রমে আগ্রহী নয়। যারা শ্রমজীবী, তাদের উৎপাদিত অর্থের উপর নির্ভর করে তারা জীবনযাপন করে। এ শ্রেণির জনগোষ্ঠী কায়িক শ্রম অপেক্ষা মানসিক শ্রম বেশি করে থাকে। তাই তারা পেশাজীবী হিসেবে পরিচিত। জীবনের প্রয়োজনে তারা নানা ধরনের পেশা গ্রহণ করে। তারা উন্নত রুচি, আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করে। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত হয়েছে পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে। কারণ, তারা বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করে। অতএব, সমাজের বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে অবস্থানকারী, তাদের কোনো উৎপাদন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা নেই। কিন্তু

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, উন্নত রুচি, পরিশীলিত সংস্কৃতি নিয়ে তারা জীবন অতিবাহিত করে। তারা কায়িক শ্রম না করলেও বিদ্যা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে জীবন পরিচালনা করে। যেমন– শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মচারী-কর্মকর্তা, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, লেখক, শিল্পী ও রাজনীতিবিদ প্রভৃতি শ্রেণিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলা হয়। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে ভিন্নভাবে। এখানে–

> মধ্যবিত্তের বিকাশে এ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ ও সাহিত্য প্রতি ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও আত্মসর্বস্ব।[৫]

ইউরোপে যেভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে, এদেশে সেভাবে হয়নি। ইউরোপে একদিকে যেমন বাণিজ্যিক ও শিল্পপুঁজি গঠিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সামন্ত বিরোধের মাধ্যমে একটি বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। যারা উৎপাদনকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী ও সম্পদশালী হয়েছে। তবে প্রথম দিকে পুরনো মধ্যবিত্ত শ্রেণিরা যেমন উৎপাদক ছিল, তেমনই পরবর্তী সময়ে সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পেশাজীবীর মাধ্যমে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু বাংলাদেশে মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্য, সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানে। ইউরোপীয় শাসক শ্রেণি নিজেদের স্বার্থের জন্য একটি জনগোষ্ঠী গড়ে তোলে। যারা এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে পরিচিত। তবে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, তাদের স্বার্থরক্ষা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন যেমন একদিকে ছিল, অন্যদিকে নিজেদের উন্নত ও মানসম্মত ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠা ছিল প্রধানতম লক্ষ্য। তারা ছিলেন উৎপাদন-সম্পর্কহীন পেশাজীবী শ্রেণি। যারা বিদেশি শাসকশ্রেণির সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে স্বদেশে নিজের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য– "ব্রিটিশ পুঁজির সহযোগী হয়ে গড়ে উঠতে লাগল ভারতীয় পুঁজি; আর উভয় পুঁজির পক্ষপুটে লালিত, বর্ধিত হয়ে উঠল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি।"[৬] এ প্রবন্ধে নাগরিক মধ্যবিত্তের নানা প্রসঙ্গ ও তাদের জীবনের মনস্তাত্ত্বিক সংকট লেখক বিভিন্ন উপন্যাসে কীভাবে পরিস্ফুটিত করেছেন তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

৩

বিশ শতক থেকে মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বটি বহুল আলোচিত ও জনপ্রিয়। মানুষের সত্তা, অস্তিত্ব, স্বজ্ঞা, প্রজ্ঞা ও সংবেদন ইত্যাদি বন্দি হয়ে আছে তার মনের চেতন ও অবচেতন ঘরে। মনস্তত্ত্ব বা মানবমনের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে প্রথমে হাজির হয়েছেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। তারপর একে একে এসেছেন ইয়ুং, অ্যাডলার, প্যাভলভ, এরিক ফ্রম এবং জ্যাক লাকাঁ প্রমুখ। তবে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের এ বিষয়ক ধারণাটি বহুল প্রচলিত। এ তত্ত্বে মানুষের সকল সাংস্কৃতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের পেছনে অবচেতন মনের ভূমিকা আবিষ্কার ও বিশ্লেষণ করা হয়। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের মন প্রতিনিয়ত গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। মন নিয়ন্ত্রিত হয় সহজাত প্রবৃত্তি, তাড়না, গূঢ়ৈষা, বিরোধ, অবদমন ইত্যাদির মতো কিছু ইচ্ছামূলক ক্রিয়ার দ্বারা। ফ্রয়েড মানুষের দুটি ধর্মের কথা বলেছেন। ধর্ম দুটি হলো আনন্দধর্ম ও বাস্তবধর্ম। মানুষ আনন্দধর্ম দ্বারা তার কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তিকে প্রকাশ করে। অন্যদিকে বাস্তবধর্ম তার বাস্তববুদ্ধির ফসল। সে জানে বিভিন্ন কারণে তার সকল কামনা-বাসনা পূরণ হবার নয়। তার মধ্যে সামাজিক বিধিনিষেধ ও

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জড়িয়ে আছে। তাই তারা তাদের আনন্দ উপভোগকে বিশাল মাত্রায় জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয়ে যায়। অন্তত পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এর নাম অবদমন বা repression। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য–

> আমাদের মনের তিনটি স্তরের কথা বলেন ফ্রয়েড: ইদ (id), ইগো (ego) এবং সুপারইগো (superego) অর্থাৎ অবচেতন, অর্ধচেতন এবং সচেতন মন। আমরা আমাদের অপূর্ণ কামনা-বাসনাগুলোকে ঠেলে পাঠাই যে স্থানে তার নাম 'ইদ', Unconscious বা অবচেতন। এই আনন্দধর্মের অবচেতনে নির্বাসনের প্রক্রিয়াটি শুরু হয় শৈশবেই।[৭]

সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও জ্যাক লাকাঁর তত্ত্বসমূহের উপর ভিত্তি করেই মনোবিশ্লেষণী তত্ত্বটি দাঁড়িয়েছে। তবে জ্যাক লাকাঁর মনস্তাত্ত্বিক দর্শনে মনকে রহস্যময় ও অব্যাখ্যাত সাবজেকটিভ ব্যাপার বলা হয়েছে। যাকে তত্ত্বের কাঠামোতে বাধা যায় না। এজন্য তৈরি হয়েছে ফ্রয়েডের সাথে লাকাঁর মনস্তাত্ত্বিক দর্শনের পার্থক্য। তা হলো–

> ফ্রয়েড যেখানে বলেন যে, অবচেতন ব্যক্তিগত ও তা ব্যক্তির অবদমিত প্রবৃত্তি–তা মানুষের ভেতরে থাকে, লাকাঁর মতে এই অবচেতন ভাষার দ্বারা গঠিত, মনস্তাত্ত্বিক সংকট ব্যক্তিগত নয়, তা প্রাথমিক অবস্থায় ইতিহাসিত– Events are engendered in a primary horizon.[৮]

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে অবচেতনের পাশাপাশি আরেকটি বিষয় হলো 'স্বপ্ন'। অবচেতনে যাওয়ার রাজপথ হলো স্বপ্ন। অবচেতনের কাজ প্রত্যক্ষ করার জন্য স্বপ্ন আমাদের ক্ষণিক সুযোগ দেয়। তাঁর মতে, স্বপ্ন হলো অবচেতন ইচ্ছার প্রতীকী পূরণ। অর্থাৎ বিভিন্ন বিরোধ ও বাধাকে গ্রাহ্য করে মানুষ সমাজে অবস্থান করে। সম্পূর্ণভাবে সে স্বাধীন হতে পারে না। তার চিন্তার কোনো স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ থাকে না। সে তার কামনা, বাসনা ও যৌন তাড়নাকে কঠোর সামাজিক নিয়ম-কানুনের জন্য তৃপ্ত করতে পারে না। মনের অচেতন স্তরে সেই অতৃপ্তজাত ইচ্ছাগুলো অবদমিত হয়ে স্থান করে নেয়। তার অবদমনকে কেন্দ্র করে এই অচেতন স্তরের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলো এক ধরনের বিপরীতমুখী বিরোধ ও বাধার সৃষ্টি করে। ভয়, লজ্জা ও দুঃখের মতো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টি করে। তার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলোর জন্য সে অতৃপ্ত থাকে। অবদমিত সেই অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলো অচেতন স্তর থেকে স্বপ্নের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। এই মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক শওকত আলীর নাগরিক মধ্যবিত্তনির্ভর উপন্যাসগুলোর মধ্যে উঠে এসেছে।

৪

শওকত আলী তাঁর পিতা-মাতার মতো রাজনীতি সচেতন ছিলেন। ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির জন্য কাজ করেছেন এবং তাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে এবং সৃষ্টি হয়েছে জটিল রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব। ব্যক্তি-জীবনের বেদনাবোধ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি *যাত্রা (১৯৭৬)* উপন্যাস রচনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক সত্যকে নিরাসক্তভাবে যুদ্ধোত্তর প্রজন্মের নিকট তুলে ধরেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতা থেকে প্রাণে বাঁচার জন্য এক শ্রেণির বিপন্ন মানুষের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাস রচিত হয়েছে। এখানে বাঙালির যন্ত্রণাময় পদযাত্রা ও আত্ম-আবিষ্কারের জটিল মনস্তত্ত্ব দেখানো হয়েছে। পাক সেনাদের পৈশাচিক

নির্যাতনের শিকার বাঙালির অস্তিত্ব সংকট ও সংকট উত্তরণের প্রয়াস এখানে দেখানো হয়েছে। *উত্তরের খেপ (১৯৯২)* উপন্যাসেও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের আশির দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত এর কাহিনি বিস্তৃত। এখানে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস, রক্তাক্ত পথচলা, বারবার উন্মূলিত হওয়া ইত্যাদির সমন্বয়ে জাতীয় জীবনের আত্মজিজ্ঞাসাকে তুলে ধরা হয়েছে। সবদর আলী, নিশাতবানু, মরিয়ম ও হায়দারের প্রাত্যহিক জীবন, তাদের উত্থান-পতনের কাহিনি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। তবে দেশ-বিভাগ ভারত পাকিস্তান উভয়দেশে সংখ্যালঘু হিন্দু-মুসলমানের জীবনে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে এনেছিল। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে, যুদ্ধকালীন ও পরে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সংকট তৈরি হয়েছিল। এর জন্য সমাজ জীবনে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল তা এখানে দেখানো হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, রাজনীতি, ভোট, যুদ্ধের গতিপ্রবাহ ব্যক্তির বহির্জীবনে প্রভাব ফেলেছে এবং অন্তর্জীবনে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

মধ্যবিত্তের সংকট ও সংকট উত্তরণের প্রয়াস এবং বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামের চিত্র উঠে এসেছে *অবশেষে প্রপাত (১৯৯৬)* উপন্যাসে। এর মধ্য দিয়ে লেখকের রাজনীতি সতর্ক জীবনদর্শনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে উপন্যাসটি। ষাটের দশকে সামরিক শাসকের অস্থির সময়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবর্তিত হয়েছে এখানে। যা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংকট তৈরি করেছে। ফলে মধ্যবিত্তের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে লোভ-লালসা, ভোগবাদিতা, সুখচিন্তা, আত্মোন্নতিকামিতা, পঙ্কিলতা ইত্যাদি। তারা পরাজয় ও বিনাশে হয়েছে ক্ষুব্ধ। ন্যায় ও নায্য অধিকারের প্রশ্নে হয়েছে বিদ্রোহী, করেছে আন্দোলন ও সংগ্রাম এবং গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ। আর এর সফলতার জন্য প্রধান চরিত্র আনিসকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনকে রাজনীতির সঙ্গে মেলানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য– "এ উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের নানা অন্ত-অসঙ্গতিকে লেখক রাজনীতির সাথে মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানবিক শুদ্ধতায় মীমাংসা ঘটিয়েছেন।"[৯]

দলিল (২০০০) উপন্যাসে ১৯৯০-এর গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্তের জীবনকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে উঠে এসেছে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের স্বার্থপরতা, বিত্তসর্বস্বতা ও আত্মোন্নতির পঙ্কিল অভিযাত্রা। ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের সংঘাত, সম্ভোগ ও সংগ্রামকে তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে সম্পর্কিত করে আলোকপাত করা হয়েছে। সাংবাদিক রায়হানের স্থায়ী ঠিকানার জন্য জমি কেনার দলিলের মধ্যে কাহিনি সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা '৯০-এর গণ-আন্দোলনের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। জমি কেনার মধ্য দিয়ে সংকট উত্তরণের চেষ্টায় সে ব্যর্থ হয়েছে। তার উপলব্ধি হয়েছে যে, ব্যক্তির বিনাশের উৎস সময়, সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের গতি-প্রকৃতি। তার তিন সন্তানের মধ্যেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিবাদী, সংবেদনশীল, কিছুটা খেপাটে, অধিকার সচেতন ও বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করা হয়েছে মঞ্জুকে। সে স্বপ্ন দেখে শোষণমুক্ত সমাজের এবং তা প্রতিষ্ঠায় বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এখানে প্রতিটা চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা রাজনৈতিক ঘটনাবলি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বাঙালির আত্মসমীক্ষণের পথ উন্মোচিত হয়েছে *ঘরবাড়ি (২০০১)* উপন্যাসে। এটি আশির দশকের

শেষার্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। তবে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এদেশের মধ্যবিত্তের অসহায়ত্ব, বিপন্নতা ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দেড় দশকেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। তাছাড়া স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তিরা নানাভাবে দৃঢ় অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। যাতে আফজালের মতো মুক্তিযোদ্ধারা মানসিক যন্ত্রণা, আত্মবিলাপ ও জীবনবোধের দোলাচালে ভুগেছে। যে স্বপ্ন ও মুক্তির চেতনা নিয়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছিল, তা স্বাধীনতার এক দশক পার না হতেই স্বপ্নভঙ্গের অন্তহীন যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হয়েছে। বিশেষ করে উঠতি মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা, ক্ষমতা লাভের অপচেষ্টা, রাজনীতির অপপ্রয়োগ ইত্যাদি কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন ভেঙেছে এবং দুর্বিষহ, যন্ত্রণাময় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তৈরি করেছে।

৫

শওকত আলীর উপন্যাসের একটি বড় অংশে আলোচিত হয়েছে নাগরিক মধ্যবিত্তের অসংযত ও অসংলগ্ন জীবন। বিশেষ করে *পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩), অপেক্ষা (১৯৮৫), গন্তব্যে অতঃপর (১৯৮৭), ভালোবাসা কারে কয় (১৯৮৮), যেতে চাই (১৯৮৮),* এবং *এক ডাইনীর গেন্ডুয়া খেলা (২০০১)* উপন্যাসে এ প্রসঙ্গ এসেছে। *পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩)* উপন্যাসে বৃহৎ পরিসরে নাগরিক মধ্যবিত্তের অসংযত ও অসংলগ্ন জীবনের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক, বৈবাহিক জীবনের জটিলতা, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্ববোধ, অস্তিত্বের সংগ্রাম, বিকৃত রুচি, মানুষের অর্থলোলুপতা ও বিত্তসর্বস্বতা, পুঁজিবাদী নাগরিকের মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিবাহবহির্ভূত ইন্দ্রিয়জবাসনাপূর্ণ সম্পর্ক, সুপ্ত প্রণয়াবেগের চিত্র, ব্যক্তির হাহাকার, বেদনা ও সর্বোপরি এক শ্রেণির মধ্যবিত্ত নাগরিকের পাশবিকতার নিকট পরাজিত না হওয়ার একটি অনন্য দলিল এ উপন্যাসটি। এখানে মঞ্জুর মা সালেহার মধ্যে দেখা যায় অসংযত আচরণ। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর দায়িত্ব ছিল নিজের মেয়ের প্রতিপালন করা। কিন্তু ভোগবাদী মানসিকতার দরুন সে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। দ্বিতীয় স্বামীর বাড়িতে মেয়ের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসা দেখানোর পরিবর্তে তাকে মানসিক নির্যাতন করেছে। এতে তার নির্দয় মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। মা সন্তানকে আগলে রাখে, নিরাপত্তা বিধানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। এগুলো বাঙালি সমাজের রীতিনীতি। তার বেলায় সেগুলো দেখা যায়নি। সে মঞ্জুর প্রতি তার বোনের ছেলে বেনুর অনৈতিক ও পাশবিক আচরণের প্রতিবাদও করেনি। বরং বেনুকে এমন কাজে সে উৎসাহ প্রদান করেছে। তাছাড়া স্বামীর যৌন অসমর্থতাহেতু গৃহাভ্যন্তরেই স্বামীর মামাতো ভাই আকরামের সঙ্গে সে অনৈতিক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। আর এগুলো তার অসংযত জীবনাচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। পাশবিক মানসিকতার অধিকারী আকরাম কৌশলে তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। তার পরিবাবের অর্থনৈতিক সংকটের সময় আকরামের উচিত ছিল আন্তরিকতার সাথে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। কিন্তু তা না করে সে পরিবারটিকে অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব করে দিয়েছে। অর্থ গ্রাস করাই শুধু আকরামের লক্ষ্য ছিল না। তার মধ্যে যে পাশবিকতা লুকানো ছিল, তার শিকার মঞ্জুকেও হতে হয়েছে। এখানে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্ত নাগরিকের অসংযত জীবনকে উন্মোচন করা। ব্যবসায়িক স্বার্থের আরও একটি কদাকার রূপ দেখা যায় তেল কোম্পানির চাকুরে কাসেমের মধ্যে। তার অসংযত ও অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষার নিকট মঞ্জু

পরাজিত হতে বাধ্য হয়েছে। মঞ্জুর খালাতো ভাই বেনুর আচরণে ভোগবাদী বিকৃত রুচির পরিচয় মিলেছে। এদের সবার সংযমহীন মানসিকতার নিকট পরাজিত ও যৌন বিকারের শিকার হয়েছে মঞ্জু। তার আত্মকথায় উঠে এসেছে নিজের স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্ত –

> আমার বাঁচবার কত সাধ ছিলো। এই সাধটাকে কত কষ্টে, কত যত্নে, কত গোপনে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলাম। কত কান্না, কত অপমান, কত স্নিগ্ধ সুখের স্মৃতি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। সেই সাধটা আমার মরে গেল।[১০]

এখানে নাগরিক মধ্যবিত্তের অসংযত জীবনাচরণের নিকট বলি দিতে হয়েছে মঞ্জুর শুভ্র, সুন্দর ও সুস্থ জীবন বাসনাকে। তাছাড়া এ উপন্যাসে মঞ্জুর বান্ধবী রঞ্জু, নাসিমা, সমবয়সী তাজিনা, মীনা, জোহরা, হাস্না, শেলী ও জাহানারা প্রমুখের মধ্যে তারুণ্যাশ্রয়ী ভোগবাদী মানসিতকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। যেখানে তারা নিজেদের দৈহিক সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে ছেলেদেরকে আকৃষ্ট করেছে এবং ভোগবাদী মানসিকতায় জীবন অতিবাহিত করেছে। ফলে ভবিষ্যতে তাদের কাউকে কাউকে এর পরিণামস্বরূপ ঠকতে হয়েছে ও ভয়াবহ দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হয়েছে। আবার কেউ কেউ জীবনের কুল কিনারা খুঁজে না পেয়ে ভোগবাদী জীবনকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। যা মধ্যবিত্ত নাগরিকের অসংযত জীবনাচরণেরই প্রতিচ্ছবি।

"শওকত আলী তাঁর উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তর এক যুগের সময়স্বভাবকে অন্তরঙ্গ অবলোকনের উপকরণে পরিণত করেছেন। উত্তরসম্ভাবনাহীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের তারুণ্যের সংকট, আত্মসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণের নির্মোহ বিন্যাস শওকত আলীর জীবননির্বাচনের অনন্যতাকেই প্রমাণ করে।"[১১] যে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে *অপেক্ষা (১৯৮৫)* উপন্যাসে। আলী আকবরের জীবনের ইতিকথার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত নাগরিকের স্বার্থান্বেষী মনোভাব ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। এখানে ১৯৮১ সালের সমকালীন বাস্তব ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। নবগঠিত রাষ্ট্রে ১৯৮১ সালের নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বার্থান্বেষী মনোভাব তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সমকালীন রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু নাগরিক মধ্যবিত্তের মানস রূপায়ণের জন্য তিনি এ প্রসঙ্গ এনেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করা আলী আকবরের ব্যক্তিগত জীবনের নানা ইতিবৃত্ত মুখ্য হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসে। তার মধ্যে দুর্বলতা, অলসতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বাবা-মা ও পরিবারের সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এটা তার মনে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। শিক্ষিত সন্তান হিসেবে তার মধ্যে দায়িত্ববোধ, প্রতিবাদী স্বভাব ও প্রতিশোধপ্রবণ মাসসিকতার অভাব লক্ষণীয়। নিষ্ক্রিয়তা তাকে দুর্বল মধ্যবিত্তের সীমানায় ফেলেছে। অন্যদিকে উপন্যাসে কামালের মধ্যে স্বার্থান্বেষী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। 'পদক্ষেপ' নামক রাজনৈতিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ধূর্ততার পরিকল্পনা সে অতিদর্পে বাস্তবায়ন করেছে। আলী আকবর কামালের আত্মীয় হলেও চাকরি দেয়ার বেলায় কামাল তার প্রতি স্বার্থান্বেষী মনোভাব দেখিয়েছে। তাছাড়া সে আলী আকবরের ছোটো মামার কাছ থেকে দিনাজপুরের বাড়িটাও দলিল করে নিয়েছে। এখানেই তার ধূর্ততানির্ভর লোলুপতা শেষ হয়ে যায়নি। আলী আকবর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। তার এই মুক্তিযোদ্ধার সনদ ব্যবহার করে সে 'পদক্ষেপ' পত্রিকা চালু করেছে। আর এই পত্রিকায় সে আলী আকবরকেই চাকরি দেয়নি। তার

ধূর্ততানির্ভর উক্তিতে স্বার্থান্বেষী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে– "একখানা দলিল অবশ্যি আমার কাছে আছে, কিন্তু ও দলিল যদি না থাকত তাহলে কি বাড়িটা রাখা যেত।"[১২] অন্যদিকে, আলী আকবরের মেসের সদস্য মহীউদ্দিনের মধ্যেও অসংযত আচরণ পরিলক্ষিত হয়েছে। বন্ধুর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনেও তাকে তৎপর হতে দেখা যায়। এতে তার অকৃতজ্ঞ, অসংযত ও রুচিহীন লোলুপতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। উচ্চশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মনোয়ারের মধ্যেও এমন আচরণের আভাস মিলেছে। সে বিয়েকে পুঁজি করে নিজের গরিব মামাতো বোনের সর্বনাশ ও সম্ভ্রমহানি করেছে। আর এটাকে সে বন্ধুদের কাছে প্রচার করে বেড়ানোকে কৃতিত্বের পরিচয় মনে করেছে। আলী আকবর, মহীউদ্দিন ও মনোয়ারের মধ্য দিয়ে সমকালীন বাস্তবতার প্রতিফলন দেখানো হয়েছে।

গন্তব্যে অতঃপর (১৯৮৭) উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র আলী আকবরের মনোবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। তার মনোবিকলনের জন্য পারিবারিক কঠোর অনুশাসন, বাবার দাপুটে স্বভাব ও স্নেহহীন মানসিকতা দায়ী। তাছাড়া মা-বাবার দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা, বাবার পরকীয়া প্রেম, শিক্ষাজীবনে পরিবার কর্তৃক দায়িত্বহীনতা, নিজের ইচ্ছার প্রতি বাবার চাপানো সিদ্ধান্ত, নাগরিক জীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধ, একাধিক নারীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক ইত্যাদিও কম দায়ী নয়। বাল্যকাল হতে শিশুদের পরিবার থেকে প্রয়োজনীয় সামাজিক অধিকার পাওয়া আবশ্যক। যাতে তার মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়। কিন্তু এর অনুপস্থিতি তার বেলায় লক্ষণীয়। এজন্য বাল্যকাল থেকে তার মধ্যে ভিন্ন স্বভাব ও নেতিবাচকতা লক্ষ করা যায়। তাই বাবার অসুস্থতার সংবাদ শোনার পরও তার মধ্যে বিশেষ কোনো অনুভূতি সৃষ্টি হয়নি। বরং অসুস্থ বাবাকে গ্রামে দেখতে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার মধ্যে অনীহা দেখা যায়। বাল্যকাল থেকে সে বাবার নিকট কোনো স্নেহ-ভালোবাসা পায়নি। যার প্রভাবে তার মধ্যে অবচেতনভাবে বিকৃত মানসিকতার জন্ম হয়েছে এবং তাকে হৃদয়হীন স্বভাবে পরিণত করেছে। যার বহিঃপ্রকাশ বাবর আলী চৌধুরীর অসুস্থতার সময় তার মনোভাব ও কর্মকাণ্ডে ফুটে উঠেছে। মানবিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তার অসুস্থ বাবাকে সেবা করে নীহার। তার বাবার গৃহাভ্যন্তরেই সেবারত নীহার সঙ্গে জোরপূর্বক দেহমিলনও তার চিত্তে কোনো ধরনের আলোড়ন বা পাপবোধের সৃষ্টি করেনি। বাবার অসুস্থতা বাঙালি সমাজে ছেলের জন্য দুঃখ ও যন্ত্রণার কারণ হয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও পরিবার কর্তৃক সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষিত আলী আকবরের বেলায় তা অনুপস্থিত। এমনকি বাসের মধ্যে স্বল্প পরিচয়ে নীহারকে জড়িয়ে ধরা, একাধিক নারীর সঙ্গে অবৈধ মেলামেশা ইত্যাদিকে সে স্বাভাবিক মনে করেছে। শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে, সুন্দর ও সুস্থ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করে মানবিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে, হৃদয়কে সহানুভূতিশীল করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ঢাকার নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত সাংবাদিক আলী আকবরের মধ্যে তা অনুপস্থিত। তারই অসংযত আচরণে নীহার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নীহারের উক্তিতে তা স্পষ্ট–

> কাপড়-চোপড় ঠিক নেই– পেছনে একটা সদ্যমৃত মানুষের লাশ–আর সে ডেকে ডেকে সবাইকে বলছে, আমি দায়ী, শুধু আমি দায়ী। আলী আকবরকে সামনে রেখে বলেছে তুমি কী, ঠিক করে বলো, তুমি মানুষ না শয়তান, বলো, তুমি কে? ।[১৩]

এখানে নীহারের উক্তিতে আলী আকবরের অসংযত, রুচিহীন ও বিকৃত স্বভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে। নাগরিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিক্ষিত ও চাকরীজীবী হওয়ার পরও তার অসংযত জীবনযাপনের পেছনে রয়েছে সমকালীন সমাজসৃষ্ট জটিলতা ও সংকট।

আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্তের অসংযত জীবনের পরিচয় রয়েছে *যেতে চাই (১৯৮৮)* উপন্যাসে। আশৈশব নাগরিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা নিশাতের সংযমহীন জীবনাচরণ একদিকে যেমন দাম্পত্য সম্পর্ককে জটিল করেছে, অন্যদিকে কোমলমতি সন্তানের উপরেও এর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তার বিবাহপূর্ব একাধিক প্রেম, বৈবাহিক জীবনে পরকীয়া প্রেম, স্বামীর প্রতি অনাসক্ত ও নিরাসক্ত মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এগুলো তার সুস্থ ও সুন্দর জীবনের পরিবর্তে নরকসম করে তুলেছে বৈবাহিক জীবনকে। শুধু নিশাতের এমন জীবনাচরণ প্রকাশিত হয়নি। স্বামী জাফরের মধ্যেও এমন মনোভাব রয়েছে। জাফর গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে উঠেছে। সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। তবে নাগরিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতাবোধ, স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দুর্বল প্রচেষ্টা, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধহীন পিতার ভূমিকা ও ক্ষমাশীলতার অভাব ইত্যাদি তাকে একাকিত্ব, বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন করে তুলেছে। এতে তার পরিবার ও দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় জাফরের মনোলোক বিশ্লেষণে লেখকের অভিমত–

> হাসপাতালে নেই, ক্লিনিকে নেই, সংসারে নেই, সন্তানের কাছে নেই, স্ত্রীর কাছে নেই, তাহলে সে কোথায়? প্রকাণ্ড একটা নিঃসঙ্গতা বুকের ওপরে ভার হয়ে চেপে থাকে।[১৪]

ঔপন্যাসিক সচেতনচিত্তে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের অসংযত আচরণের পতনকে দেখিয়েছেন। শওকত আলী সমাজের অকাট্য সত্যকে অস্বীকার করেননি। তাই সমকালীন সমাজের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও নেতিবাচক প্রভাবকে পাঠকের সম্মুখে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

ভালোবাসা কারে কয় (১৯৮৮) উপন্যাসেও কিছু কিছু চরিত্রের মধ্যে এমন চারিত্রিক সংযমহীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। লীলার স্বামী সমির উদ্দিনের কামসর্বস্ব উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন লীলাকে দাম্পত্য সুখ দেয়নি। বরং তার স্বাভাবিক জীবনে বাধা প্রদান করেছে। সে হয়েছে পরপুরুষগামী। সমির উদ্দিনের মধ্যে রয়েছে চারিত্রিক হৃদ্যতাহীনতা, আবেগহীনতা, কামসর্বস্বতা ও ভোগবাদী মনোভাব। আর স্বামীর এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে লীলার মনোলোকে অশান্তি ঘন মেঘের মতো ছেয়ে আছে। অন্যদিকে নাগরিক পরিবেশের কদর্য স্বভাবের চিত্রও ফুটে উঠেছে তার স্বামীর ব্যবসায়িক সহযোগী হামিদের মধ্যে। হামিদের পাশবিক কামনার জালে শিকার হতে বাধ্য হয়েছে লীলা। একদিকে সমীরের নিস্পৃহ মনোভাব, লীলার প্রতিরোধহীন মানসিকতা ও তৃপ্তিহীন দাম্পত্য সম্পর্ক ইত্যাদি লীলাকে হামিদের নিকট নিজেকে সঁপে দিতে বাধ্য করেছে। কিন্তু তার শরীরটার জন্যই এভাবে বিভিন্ন পুরুষের সংযমহীন আচরণ ও কামনার শিকার হতে হয়েছে। এ থেকে লীলার উপলব্ধি হয়েছে– "শরীর নামক একটা জিনিস আছে, যার ক্ষমতা অসাধারণ। মানুষের অনেক কিছুই যা বদলে দিতে পারে।"[১৫] সমির উদ্দিন স্ত্রীর প্রতি শুধু কামসর্বস্ব মনোভাবই দেখিয়েছে। স্বামী হিসেবে কোনো আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ দেখায়নি। অন্যদিকে হামিদ অনৈতিকভাবে জোরপূর্বক সংযমহীন আচরণ দেখিয়েছে। তৎকালীন চলমান

নাগরিক মধ্যবিত্তের যে উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত জীবন লেখকের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছিল, তারই চিত্র এ উপন্যাসে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এক ডাইনীর গেন্ডুয়া খেলা (২০০১) উপন্যাসটি পারিবারিক ধাঁচের হলেও লেখক এখানে একটি হৃদয়বিদারক সত্য তথ্যকে অঙ্কন করতে চেয়েছেন। মা সন্তানের কাছে আরাধ্য ও সবচেয়ে আপনজন। এমনকি মায়ের চিন্তা-চেতনার বৃহৎ অংশ জুড়ে থাকে সন্তানের মঙ্গল কামনা। কিন্তু সৎ মা বা বিমাতা কতটা অকল্যাণ কামনা করে তার একটি বাস্তব চিত্র এ উপন্যাসে রয়েছে। সন্তানের প্রতি বিমাতার অমানবিক আচরণের রসদ হয়তো লেখক নিজের ব্যক্তিজীবন থেকে সংগ্রহ করেছেন। গবেষক শাফিক আফতাবের মতে– শওকত আলীর মা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তাঁর বাবা ডা. খোরশেদ আলী স্থানীয় লোকের কুপরামর্শে নতুন বউ ঘরে নিয়ে এলে সংসারে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। এখানে তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো বিমাতার নেতিবাচক স্বভাব উন্মোচন করেছেন। পোস্টাল ইন্সপেক্টর মাহফুজ হোসেন প্রথম স্ত্রী রোমেনা বেগম মারা যাওয়ার পরে দ্বিতীয় স্ত্রী আকলিমা বেগমকে ঘরে নিয়ে আসে। তাকে নিয়ে আসার পরেই শুরু হয় পারিবারিক নানা জটিলতা। বিমাতার অত্যাচারমূলক মানসিকতা প্রবল হয়ে ওঠে। সে ছেলে মাসুম (১৭/১৮), মেয়ে বুলবুল (১৪/১৫) এবং ছোট ছেলে মাসুদকে (১১/১২) পথের কাঁটা ও শত্রু ভাবে। তবে এক্ষেত্রে শুধু আকলিমা বেগমের বিমাতাসুলভ খলচরিত্র দায়ী নয়। তাদের বাবা মাহফুজ হোসেনও দায়ী। উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ছেলেমেয়েদের প্রতি দেখাশুনার প্রচেষ্টা অপেক্ষা মাহফুজ হোসেন শারীরিক ইন্দ্রিয়জ চাহিদা পূরণের জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। মাহফুজ হোসেনের স্ত্রীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত যৌনাসক্তি, সন্তানের প্রতি দায়িত্বহীনতা ও শাসনের নামে অন্যায় শোষণ তাদের ব্যথিত করেছে। তারা বাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। মাসুম বাবার অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করেছে। সৎ মা আকলিমা বেগম নেতিবাচক আচরণ করেছে। আকলিমা বেগম নিজের ভাই মন্টুকে মেয়ে বুলবুলের সম্মান ও সম্ভ্রমহানির মতো কুৎসিত মনোভাব দেখিয়েছে। যা মধ্যবিত্তের সংযমহীন আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। বুলবুলের সম্ভ্রমহানির ব্যাপারে মাহফুজ হোসেন অবগত হওয়ার পরও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তার চরিত্রের দুর্বলতা এটাই প্রমাণ করেছে যে, সেও স্ত্রীর সাথে এক হয়ে নিজের সন্তানদের সাথে গেন্ডুয়া খেলায় শামিল হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মাহফুজ হোসেন তা পারেনি। তাই অতিবাস্তবে নিজের দোষকে ও পারঙ্গমহীনতাকে স্বীকার করেছে এভাবে– "ওহ হো, রোমেনা কেন তুমি চলে গেলেম তাকে তুমি বেঁচে থাকলে আমি কি দ্বিতীয়বার বিয়ে করি? হায়রে এমন কপাল আমার?"[১৬] আকলিমা বেগমের নতুন মা হবার বাসনা ও অক্ষমতাজনিত ব্যর্থতাবোধ তাকে আরো হিংস্র ও রাক্ষসী স্বভাবের করে তুলেছে। এজন্য তার ভাই মন্টুকে বাধ্য করেছে বুলবুলের সম্ভ্রমহানি ঘটতে। নিজের মেয়ের সম্ভ্রমহানির ব্যাপারটি মাহফুজ হোসেনের কাছে গৌণ মনে হয়েছে। তাছাড়া স্ত্রীর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ছেলে মাসুমকে ত্যাজ্য করতেও উদ্যত হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে নাগরিক মধ্যবিত্তের এক শ্রেণির যৌনান্ধ নেতিবাচকতার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। যেখানে নিজের জৈবিক চাহিদাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। সমাজের অন্য সব দায়িত্ব-কর্তব্যকে তুচ্ছ ও হেয় মনে হয়েছে। মাসুমের যুক্তিবাদী প্রতিবাদে ব্যর্থতাবোধের শিকার স্বামী-স্ত্রীর স্বভাব উন্মোচিত হয়েছে। লেখকের ভাষ্যে-

> ওদিকে তখন দরজা বন্ধ ঘরে মাহফুজ হোসেন তখনো এলোচুলে উলঙ্গ ডাইনীকে দেখে, কখনো দেখে রাক্ষুসিকে কখনো আবার পেত্নীকে। তারা গেন্ডুয়া খেলতে চায়, কিন্তু নরমুণ্ড কোথাও খোঁজে পায় না–আর তাই হায় হায় করতে থাকে।[১৭]

এখানে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনে বিমাতার নেতিবাচকতার রূপ কতটা অসংযত তার নিদর্শন ফুটে উঠেছে। তবে ফয়সালের মায়ের মধ্য দিয়ে এর বিপরীত অবস্থা দেখানো হয়েছে। ফয়সালের মাও সৎ মা, কিন্তু ইতিবাচক স্বভাবের। যার চিন্তা সন্তানের সর্বাত্মক মঙ্গল কামনা করা। ঔপন্যাসিক অতি সুকৌশলে এই বিপরীতধর্মী চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে মধ্যবিত্তের সংযমহীন জীবনাচরণের স্বরূপ দেখিয়েছেন।

মধ্যবিত্ত নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা কখনো কখনো অন্যের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। *শেষ বিকেলের রোদ (২০০১)* উপন্যাসে উঠে এসেছে সেই প্রসঙ্গ। উপন্যাসটির অন্তর্বয়নে প্রৌঢ় প্রেমের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। তবে ঔপন্যাসিক সতর্কভাবে এই উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্তের খেয়াল-খুশিনির্ভর ব্যক্তিজীবনের প্রভাব দেখিয়েছেন। যা অন্যের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। শামীমের মধ্যে রয়েছে আবেগহীন মানসিকতা। মীজু তাকে সত্যিকার ভালোবাসে। কিন্তু শামীমের মধ্যে মিজুর প্রতি ভালোবাসার কোনো আকর্ষণ লক্ষ করা যায়নি। সে অসংযত জীবনযাপন করেছে। ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সে মেয়েদের দেখেছে। আনন্দের পাত্র হিসেবে তাদের বিবেচনা করেছে। মীজুর সাথে শামীমের আলাপচারিতায় সেই মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে– "তোমার সঙ্গে আমার ভালোবাসা হয় নি। আই জাস্ট প্লেইড এ গেম– আমি যে শুধু ভালোবাসি না, তা নয় তোমাকে আমি রীতি মতো এভয়েড করি, তুমি এমনই বোকা যে সেটা বুঝতে পার না।"[১৮] শামীম ধূর্ততার সঙ্গে সামিনাকেও ভালোবেসেছে এবং তার সাথেও প্রতারণা করেছে। অবশেষে বিদেশে ব্যারিস্টারি পড়তে চলে যায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিকের অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিচয় হয়তো ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি। সমকালীন কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতিবাচক দিক উন্মোচনই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। নারীদের সংগ্রাম, সাধনা ও যাপিত জীবনের দিকটিও শওকত আলীর উপন্যাসে অনুপস্থিত নয়। নারী স্বাধীনতার জয়গান, জাগরণ তথা নারীচেতনাও তাঁর উপন্যাসে বিশেষ স্থান পেয়েছে। *তনয়ার স্বীকারোক্তি (২০০১)* উপন্যাসটি নারী চেতনানির্ভর। তবে এখানে মধ্যবিত্তের বিকৃত আচরণও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করা বশিরুল্লাহর মধ্যে প্রতারণার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদেশে স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার সীমাকে প্রতারণা করে বিয়ে করা এক ধরনের অসততাপূর্ণ অসংযত জীবনাচরণেরই পরিচায়ক। লেখক মধ্যবিত্তের অন্তরালবর্তী নানা অস্বাভাবিক জীবনাচরণকে এভাবে পাঠকের সম্মুখে উন্মোচন করেছেন।

৬

শওকত আলী তাঁর নাগরিক উপন্যাসে মধ্যবিত্তের স্বরূপ ও মনস্তত্ত্ব নির্ণয়ে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাজনিত অসংগতি ও পারিবারিক সংকটকে এড়িয়ে যাননি। তাঁর *যেতে চাই (১৯৮৮)* উপন্যাসে নিশাতের মধ্যে উচ্চাশা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এতে তার পারিবারিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। সচিব নেহাল উদ্দিনের মেয়ে হওয়ার সুবাদে কিভাবে এক স্তর

থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হতে হয়, সে কৌশল তার অজানা নয়। কূটবুদ্ধি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে সে নিজে চাকরি পেয়েছে। স্বামী জাফরের চাকরিতে বদলির জন্য নৈতিকতাবহির্ভূত কাজ করতেও সে পিছপা হয়নি। এজন্য তার মধ্যে কোনো সংকোচ এবং গ্লানিবোধও দেখা যায়নি। আমেরিকা যাওয়ার স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য মুশফিকের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া ও আত্মসম্মান হারানো তার কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার মনে হয়েছে। এমনকি এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য নিজের সম্ভ্রম বিসর্জন দিতেও সে সদা প্রস্তুত। এ উদ্দেশ্যকে সফলতায় রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু সে করেছে। নিশাতের কথায় এই যুক্তি লক্ষিত হয়েছে–

> যদি কোনো পুরুষ মানুষ নিজের কেরিয়ারের উন্নতির জন্য তদ্বির করে, সেটা কারো চোখে পড়ে না, কিন্তু যেহেতু আমি একজন মহিলা, তদ্বির করতে গেলাম, অমনি সেটা দোষের হয়ে গেল। বলুন, অন্যায়টা কী করেছি আমি?[১৯]

উঠতি মধ্যবিত্তের বিলাসী ও ভোগবাদী জীবন সব সময় ঐ পরিবেশের সবাইকে ইতিবাচক ফল দেয় না। নাগরিক পরিবেশের উচ্ছৃঙ্খল ভোগবাদী জীবন কারো কারো নিকট হয়তো উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করাকে বোঝায়। কিন্তু কিছু মানুষ সেই বিলাসী জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়। একদিকে উঠতি মধ্যবিত্তের নাগরিক পরিবেশে আভিজাত্য প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দেখা যায়। অন্যদিকে সেই বিলাসী জীবন থেকে মুক্তির জন্য প্রয়াসের দ্বন্দ্ব দৃশ্যমান হয়েছে *বাসর ও মধুচন্দ্রিমা (১৯৯০)* উপন্যাসে। ব্রিগেডিয়ার আফজালুদ্দৌলা মধ্যবিত্ত নাগরিক আভিজাত্যের প্রতিভূ। তাঁর ক্যাডেট কলেজ-পড়ুয়া শিক্ষিত ছেলে আফসানের বিয়ে, বাসর, বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান ও হানিমুনে যাওয়ার প্রস্তুতি ইত্যাদি ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। তবে এর মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত নাগরিকের বিলাসী জীবনের চিত্র বিম্বিত হয়েছে। যার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে নব্যবিবাহিত নিমা ও আফসান। নব্য বিত্তশালীতে পরিণত মধ্যবিত্তের ভোগ বিলাসিতাপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল নাগরিক জীবনের রূপ মনোলোকে কি পরিণতি নিয়ে আসে তার চিত্রও উপন্যাসে রয়েছে। আনিস-মীনা দম্পতির প্রথম পক্ষের মেয়ের সাথে আফসানের বিয়ের পরে বাসর রাত থেকে পরবর্তী সব কাজ খুবই নিয়মমাফিক ছিল। সেখানে নিমা ও আফসানের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা ইচ্ছার কোনো মর্যাদা ছিল না। ঔপন্যাসিক কেন্দ্রে থাকা মানুষের নাগরিক ভোগবাদী জীবনের শুধু উন্মেষ ঘটাননি; তিনি নিমা ও আফসানের নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিক সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ভোগবাদী জীবনকে প্রত্যাঘাতও করেছেন। নাগরিক পরিবেশে আভিজাত্যের মধ্যে বেড়ে উঠলে এবং যান্ত্রিক পরিবেশে অভ্যস্ত হলেই মনের সকল চাহিদা পূরণ হয় না। মনের অপ্রাপ্তিবোধ ও যন্ত্রণা মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে ওঠে। আর এজন্য মানুষ বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। পরিবার নিমা ও আফসানকে হানিমুনের জন্য কক্সবাজারে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গাড়ি থেকে নেমে যায় গ্রামের পথে। চলে যায় প্রান্তিক জনের সারিতে। গ্রামীণ পরিবেশ, সহজ-সরল-সাধারণ জীবন ও মুক্ত পরিবেশ মানুষের মনে প্রশান্তি এনে দেয়। কিন্তু শহরের আভিজাত্যনির্ভর নাগরিক পরিবেশ অতটা দিতে পারে না। নিমা-আফসানকে প্রান্তিক জনের সারিতে পাঠানোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মনের প্রশান্তি ও মুক্ত জীবনের সন্ধান। আর এর মধ্য দিয়ে যান্ত্রিকতানির্ভর কৃত্রিম নাগরিক পরিবেশের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতি নীরব পরোক্ষ প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। বিবাহ-পরবর্তী যাবতীয় কাজে আফসান ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু নিয়মমাফিক

নাগরিক পরিবেশে তার অসহ্য ক্লান্তিবোধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোনো বিদ্রোহ সঞ্চার করে না। এতে সৃষ্টি হয়েছে আফসানের পারিবারিক সংকট। তাই অবচেতন মনে আফসান ভেবেছে–

> তোমার কাজ এখানে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে থাকা। তোমার বাবা, তোমার শ্বশুর, তোমার আত্মীয়-স্বজন তোমাকে ব্যবহার করছে। আর তুমিও দাঁত কেলিয়ে নিজেকে ব্যবহার করতে দিচ্ছ।[২০]

আফসানের মনোলোকে নাগরিক মধ্যবিত্তের ভোগ বিলাসিতাপূর্ণ জীবনাচরণের প্রতি প্রতিবাদমূলক আত্মসমালোচনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক শহরের নাগরিক পরিবেশের বিরোধী নয়। তবে তিনি চান মনের প্রশান্তি। তাই যান্ত্রিক ও কৃত্রিম নাগরিকতা থেকে তাদের হাজির করেছেন গ্রামের মুক্ত পরিবেশে প্রান্তজনের সারিতে। যেখানে আভিজাত্যনির্ভর জীবন পাওয়া যাবে না। কিন্তু মুক্ত মনের প্রফুল্লতা পাওয়া যাবে।

নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে উচ্চমধ্যবিত্তে পরিণত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষানির্ভর উপন্যাস *জননী* ও *জাতিকা* (২০০১)। এ উপন্যাসে মা ও মেয়ের দুটি আখ্যানে একদিকে নারীর স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। অন্যদিকে নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে উচ্চমধ্যবিত্তে পরিণত হওয়ার ইতিবৃত্ত দেখানো হয়েছে। গ্রামীণ পরিবেশে আবিদা বেড়ে ওঠে। পড়াশুনা করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার বিয়ে। কবির হোসেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। সংসারের শত ব্যস্ততার মাঝেও শিক্ষার প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ ছিল। নিজের প্রচেষ্টায় সে বি.এ পাশ করেছে। অবশ্য স্বামীর ভাগ্নে সচিব জাফরের আগমনে আবিদার দেহ ও মনে পরিবর্তন সূচিত হয়। তার মধ্যেই নিহিত ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এটাকে চরিতার্থ করার নিমিত্তে সে জাফরের সাথে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। জাফরকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে। তবে জাফরের সংসারে আসার পরও সমাজের উঁচু শ্রেণির সঙ্গে তার গভীর সখ্য লক্ষণীয়। স্বামীর সূত্রে পরিচিত মন্ত্রী, এম.পি, ডি.সি, এস.পি প্রমুখদের সাথে সে স্বার্থনির্ভর অবাধ মেলামেশা করেছে। কারণ, তার ভেতরে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। দেহের সম্ভ্রম রক্ষার চেয়ে অর্থের প্রতি তার লোভ ছিল বেশি। আর এটাকে সে সমাজের উঁচু আসনে ওঠার সিঁড়িই ভেবেছে। লেখকের বর্ণনায় আবিদার উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে এভাবে–

> যে জগতে তুমি থাকতে চাও, যে জীবন তুমি যাপন করতে চাও, তার কিছু দাবি থাকে। সে দাবি না মেটালে চলে না। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কিংবা দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। মোটের উপর সে শেষ পর্যন্ত হারে নি। প্রতিযোগিতার সিঁড়িগুলো ঠিক মতোই ভেঙ্গে ভেঙ্গে উপরে উঠে এসেছে।[২১]

সে সমাজের উচ্চাসনে পৌঁছানোর জন্য নিজের শরীর ও কৌশলকে ব্যবহার করেছে। সমকালীন আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী নারী হিসেবে তাকে এমনভাবে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনোভাব আরো বেশি প্রকাশিত হয়েছে মেয়ে রীনাকে কেন্দ্র করে। রীনার প্রেমের বিষয় আবিদার দৃষ্টিগোচর হলে সে এর ঘোর বিরোধিতা করেছে। তখন তাকে আগের নিম্নমধ্যবিত্ত অবস্থানকে ভুলে যেতে দেখা যায়। "দেখ রীনা, বিয়ের ব্যাপারটা হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়, বিয়েটা তোমার হলেও তার সঙ্গে এ সংসারের মান সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে, আমাদের একটা সোসাইটির মধ্যে বাস করতে হয়, ঐ রকম বিয়ে আমরা হতে দেব না।"[২২] এখানে মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী, স্বার্থপর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষানির্ভর মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

নাগরিক মধ্যবিত্তের বিবাহবহির্ভূত প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের মনস্তাত্ত্বিক সংকট উঠে এসেছে *পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩)* উপন্যাসে। বিবাহবহির্ভূত প্রেম দাম্পত্য সংকটকে প্রকট করে তোলে। চৌধুরী সাহেব ও তার স্ত্রী সালেহা বেগমের মধ্যে দাম্পত্য সংকট দেখা যায়। সালেহা বেগমের সংযমহীন বাসনা ও পরকীয়া সম্পর্কের কারণে এ সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তার এমন ব্যভিচারের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে আনিস, রাহুল, ফরিদা ও মঞ্জুর মধ্যে। তার ব্যাভিচার চৌধুরী সাহেবের নিকট জানাজানি হলে সে সংসারের প্রতি উদাসীন থাকে। স্ত্রীর ব্যভিচারমূলক কর্মকাণ্ড ও সংসার বিচ্ছিন্নতায় সে মনোলোকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এক সময় মারা যায়। ঔপন্যাসিক অতি সচেতনভাবে দাম্পত্য সম্পর্কের নেতিবাচক পরিণতিকে উন্মোচন করেছেন এ উপন্যাসে। সমকালীন সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কের বাস্তবতাকে উপস্থাপন করার জন্য প্রথম উপন্যাসেই দাম্পত্য সম্পর্কের নেতিবাচক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাগরিক মধ্যবিত্তের মধ্যে রয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা। *যেতে চাই (১৯৮৮)* উপন্যাসেও দাম্পত্য সম্পর্কের সেই জটিলতা এসেছে নিশাত ও মেধাবী ডাক্তার জাফরের মধ্যে। ঔপন্যাসিক দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা উন্মোচনে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করেননি। পরিবেশ, স্বভাব, জীবনাচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক হতে তাদের মধ্যে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। দুই জন দুই মেরুর বাসিন্দা। নিশাত শহরের নাগরিক মধ্যবিত্ত পরিবেশে বেড়ে উঠেছে। সে আধুনিক চিন্তানির্ভর কিন্তু জাফর গেঁয়ো স্বভাবের। তবে তাদের আকাশ-পাতাল এ পার্থক্যের জন্য দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। লেখকের কথায় তা স্পষ্ট হয়েছে– "গেঁয়ো টাইপের মানুষ, শহরের উঁচু সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ কম, তাছাড়া এমনিতেই অমিশুক স্বভাব– তার চোখে নিশাতের চলাফেরা ভালো লাগবার কথা নয়।"[২৩] বিপরীতধর্মী এ স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের মধ্যে দাম্পত্য জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই কথায় জাফরের শ্রেণি অবস্থান ও স্বভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে। যা নিশাতের মতো শহুরে পরিবেশে বেড়ে ওঠা মেয়ের পক্ষে খাপ খাওয়ানো ও সংসারকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। নিশাতের বিবাহপূর্ব প্রেম, বিবাহ পরবর্তী অবাধ চলাচল ও অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশাকে জাফর স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। আবার দুর্বল মনোবলের জন্য স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে সে। নীরবে সহ্য করেছে, মেনে নিয়েছে স্ত্রীর এমন অবাধ আচরণ যা তাকে আরো বেশি একা, বিচ্ছিন্নতাবোধসম্পন্ন ও উদাসীন করে তুলেছে। মুন্নী ও মিঠুর পড়ালেখার প্রতি নিশাতের দায়িত্বহীনতা দাম্পত্য সম্পর্কের দূরত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে স্ত্রীর পরকীয়া প্রেম তার মনোলোকে আঘাত করেছে। তার মনোযন্ত্রণা আরো দ্বিগুণ হয়েছে মুন্নীর আত্মহননের পরে। অন্যদিকে নিশাত নিজের ভুল বুঝে স্বামীর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে। কিন্তু স্বামীর ক্ষমাহীনতা ও নিস্পৃহতা তাকে জেদি করে তুলেছে। সুন্দর ও ঘনিষ্ঠ দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য প্রয়োজন উভয়ের ত্যাগ, ক্ষমা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। যা তাদের উভয়ের মধ্যে অনুপস্থিত। তবে এ সম্পর্ককে পুনরায় নতুন ও বাস্তব রূপ দিতে নিশাতের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। নিজেদের মধ্য দূরত্ব কমানোর জন্য ও সংসারকে টিকিয়ে রাখতে প্রতি মাসে সে একবার সিলেটে গিয়েছে স্বামীর কাছে। সে স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেছে– "বলত আমি কি এতদূর পর্যন্ত আসি শুধু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য? কোনো মেয়ে আসে এভাবে? আমার দোষ থাকলে বলো,

আমি সংশোধন করি।"[২৪] কিন্তু জাফরের নির্বিকার মনোভাব নিশাতের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী নিশাত স্বামী, সংসার ও মিঠুকে ছেড়ে আমেরিকা পাড়ি জমিয়েছে। বিশ শতকের আশির দশকে আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের এমন বাস্তবতা এ শ্রেণির বিনষ্টিরই ইঙ্গিতবহ।

ভালোবাসা কারে কয় (১৯৮৮) উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল মনস্তত্ত্বকে ভিন্নভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শৈশব থেকে লীলা নানা প্রতিকূল স্তর পেরিয়েছে। সমির উদ্দিন লীলার বাবার বয়সী, বাবার এক সময়কার সহকর্মী ও পরবর্তীকালে ব্যবসায়ী। তার সাথে ষোড়শী লীলার বিয়ে হয়েছে। বাসর রাতেই স্বামী সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা তার হৃদয়ে গেঁথে যায়। স্বামীকে শুধু ভোগবাদী ও কামসর্বস্ব বলে মনে হয়। যা তাদের দাম্পত্য সর্ম্পকের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করে। ফলে হামিদের সঙ্গে তার অনৈতিক ও অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সমির উদ্দিন জানতে পারলে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক আরো জটিল হয়ে ওঠে। কিন্তু সমির উদ্দিন দায়িত্বহীন ও স্থূল রুচিসম্পন্ন। সে স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনো চেষ্টা করেনি। নারীর সবচেয়ে নির্ভরতার, স্বস্তির, প্রশান্তির ও আশ্রয়ের জায়গা হলো স্বামী। স্বামীর নিকট হতে নারীর হৃদ্যতাপূর্ণ ও আবেগসর্বস্ব ভালোবাসা পাওয়া প্রতিটি নারীর অধিকার। লীলার মধ্যে সেই প্রাপ্তিবোধের অনুপস্থিতি তাকে পরপুরুষগামী হতে বাধ্য করেছে। একটা পর্যায়ে সে মনোলোকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। অন্য পুরুষের নিকট আকাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা না পাওয়ার বেদনায় তাকে আত্মবিসর্জনের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এর পেছনে তার স্বামীর কর্তৃত্বহীনতা, দায়িত্বহীনতা ও অসম দাম্পত্য সম্পর্ক দায়ী ছিল। সমির উদ্দিনের পৌরুষহীনতা দাম্পত্য সম্পর্ককে একটি দুঃখবহ পরিণতির দিকে নিয়েছে। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতার পেছনে রয়েছে কয়েকটি কারণ। যেমন– স্বামীর সাথে অসম বয়স, স্বামীর আবেগহীনতা, স্বামীর ইন্দ্রিয়জবাসনাপূর্ণ ভোগবাদী মনোভাব, হামিদের সাথে পরকীয়ার ব্যাপারে স্বামীর কঠোর দায়িত্বহীন মনোভাব ও সর্বোপরি মধ্যবয়সের আশ্রয়হীনতা ইত্যাদি। লীলার দাম্পত্য জীবনের টানাপড়েন সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য-

> দাম্পত্য টানাপড়েনে সময় বয়ে চলে–সংসার ধর্ম চলে–সন্তান হয়। কিন্তু ভালোবাসা কারে কয় এর প্রকৃত রূপ পরিষ্কার হয়ে ওঠে না লীলার কাছে।[২৫]

লীলার মনে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পেলে হয়তো পরিণতি ইতিবাচকও হতে পারত। দাম্পত্য সম্পর্ক যদি ভালো হতো এবং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকত, তাহলে লীলার ট্রাজিক পরিণতি হয়তো হতো না।

৮

নরনারীর সম্পর্ক ও প্রেমের অস্বাভাবিক রূপ উপস্থাপিত হয়েছে শওকত আলীর উপন্যাসে। লেখক আধুনিক নাগরিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা নরনারীর প্রেমের বিষয়কে উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। *পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩)* প্রকৃতপক্ষে প্রেমনির্ভর উপন্যাস নয়। কিন্তু এ উপন্যাসে সুস্থ ও সুন্দর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। অবশ্য এ প্রেমের পরিণতি নেতিবাচক হয়েছে। এখানে প্রেমের অস্বাভাবিক রূপ পরিলক্ষিত। সমকালীন নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বভাব, রুচি ও চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করা হয়নি। মঞ্জুর সাথে আনিসের প্রণয়জ আকর্ষণ দেখানো হয়েছে। সালেহার পূর্ব-স্বামীর ঔরসজাত মঞ্জু। সে মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর সন্তান আনিসের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। আনিসের মধ্যেও ক্ষীণ মাত্রায় মঞ্জুর প্রতি প্রণয়াসক্তি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে মধ্যবিত্তের পলায়নবাদী মানসিকতা থাকায় এ প্রণয় বিকশিত হয়ে ওঠেনি। সে প্রশিক্ষণসূত্রে চাকরি নিয়ে লাহোরে চলে যায়। এখানে আনিসের দুর্বল, পৌরুষহীন মনোবৃত্তি ফুটে উঠেছে। বাবার মৃত্যু, মায়ের স্নেহহীন মনোবৃত্তি, বিরূপ পরিবেশে বেড়ে ওঠার সংগ্রামী মনোভাব, পিতামহের মৃত্যু, বেনু, আকরাম ও কাসেমের পাশবিক মনোবৃত্তির পরেও মঞ্জু তার মধ্যে থাকা সুপ্ত ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু সমকালীন বিরূপ প্রতিকূল অবস্থা, আনিসের নিষ্ক্রিয়তা, বেনু, আকরাম, তাজিনার স্বামী ও কাসেম কর্তৃক সম্ভ্রমহানির ঘটনায় লুপ্ত হয় মঞ্জুর আজন্মলালিত প্রণয়বাসনা। সেই সাথে মঞ্জুর মধ্যে জেগে ওঠে, সুস্থ ও সুন্দর জীবনাকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থতাবোধ। মঞ্জুর ভাষায়–

> আমি যে কোনো মতে ভুলতে পারি না, আমি শুভ্র ছিলাম, পবিত্র ছিলাম। জীবনকে ভালোবেসে আমি সুন্দর, শুভ্র আর পবিত্র করতে চেয়েছিলাম। আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাঁচতে চেয়েছিলাম সেই পবিত্র শুভ্রতার মধ্যে। জন্ম জন্ম ধরে এমনিভাবে বাঁচবার বড়ো সাধ ছিল আমার। জীবনের কাছে আমি কিছুই চাই নি, শুধু বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা কেউ আমায় বাঁচতে দিল না।[২৬]

এখানে মঞ্জুর আত্মকথনে উঠে এসেছে তারই আজন্মলালিত জীবনদীপ্ত বাসনা ও ভালোবাসার অকাঙ্ক্ষা, যা ব্যর্থতায় রূপ নিয়েছে।

অপেক্ষা (১৯৮৫) উপন্যাসে প্রেমের ভিন্নমাত্রিক রূপ অঙ্কিত হয়েছে। আলী আকবর ও সাজেদার প্রেমকে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে শামীম আর আফরিনের প্রণয়ের চিত্রকে সামান্য অবয়বে বর্ণনা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে আলী আকবর, ঢাকা শহরে টিউশনি করে সংগ্রামনির্ভর জীবনযাপন করে। এক পর্যায়ে সে সাজেদার সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হয়। বেকার জীবনে হতাশাগ্রস্ত মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিত মানসিক স্বস্তির প্রয়োজনে সে সাজেদার আকর্ষণে সাড়া দেয়। নিঃসঙ্গ আলী আকবরের জীবনে স্বস্তির জন্য প্রেমের আশ্রয় লাভ ছিল সংগত। কেননা প্রেমের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একাকিত্ববোধ, নৈঃসঙ্গ্যবোধ ইত্যাদি প্রশমিত হয়। কিন্তু আলী আকবরের মধ্যে রয়েছে মধ্যবিত্তের পলায়নবাদী মানসিকতা। এজন্য তাদের ভালোবাসা মিলনে রূপ নেয়নি। আলী আকবরের নির্বিকার, দুর্বলচিত্ত ও নিস্পৃহ স্বভাবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে লেখকের কথায়–

> তাকে বিয়ের জন্যেও তাহলে অপেক্ষা করতে হবে? প্রেমিকার সঙ্গে মিলনও সহজে হতে পারে না? ...জীবন কি তাহলে চলছে না, স্বাভাবিকতার গতি কি থেমে গেছে? স্রোতের প্রবাহ শুধু বিকারের, জীবনের নয়? বিশ্বাসের নয়? ভালোবাসার নয়?[২৭]

অনুকূল সাড়ার অভাব সাজেদার হৃদয়কে বেদনাক্রান্ত করেছে। সাজেদার প্রেমে ছিল বিশ্বাস ও আস্থা। তাকে নিয়ে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্নে বিভোর ছিল সে। যা আলী আকবরের কর্তৃত্বহীন দুর্বল মানসিকতার কারণে পরিপূর্ণতায় রূপ নেয়নি। অন্যদিকে শামীম ও আফরিনের প্রণয়ের মধ্যে সমাজবাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়নি। আফরিন তার পরিবারের পছন্দ করা

ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। শামীমকে সে ভুলতে বাধ্য হয়েছে। এখানে প্রণয়ের ক্ষেত্রে বাস্তবতাবর্জিত আবেগকে বড় করা হয়নি। আবেগহীন সমাজবাস্তবতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক নরনারীর সম্পর্ক বা প্রণয়-ভাবনার অস্বাভাবিক রূপটিও *গন্তব্যে অতঃপর (১৯৮৭)* উপন্যাসে প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রেমবোধের মাধ্যমে আধুনিক নগরবাসীর বিকারগ্রস্ততা প্রশমিত করে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করা যায়। এই বোধ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলী আকবর ও নীহার প্রেমের চিত্রে উঠে এসেছে। নীহারের স্বপ্ন ছিল সুদূরপ্রসারী। স্বামী সংসার ইত্যাদি সুন্দর জীবন প্রত্যাশাই ছিল তার প্রেমের উদ্দেশ্য। প্রেম মানুষকে মহৎ করে, নেতিবাচক গুণকে ইতিবাচক গুণে রূপান্তরিত করে। এই ভাবনা এ উপন্যাসে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নীহারের ভালোবাসার শক্তি প্রগাঢ় ও শক্তিশালী ছিল। আলী আকবরের মতো ভোগবাদী ও কামুক পুরুষকেও ইতিবাচক পথে ফেরাতে সক্ষম হয়েছে। সমকালীন আধুনিক নরনারীর প্রেমের নেতিবাচক প্রভাব ঔপন্যাসিকের ভাবনাকে আন্দোলিত করে। ফলে দেখা যায়, নীহার আলী আকবরের নিকট শারীরিকভাবে লাঞ্ছনার শিকার হয়। তবুও প্রেম বা প্রণয় যা আলী আকবরের বিকারগ্রস্ত ভাবনাকে ইতিবাচক পথে নিয়ে এসেছে। তার মধ্যে অনুভূত হয়েছে– "সে কিছুতেই বুঝতে পারে না, এত স্বাভাবিক কেমন করে হতে পারছে নীহার। তার তো আলী আকবরকে ঘৃণা করার কথা।"[২৮]

যেতে চাই (১৯৮৮) উপন্যাসে নিশাতের মধ্যে প্রেমের অস্বাভাবিক রূপের প্রকাশ ঘটেছে অতি সূক্ষ্মভাবে। বিবাহপূর্বকালে শাফাক আহসান, কামরান এলাহী ও মুশফিকের সাথে সম্পর্কের মধ্যে তার ভোগসর্বস্ব কামনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়াকে সে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে। বিয়ের পরে স্বামী ও সন্তান থাকার পরও মুশফিকের সাথে সে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। মুন্নির নিকট মায়ের অনৈতিক সম্পর্ক দৃশ্যমান হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো গ্লানিবোধ পরিলক্ষিত হয়নি। বরং মেয়েকে মিথ্যা অপবাদ দিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করেনি। মুন্নির উক্তিতে তার মায়ের বিবাহবহির্ভূত প্রেমের স্বরূপ উঠে এসেছে এভাবে– "গলায় গলায় ভাব একেবারে। আম্মার ঘাড়ে হাত রেখে কথা বলে। সেদিন দেখে এমন বিচ্ছিরি লেগেছিল তার, যে বলার কথা নয়।"[২৯]

ভালোবাসা কারে কয় (১৯৮৮) উপন্যাসে আশৈশব প্রেমের জন্য অনুসন্ধিৎসা ও অতঃপর ব্যর্থতাবোধ লক্ষণীয়। হারান দত্তের ছেলে তপনের সঙ্গে প্রথম প্রেম হয়েছে লীলার। কিন্তু দেশ বিভাগকালীন সাম্প্রদায়িক সংকটের কারণে তার সেই প্রেমের কোনো ইতিবাচক ফল আসেনি। সে প্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। পরবর্তীকালে আনিসকে সে সত্যিকার অর্থে ভালোবেসেছে। তাকে নিয়ে সে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতির বেড়াজাল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে আনিস। শিক্ষিত হওয়ার পরও বাবার দাবিকৃত যৌতুকের ব্যাপারে সে কোনো প্রতিবাদ করেনি। যার কারণে লীলা প্রথম বারের মতো প্রেমের ব্যর্থতাবোধে মানসিক আঘাত পেয়েছে। বৈবাহিক জীবনে অসুখী লীলার মনোলোক প্রকৃত ভালোবাসার সন্ধানে রত থাকে। আধুনিক নরনারীর প্রেমের অন্যতম বিষয় হলো মন। সেই মনের চাহিদা পূরণের জন্য কখনো কখনো সামাজিক রীতিনীতির কঠোর নিয়ম উপেক্ষা করতে হয় পাত্র-পাত্রীকে। লীলার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বামীর অবহেলা ও দাম্পত্য জীবনে অপ্রাপ্তিবোধের কারণে সে

বাধ্য হয়েছে সঙ্গীতপ্রেমী আহসানের প্রতি আসক্ত হতে। কিন্তু যান্ত্রিক মানসিকতার অধিকারী আহসানের দিক হতে সে কোনো ইতিবাচক সাড়া পায়নি। তারপরও সে তাকে ভালোবেসেছে। তাকে নিয়ে বাকি জীবনটা ভালোবাসায় কাটানোর স্বপ্ন দেখেছে। পূর্ণতা আনতে চেয়েছে নিজের মনোচাহিদার এবং গড়তে চেয়েছে সুখের নীড়। কিন্তু আহসানের কাছে লোহা লক্কড়ের ব্যবসা অধিক গুরুত্ববহ। সে আহসানের নিকটও প্রত্যাশিত ভালোবাসার সন্ধান পায়নি। আহসানের নিস্পৃহতাও লীলার মনোলোকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে। আহসানের প্রতি লীলার অনুনয় ব্যক্ত হয়েছে এভাবে– "আমি তো তোমার কাছে কাজ চাই না, শুধু তোমাকে একদম খুঁজে পাই না। এ জায়গায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে– এখানে থাকলে আমি মরে যাব–তুমি এসব বন্ধ করে দাও।"[৩০] আহসানের আবেগহীন পুঁজিবাদী মানসিকতা, স্বামীর দায়িত্বহীনতা, কামসর্বস্ব মানসিকতা, আনিসের প্রত্যাখ্যানজনিত ও সংস্কারপূর্ণ মানসিকতা প্রভৃতির আঘাতে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। মৃত্যুকে মুক্তির পথ মনে করে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তার মনোলোক বিশ্লেষণে সমালোচকের মন্তব্য–

> উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র লীলার ভালোবাসার শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধান ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন। শৈশব থেকে দাম্পত্য জীবন পর্যন্ত লীলার চরিত্রে এই ভালোবাসার প্রত্যাশা ও আশাবাদের নেতিবাচক ইতিকথা দেখানো হয়েছে। কিন্তু লীলার মানসিক সংকট, তার জীবনাকাঙ্ক্ষার, তার ব্যক্তিত্বের ধরন, তার আবেগ এবং সর্বোপরি ভালোবাসার মতো পরম নির্ভরশীল কোনো মানুষকে জীবনে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সে প্রতিনিয়ত নিজেকে নিজে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। লীলার বীতস্বপ্নের জগতে কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় না।[৩১]

আধুনিক নরনারীর প্রণয়ভাবনার এক ভিন্ন রূপ উন্মোচিত হয়েছে *প্রেম কাহিনী (১৯৯১)* উপন্যাসে। এ উপন্যাসে প্রেম প্রকাশে বয়সকে প্রাধান্য দেয়া হয়নি। মানব-মানবীর অনুভূতি ও আবেগকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রেমের সাথে দৈহিক সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তিজাত কারণে তাদের মধ্যে প্রেমবোধ জাগ্রত হয়। এ সম্পর্কে উপন্যাসে লেখকের মন্তব্য–

> কারণ প্রেম তো কেউ করে না, ও জিনিস হয়ে যায়। শরীরের কথা বলছিলাম, শরীর একটা ব্যাপার বটে, বয়স বেশি হয়ে গেলে শরীর থাকবে না এমন কোনো কথা নেই। শরীর থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে প্রেম হয়ে যায়।[৩২]

নিরু আধুনিক শিক্ষিত নারী। তার স্বামী মাহমুদ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়ে তুলি এবং রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে পড়া মিঠুকে নিয়ে সুখের সংসার। প্রাথমিক জীবনে নিরুর প্রেমে পড়ার কথা জানা যায় না। অন্যদিকে সাংবাদিক সাদউদ্দিনকে আইভি জোরপূর্বক দৈহিক মিলনে বাধ্য করে। পরে কলকাতার এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এছাড়া তার জীবনেও প্রেমের প্রকাশ দেখা যায়নি। তার স্ত্রী বিয়ের দুই বছর পরে সমুকে রেখে অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিকের সঙ্গে চলে যায়। এতে তার মধ্যে মনঃকষ্ট ও একাকিত্ববোধ সঞ্চারিত হয়েছে। ঘটনাক্রমে ট্রেন যাত্রায় তার সঙ্গে নিরুর পরিচয় হয়েছে। সমু ও মিঠু বন্ধু হওয়ায় তাদের মধ্যে পরিচয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিচয়ের সূত্র ধরেই তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রণয়জ আকর্ষণ অনুভব করেছে। একটা পর্যায়ে নিরুর মনের গভীরে সাদউদ্দিনের প্রতি ভালোবাসা বা অনুরাগের জন্ম হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে নিরুর দাম্পত্য জীবনে। স্বামীর সাথে মনস্তাত্ত্বিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। তাই সেই

সময় স্বামী মাহমুদের সঙ্গে স্বভাবিক দৈহিক মিলনের পরে নিরুর নিজেকে ধর্ষিতা মনে হয়েছে। নিরুর ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে স্বামীর প্রতি এমন মনোভাব–

> কিন্তু যে দিন, সেই রাতে, তার মনে হচ্ছিল, তাকে যেন রেপ করা হচ্ছে। এমন কখনো হয়নি আগে। কিন্তু সে রাতে হল। মনে হচ্ছিল, এই কাজটির জন্যই শুধু মাহমুদ ঢাকায় এসেছে–নাহলে সে আসত না।[৩৩]

নিরুর কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে স্বামীর কাছ থেকে ভালোবাসা না পওয়ার অপ্রাপ্তিবোধ। তাই সাদউদ্দিনকে নিয়ে তার মনোলোকে ভালোবাসার সেই অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে। শুধু নিরুর অনুভূতি প্রকাশ পায়নি। সাদউদ্দিনের মনোলোকেও নিরুর প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি জেগে উঠেছে। সাদউদ্দিনের উক্তিতে তা স্পষ্ট– "আমার কষ্ট হচ্ছে এভাবে চলে যেতে, তুমি বোঝো না।"[৩৪] সাদউদ্দিনের এমন কথায় নিরুর প্রতি তার মনের গভীরে জমে থাকা ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। সন্তান সমুর জন্মদিনে সাদউদ্দিনের একটি কথায় নিরুর মনের মধ্যে অস্থিরতা জেগে ওঠে। ভালোবাসার স্পর্শ পাওয়ার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সাদউদ্দিনের সেইকথা- "আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি খুব ঠাণ্ডা মানুষ-খুব আপনজনের মতো আপনাকে দেখতে লাগে।"[৩৫] বাস্তববাদী, সমাজমনস্ক ঔপন্যাসিক আধুনিক মধ্যবিত্ত নাগরিকের মধ্যে প্রেমের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। কিন্তু প্রচলিত পরিবার কাঠামোকে না ভেঙে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে শুধুই ভালোবাসার স্বরূপকে দেখিয়েছেন। নিরুর কথায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে– "নিরু বাধা দেয় না, নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় না, শুধু কাতর মিনতি করে–না, আপনি সর্বনাশ করবেন না-ছেলেমেয়েদের কথা ভাবুন, আমারও কষ্ট হয়–বিশ্বাস করুন।"[৩৬] তাই সমাজসত্যকে মেনে নিয়ে চল্লিশোর্ধ দুজন বয়স্ক আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নর-নারীর মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে এভাবে পরিস্ফুটিত করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পরে মানুষের মধ্যে কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। প্রান্তের মানুষের কেন্দ্রে আগমনের পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছে অর্থ। অর্থ প্রাপ্তির মাধ্যমে এক শ্রেণির মানুষ বিত্তবান হয়েছে। তারা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে। কিন্তু নাগরিক বিত্ত-বৈভবে বেড়ে ওঠার পরও কিছু মানুষের প্রান্তের প্রতি আকর্ষণ থাকে। *পতন (১৯৯২)* উপন্যাসে দেখা যায় সেই চিত্র। আবদুল্লাহর ছেলে মিঠু ডাক্তার হয়ে গ্রামের মানুষের সেবা করে। এটাকে সে নৈতিক ও নাগরিক দায়িত্ব মনে করে। এই প্রান্তজন ও প্রাকৃতজনপ্রেমীর মধ্যে ভালোবাসার বোধ দেখা যায়। রশিদ মল্লিকের মেয়ে রিফাতের সাথে মিঠুর এক ভিন্ন ধরনের প্রেমের সম্পর্ক উন্মোচিত হয়েছে। রিফাত মিঠুকে প্রচণ্ড ও গভীরভাবে ভালোবাসে। কিন্তু কেন্দ্র থেকে প্রান্তে গিয়ে মিঠুর সাথে সাংসারিক জীবনে সংলগ্ন হওয়ার প্রয়াস প্রথম দিকে তার মধ্যে দেখা যায় না। মিঠুর মাধ্যমে কেন্দ্রে থাকা মানুষের প্রান্তের প্রতি গভীর মমতা ও ভালোবাসার বাণী প্রচার করা হয়েছে। মিঠুর ভালোবাসার স্বরূপকে আবেগের মানদণ্ডে বিচার না করে দেখা হয়েছে বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে। মিঠু রিফাতকে অস্বীকার করেনি। বরং তার জীবনযাপনের ধরনকে ভালোবাসার উপর জোর দিয়েছে। তার সাথে ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে গিয়ে থাকার জন্য সে অনুরোধ করেছে। মিঠুর কথায় স্পষ্ট হয়েছে সেই বাস্তবধর্মী অনুরোধ– "আমাকে যদি ভালো লাগে তাহলে আমার সমস্ত কিছুকে ভালো লাগতে হবে–লাভ মি অ্যান্ড লাভ মাই ডগ–ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে পড়নি?"[৩৭]

মিঠুর মাধ্যমে তাদের ভালোবাসাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে প্রান্তিকজনের প্রতি গভীর টান ও মমত্ববোধের স্ফুরণ ঘটানো হয়েছে।

মা ও মেয়ের মধ্যবিত্ত স্বভাবের দ্বন্দ্ব, মায়ের অসংযত ইন্দ্রিয়জ বাসনা, উচ্চবিত্তের প্রতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা উন্মোচিত হয়েছে *জননী ও জাতিকা (২০০১)* উপন্যাসে। এতে মা ও মেয়ের দুই বিপরীতধর্মী স্বভাব, বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে পাত্র-পাত্রীর ভালোবাসার গভীরতা স্পষ্ট হয়েছে রীনার সঙ্গে ইব্রাহীমের কথায়– "তুমি কাছে না থাকলে ঐ কাজ আমি পারব?"[৩৮] সুতরাং উচ্চ মধ্যবিত্তমনস্ক মায়ের অসংযত জীবনাচরণের পাশে মেয়ে রীনার মধ্যবিত্তমনস্ক ইব্রাহীমকে ভালোবাসার চিত্র দেখানো হয়েছে। প্রণয়ের প্রতি আস্থাশীলতা ও বাস্তবধর্মী রোমান্টিক মনস্তত্ত্বের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রণয়ের নানা মাত্রা ও রূপ আছে। আধুনিক মধ্যবিত্ত নাগরিকের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি বাদ দিতে পারেননি প্রেম-চেতনাকেও। প্রণয়কে মানবমনের এমন একটি গভীরতম অনুভূতি বলে মনে করেন যেখানে তিনি বয়সের তারতম্যকে প্রধান করে দেখেননি। এমন চিত্র উঠে এসেছে *জোড় বিজোড় (২০০১)* ও *শেষ বিকেলের রোদ (২০০১)* উপন্যাসে। প্রেমে মানসিক প্রশান্তি ও দৈহিক সুখ নিহিত। এতে মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতা ও আশ্রয়ের দিকও আছে। এই বিষয়গুলো উক্ত দুটি উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রেম প্রৌঢ় বয়সের একাকিত্ববোধকে দূর করে প্রশান্তি বয়ে আনে, এই দুটি উপন্যাসে তা দেখানো হয়েছে। সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির বাইরে পাত্র-পাত্রীর মনের অন্বেষণ ও প্রশান্তিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। *জোড় বিজোড় (২০০১)* উপন্যাসে কামরুল হায়দারের প্রৌঢ় প্রেমের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। তার মধ্যে একাকিত্ববোধ ও নিঃসঙ্গতা রয়েছে। ষাট বছরের বেশি বয়সেও সে জীবনসঙ্গিনী অন্বেষণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু সঙ্গিনী পেতে সে ব্যর্থ হয়েছে। দুই সন্তানকে তার যাবতীয় ব্যবসার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। পরে সে পৈতৃক ভিটা মোহনপুরে যায় জীবনে প্রশান্তি লাভের আশায়। সেখানে যাওয়ার পরে তারই ভাবী সম্পর্কের বিধবা মুশতারি বেগমের সাথে তার পরিচয় হয়েছে। এক পর্যায়ে সে মুশতারি বেগমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। উর্দুপ্রেমী মুশতারি বেগমও তার প্রতি আকৃষ্ট হলেও সে প্রচলিত ধর্মীয় মূল্যবোধকে অতিক্রম করতে পারেনি। সঙ্গিনী না পাওয়ার ব্যর্থতাবোধে সে অতঃপর ভেঙে পড়েছে।

> মুশতারি বেগমের কান্নাভেজা মুখ, তার দীর্ঘশ্বাস, তাঁর মনের আকুলি-বিকুলি ষাট বছরের কামরুল হায়দার নামক প্রৌঢ়ের দেহ-মনকে ঝাঁকাতে শুরু করে। মুশতারি বেগম ঘাড়ে হাত রাখলে তিনি খুবই অভ্যস্ত হাতে নিঃসঙ্গতার পীড়নে কাতর প্রৌঢ়া বিধবাটিকে দু'হাতে চেপে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন।[৩৯]

স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে প্রৌঢ় বয়সে সঙ্গিনী পাওয়ার জন্য সে চেষ্টা করেছে। লন্ডনপ্রবাসী সিলেটের ডিভোর্সি নাজমা মজুমদার, বিধবা স্কুলশিক্ষিকা নাফিসা খানম, চেন্নাই-এর সুভদ্রা অনুপিল্লাই, চট্টগ্রামের এলিস হাওয়ার্ড, কলকাতার কনক গুপ্ত ও লক্ষ্ণৌর শবনম দুররানী প্রমুখ নারীদের জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বারবারই তার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

শেষ বিকেলের রোদ (২০০১) উপন্যাসেও স্পষ্টভাবে প্রৌঢ় প্রেমের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। মীজুর সাথে তারই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী হাসিব আহসানের প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। যদিও বাবা মার অনুরোধে আবিদের সঙ্গে তার বিয়ে হল। সে সুখে শান্তিতে জীবন কাটায়। ছেলেদের বিয়ের দায়িত্বও সম্পন্ন করে। কিন্তু দীর্ঘদিন পরে বিদেশ থেকে আসা একটি প্যাকেটকে কেন্দ্র করে মহসিনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। পারস্পরিক জানাজানি, খোঁজ-খবর নেওয়া ও সামাজিকতা রক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। তাদের মনের মধ্যে এক ধরনের নির্ভরতার আবেগ জেগে উঠলেও তা কোনো পরিণতি অর্জন করেনি। অন্যদিকে, ছোট ছেলে বিয়ে করে বিদেশ চলে যাওয়ার পর মীজুর মধ্যে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ববোধ বেশি জাগ্রত হলে তার মনে হাসিব আহসানের আসন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাসিব কবি স্বভাবের। সে মীজুকে নিয়ে কবিতা লিখেছে। যে কবিতা মীজুর খুবই পছন্দ হয়েছে। প্রৌঢ় জীবনে তারা তাদের মনের শান্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে। লেখকের ভাষায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের প্রৌঢ় প্রেমের স্বরূপ–

> সে জানে, প্রৌঢ় মেয়ে পুরুষের দেহমিলনে সন্তান সম্ভাবনা খুবই কম। ...এমন অবস্থায় যদি দু'জন প্রৌঢ় প্রৌঢ়া মরণের পথে এগোতে এগোতে ইচ্ছে মতো আচরণ করে, যার জন্য কারোর কোনো ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই–তাহলে সেই আচরণ কেন দোষের হবে?[৪০]

মীজু শেষ বয়সে হাসিবের বিয়ের প্রস্তাবকে নাকচ করেছে। কিন্তু তার সান্নিধ্যকে সে মেনে নিয়েছে। তারা দুজন পারস্পরিক নৈকট্য ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রৌঢ় বয়সের একাকিত্ব থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে।

৯

সামাজিক নানা বাধা নিষেধের কারণে মানুষ তার মনের সব ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না। এজন্য সে অতৃপ্ত থাকে। তবে তার মনের সেই অবদমিত ইচ্ছাগুলো বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। লেখকের নাগরিক মধ্যবিত্তনির্ভর উপন্যাসে লিবিডো চেতনা এসেছে নানাভাবে। আধুনিক মধ্যবিত্ত নর-নারীর মনোবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে চরিত্রের অবচেতন মনের অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা উঠে এসেছে। এ চেতনাকে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ হিসেবে মনে করা হয়। *পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩)*-এ লিবিডো চেতনা ও ইন্দ্রিয়জ আসক্তির আভাস রয়েছে। বিশেষত, সালেহা, আকরাম, কাসেম ও বেনুর মধ্যে এ চেতনা পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যের লিবিডো চেতনার শিকার হয়েছে সপ্তদশী মঞ্জুর মতো সুস্থ ও স্বাভাবিক সত্তার তরুণী। মঞ্জুর দেহের প্রতি আসক্ত হয়েছে তারা। তাদের সংযমহীন, পাশবিক স্বভাবের পরিচয় উপন্যাসে রয়েছে। তবে এখানে দুই ভাবে লিবিডো চেতনা উঠে এসেছে। এক. সালেহা বেগমের মধ্যে এবং দুই. মঞ্জুকে কেন্দ্র করে আকরাম, বেনু, কাসেম ও তাজিনার স্বামীর মধ্যে। প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পরে সালেহার সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব ছিল মঞ্জুর প্রতি আন্তরিকতা দেখানো, মমত্ববোধ প্রকাশ করা এবং কন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা। কিন্তু তার মধ্যে দেখা যায় বিপরীতধর্মী অবস্থা। প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণে সে ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। বিয়ের পরে স্বামীর বার্ধক্যজনিত অসমর্থতাহেতু গৃহাভ্যন্তরেই সে আকরামের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। সালেহা নিজের ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনা পূরণে শুধু থাকেনি, নিজের মেয়েকেও ঐ দিকে

প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছে। বেনুকে এগিয়ে দিয়েছে মঞ্জুর সম্ভ্রমহানি করতে। তার ব্যভিচার স্বামীর কাছে ধরা পড়লেও এতে তার মধ্যে কোনো সংকোচ ও অপরাধবোধ দৃশ্যমান হয়নি। তারই ব্যভিচারজনিত কারণে মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। এতেও তার চিত্তে অনুতাপ জাগেনি বরং স্বামীর মৃত্যুর পরেও আকরামের সাথে তার অবৈধ সম্পক আরো অবাধ হয়েছে। তার এমন মনোভাব মঞ্জুর সুস্থ মানসিকতায় আঘাত সৃষ্টি করেছে। যেমন–

> মঞ্জুর মায়ের মধ্যে রয়েছে অসংযত দেহ-ভোগের এক দুর্নিবার স্পৃহা। এরূপ ইন্দ্রিয়বশের কারণেই সে দ্বিতীয় স্বামীর বার্ধক্যজনিত অসমর্থতাহেতু তার গৃহহাভ্যন্তরেই পরপুরুষগামী হয়। এই অতৃপ্তি ও অদম্য লিবিডো তাড়নাই তার মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক বিকারের জন্ম দেয় তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমরা লক্ষ্য করি। সে নিজ মেয়েকেও সংযম অভ্যাস রপ্ত করার পরিবর্তে যৌবনদীপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনে প্ররোচিত করে এবং এই মেয়ের শরীরের প্রতি আকৃষ্ট যুবকের প্রতি পক্ষভুক্ত হয়ে মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুবকের সঙ্গে তাকে ঘনিষ্ঠ হতে বাধ্য করে।[৪১]

মঞ্জুকে কেন্দ্র করে বেনু ও কাসেমের মধ্যে লিবিডো চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। তার প্রতি তারা পাশবিক মনোভাব দেখিয়েছে। ধর্মীয় রীতিনীতি, সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ ও সম্মানবোধ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণই তাদের নিকট মুখ্য হয়েছে। আকরাম যেমন সালেহার দেহকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করেছে তেমনি তার ইন্দ্রিয়জ স্বভাবের নিকট মঞ্জুকেও পরাজিত হতে হয়েছে। তাজিনার স্বামী ব্যবসায়ী কাসেমের মধ্যেও রয়েছে অদম্য যৌনাকাঙ্ক্ষা। যাদের পাশবিকতার শিকার হয়ে মঞ্জু মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়েছে। সে নিরুদ্দেশ জীবন বেছে নিয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে হয়ত লিবিডো চেতনা বিদ্যমান আছে। কিন্তু তা স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করলে ব্যক্তিকে কলুষিত হতে হয়। যা অন্যের জীবনকে নিয়ে যায় নরকসম এক বৃত্তালয়ে। ধ্বংস করে দেয় তার মনের সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষাকে। নষ্ট করে দেয় সুন্দর ও পবিত্র জীবন-বাসনাকে। এভাবেই কাসেমের নিকট মঞ্জুর সম্ভ্রমহানি ঘটেছে। কাসেমের পাশবিক আচরণে মঞ্জুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ও সুপ্ত-বাসনা চিরতরে বিনষ্ট হয়েছে। মঞ্জুর উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে তার সেই অপ্রাপ্তিবোধের আত্মসমালোচনানির্ভর উপলব্ধি–

> ঘেন্না মাকে, বেনুকে, তাজিনাকে সব মানুষকে এখন আমি ঘেন্না করি। নিজের এই যে সুন্দর শরীরটা, এটার ওপরেই আমার ঘেন্না জমে রয়েছে। এই কি আমি? কত বার করে নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি আমার ভেতরে কি কোনো শক্তি নেই। এমনি দুর্বল যে একটা পশুর কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলাম না।[৪২]

মঞ্জুর সমবয়সী ও বান্ধবীদের মধ্যেও প্রণয়ের নামে অসংযত ও অনিয়ন্ত্রিত দেহজ আসক্তির পরিচয় মিলেছে। দেহের সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে একমাত্র উপভৌগিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ছেলেদের সঙ্গে অবাধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এই লিবিডো চেতনা তাদের অনেকের জীবনকে ভবিষ্যতে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

গন্তব্যে অতঃপর (১৯৮৭) উপন্যাসে লিবিডো চেতনার প্রকাশ রয়েছে আলী আকবরের মধ্যে। তার এই চেতনা স্বাভাবিকতার সীমাকে অতিক্রম করে নেতিবাচক রূপ পরিগ্রহ করেছে। যার শিকার হতে হয়েছে নীহার মতো প্রণয়াকাঙ্ক্ষীকেও। উপন্যাসে তার বিকৃত স্বভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে। সে ঢাকার নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত। সে রিফাত ও সাকিনার সঙ্গেও বিবাহবহির্ভূত দৈহিক সম্পর্ককে স্বাভাবিক মনে করেছে। তার চেতনায় এমন সম্পর্ককে কখনো সমাজবহির্ভূত, নীতিহীন ও ধর্মবহির্ভূত মনে হয়নি। অন্যদিকে নীলার সাথে সম্পর্ক চলাকালেও নীহার সাথে

জোরপূর্বক দৈহিক মিলনের মতো বিকৃত ও ভোগবাদী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। তার ভাবনায় এসেছে- "যে বাড়িতে দীর্ঘ রোগভোগের পর মানুষ অনিবার্যভাবে মারা যায়, সে বাড়িতে স্বামী স্ত্রীরা কি মিলিত হয় না?[৪৩] এটা বিকৃত রুচি ও সুতীব্র লিবিডো তাড়নার সাথে সম্পৃক্ত। তার বাবার মধ্যেও এ মনোভাব ফুটে উঠেছে। মুসলিম বনেদি পরিবার, স্ত্রী, সামাজিক পতিপত্তি ও সম্মান রয়েছে তার বাবার। তারপরও স্ত্রীরসূত্রে আত্মীয় আফরোজা খানমের সাথে সে পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হয়েছে। তার পরকীয়া প্রেম স্ত্রীকে তিলে তিলে অগ্নিসম যন্ত্রণা দিয়েছে। ফলে তার স্ত্রীর অকাল মৃত্যু হয়েছে। তাছাড়া বাবার এমন অনৈতিক, অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত পরকীয়া সম্পর্ক তার মনোলোকে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। তার স্বভাবের নেতিবাচকতাও বাবার এই সংযমহীন লিবিডো তাড়না থেকেই জাত।

প্রেম কাহিনী (১৯৯১) উপন্যাসে মূলত দুজন বয়স্ক নরনারীর প্রেমের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষণীয়। মাহমুদের স্ত্রী নিরু সন্তানের জননী শিক্ষিত, বয়স্ক ও দাম্পত্য জীবনে সুখী। অন্যদিকে সাদউদ্দিনও বয়স্ক, শিক্ষিত ও সন্তানের জনক। দুজন, শিক্ষিত আধুনিক মনস্ক মানুষ। উভয়েরই সন্তানাদি রয়েছে। উভয়ই দাম্পত্য জীবনে পরিতৃপ্ত। অথচ মধ্য বয়সে তারা পরস্পরের প্রতি ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণ অনুভব করেছে। এটা পরোক্ষভাবে উভয়ের লিবিডো তাড়নারই বহিঃপ্রকাশ। উপন্যাসের শেষে উভয়ের মধ্যে এমন মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে। "সে ফের সাদউদ্দিনের হাত ধরে আর তাতে সাদউদ্দিনের যে কী হয় সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দু হাতে নিরুর দুই বাহুমূল চেপে ধরে।"[৪৪]

নাগরিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিক্ষিত বিত্তবান নাগরিকের উপরের স্তরে ধাবমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষানির্ভর উপন্যাস *পতন* (১৯৯২)। তবে এখানে মধ্যবিত্ত বিত্তবানদের মধ্যে লিবিডো চেতনার স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি তার নেতিবাচক পরিণতিও দেখানো হয়েছে। এ উপন্যাসে অসংযত ইন্দ্রিয়জ বাসনা ও কামনার নেতিবাচক পরিণতিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। আবদুল্লাহ পেশায় একজন সাংবাদিক। সাংবাদিক হিসেবে তার যথাযথ সম্মান রয়েছে। স্ত্রী রোকেয়া, কন্যা তিশমা, ছেলে তরুণ ডাক্তার মিঠুকে নিয়ে তার সুখের সাজানো সংসার। কিন্তু তার মধ্যে ছিল ভোগবাদী মানসিকতা। অবদমিত জৈবিক চাহিদাকে পূরণ করার জন্য সে একাধিক নারী বিলকিস মাহমুদ, নাহিদা আজিজ, নুরজাহান ছবি ও কারিমা ইউসুফের সাথে পরকীয়া সম্পর্ক স্থাপন করেছে। সে নারীদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করেছে। ধানমণ্ডির একটি কক্ষে দিনের বেলায় নাহিদা আজিজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় স্ত্রী রোকেয়ার নিকট ধরা পড়ার পর উপন্যাসের শুরুতেই বিলকিসের উক্তিতে তার নারী আসক্তির চিত্র স্পষ্ট– "প্রমোদ লীলার একটা ভালো জায়গা হয়েছে। ... কে জানে বাবা, বিশ্বাস কী তোমাকে, এমনিতে তো ভদ্র-শান্ত ভালো মানুষটি, নামি দামি সাংবাদিক, কিন্তু চান্স পেলে যে কী রকম কান্ড করতে পারো, তাতো দেখলাম।[৪৫] এখানে মধ্যবিত্তের ভদ্র বেশধারী শিক্ষিত বিত্তবানের নারী আসক্তির স্বরূপ উন্মোচিত। এখানে ইন্দ্রিয়জ আসক্তির নেতিবাচক পরিণতিও দেখানো হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থ মানুষের লিবিডো চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে যেমন সাহায্য করে তেমনি আবার এই অর্থের পতনে মানুষের আদিম আসক্তির প্রতিও অনিচ্ছা জাগ্রত হয়–

> নাহিদা কাছে আসে, ঘাড়ে হাত রাখে, ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে। আর আবদুল্লাহ ঘুরে ফিরে ঐ একই কথা বলে যায়, আমি টাকার জন্য তোমাকে আসতে বলেছিলাম-ঐ সব আর ভালো লাগে না-তাছাড়া বয়স হয়েছে, বোঝোই তো–[৪৬]

এ উপন্যাসে ভিন্নভাবে লিবিডো চেতনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এখানে অর্থের মানদণ্ডে লিবিডো চেতনার পরিণতি দেখানো হয়েছে।

জননী ও জাতিকা (২০০১) উপন্যাসে শ্রেণি উত্তরণের প্রচেষ্টায় মানুষের লিবিডোতাড়িত মানসিকতাকে দেখানো হয়েছে। আবিদা দাম্পত্য জীবনে অসুখী ছিল। তার মধ্যে শ্রেণি উত্তরণের চেষ্টা, অর্থলিপ্সা ও শিক্ষানুরাগ বিদ্যমান ছিল। সচিব জাফরের আগমনে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে স্বামী কবির হোসেনকে পরিত্যাগ করে। জাফরকে বিয়ে করেই আবিদা ক্ষান্ত হয়নি। স্বামীর সূত্রে পরিচিত হওয়া সমাজের উচ্চশ্রেণির মন্ত্রী, এস.পি, ডিসি প্রমুখ ব্যক্তির নিকট সে নিজের শরীরকে উৎকোচ হিসেবে ব্যবহার করেছে কার্যোদ্ধারের জন্য। সে কোনো নীতিগত আদর্শ মানেনি। এ জন্য সে অবদমিত যৌন চাহিদাকে ব্যবহার করেছে নিঃসঙ্কোচে। "যদিও সচিব জাফরের সাথে আবিদার সম্পর্ক লিবিডো তাড়িত, এ লিবিডো তাড়নাজাত আত্মপুলকের চেয়ে সমাজের উচ্চ-স্তরে অধিষ্ঠানের অভিপ্রায় সর্বাধিক।"[৪৭] তার নিকট নিজের সতীত্ব ধর্ম প্রধান নয়। প্রাধান্য পেয়েছে তার লিবিডোতাড়িত উচ্চভিলাষী মানসিকতা। সে শরীরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চমধ্যবিত্তে পরিণত হয়েছে। লেখকের ভাষায়–

> তার শোনা ছিল বড়ো লোকদের কাছ থেকে কৃপা নিলে তার দক্ষিণা দিতে হয়। কিন্তু ঘটনাটা যে সত্যি সত্যিই ঘটে, সেটা তার বিশ্বাস হতো না। অবশেষে হলো এবং খারাপ লাগত তার। নিজেকে ঘেন্না লাগত পরে কেমন করে যেন সয়ে গেছে। এবং সে বুঝেছে, এ হল যার যার জীবন ও জগতের দাবি; যে জগতে তুমি থাকতে চাও, যে জীবন তুমি যাপন করতে চাও, তার কিছু দাবি থাকে।[৪৮]

এভাবে সে শরীরকে ব্যবহার করে কার্যোদ্ধার করেছে।

বাংলাদেশের উপন্যাস যাঁরা অসামান্য অবদান রেখছেন, তাঁদের মধ্যে শওকত আলী অগ্রগণ্য। তিনি নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসের রূপায়ণ বিভিন্ন উপন্যাসে ঘটিয়েছেন। যার মধ্যে ছিল তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানেরই সম্মিলন। তিনি শুধু নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বরূপ উন্মোচন করেননি। তাদের জীবনের সূচনা থেকে যাপিত জীবনের শেষ পযর্ন্ত মনোগভীরে প্রবেশ করেছেন। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তাদের জীবনের বিচিত্র দিক ও নানাবিধ মনস্তাত্ত্বিক সংকট। নগরে বসবাসরত মানুষের জীবনের মনস্তকে শুধু ব্যাখ্যাই করেননি, সমাধানের ঈঙ্গিতও প্রদান করেছেন তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে। তাঁর নাগরিক মধ্যবিত্তনির্ভর উপন্যাসগুলোতে যে জীবন বাস্তব, তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক আছে। তবে নেতিবাচক দিক প্রায়শই নগরের অধিবাসীর উপর যে খারাপ প্রভাব ফেলেছে তা তিনি লক্ষ করেছেন এবং সেটাই তাঁর উপন্যাসে অধিকতর গুরুত্বে উপজীব্য হয়েছে। এই নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনেরই সত্যিকার অর্থের বাস্তব রূপকার হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছেন কথাশিল্পী শওকত আলী।

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ আজিজুল হক, 'শওকত আলী: এক মানবীমনের পিঙ্গল আকাশ', *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা*, কথাপ্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ১৬৪

২. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৬৬

৩. হুসাইন মুনীর, 'শওকত আলীর উপন্যাস: একটি সাধারণ পর্যালোচনা', চন্দন আনোয়ার (সম্পাদিত), *গল্পকথা*, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৭, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৬২

৪. মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ ১৯৪৭-১৯৯০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০০৯, পৃ. ০১

৫. মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ১৯৪৭-৭০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৪

৬. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশ', *বাঙলাদেশ*, মনসুর মুসা (সম্পাদিত), ১৯৭১, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ৩৪-৩৫

৭. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, 'মনঃসমীক্ষাবাদী সাহিত্যতত্ত্ব', *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, বেগম আকতার কামাল (সম্পাদনা), অবসর, ২০১৪, পৃ. ১১৫

৮. বেগম আকতার কামাল (সম্পাদনা), *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, 'ভূমিকা' অবসর, ২০১৪, পৃ. (ভূমিকা-একুশ)

৯. হুসাইন মুনীর, *গল্পকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

১০. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক: মোহম্মদ হাননান, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৪৪

১১. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬

১২. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদক: মোহম্মদ হাননান, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৩

১৫. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদক: মোহম্মদ হাননান, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩২৩

১৬. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, দশম খণ্ড, সম্পাদক: মোহম্মদ হাননান, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২৬১

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

১৯. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদক, মোহাম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৭

২০. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, সম্পাদক: মোহম্মদ হাননান, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা. ২০১৭, পৃ. ৩২১

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৫

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

২৩. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদক: মোহম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৬

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭

২৫. শাফিক আফতাব, *শওকত আলীর উপন্যাস: কলাকৌশল ও বৈশিষ্ট্য*, ভাষাচিত্র, ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ১২৮

২৬. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক: মোহম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬
২৭. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদক: মোহম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯
৩০. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদক: মোহম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০
৩১. চঞ্চল কুমার বোস, "মধ্যবিত্ত মানুষের অন্তর্দয়ন", *শওকত আলীর কথাসাহিত্য: জীবন ও সময়ের বিনির্মাণ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৩
৩২. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২৬০
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০
৩৮. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০১
৩৯. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, দশম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯
৪১. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬
৪২. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫
৪৩. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
৪৪. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, সপ্তম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০
৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১
৪৭. *শওকত আলী রচনা সমগ্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৫
৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৫